ছেড়ে আসা গ্রাম

॥ প্রথম খণ্ড ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

জননী ও জন্মভূমি-কে

খণ্ডিত বাংলার ছেড়ে আসা গ্রামের কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো। বাংলা দেশের চরম দুঃসময়ের দিনে, ১৯৫০ সালের ঘনায়মান দুর্দিনের বন্যাস্রোতে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নরনারীর কাছ থেকে সংগৃহীত কাহিনী নিয়ে 'যুগান্তরে' ধারাবাহিক-ভাবে ছেড়ে আসা গ্রামের মর্মন্তুদ আলেখ্য প্রকাশ শুরু হয়। প্রায় এক বৎসর এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে অভিশপ্ত খণ্ডিত বাংলার পূর্বপ্রান্তের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা জড়িত ইতিহাসকে ভাষায় রূপ দিয়ে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ধারাকে কথায় ধরে রাখা, ভবিষ্যতের মানুষ যাতে বাঙালী বলে পরিচিত একদল মানুষেরই ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের ছিন্নসূত্রটুকুর সন্ধান লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, শুধু ভারতবর্ষেই বা কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্প্রতিকালে এমন ব্যাপক দেশত্যাগ আর কোথাও হয়নি। একটা দেশের লক্ষ লক্ষ সুখী শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের পিতৃ-পিতামহের পুণ্য স্মৃতিজড়িত বাস্তুভিটা, অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়ে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় ঝরাপাতার মতো উড়ে এসে পড়লো অন্য এক সীমান্তে। তাদের না রইলো অতীত-স্বীকৃতি, না রইলো ভবিষ্যৎ। মানুষের ইতিহাসে এর চেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে? এই বেদনা থেকেই 'ছেড়ে আসা গ্রামের' অশ্রুসজল কাহিনীর জন্ম। এ কাহিনী বিভিন্ন সূত্র থেকে, বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে রচিত। এ কারণে, কোথাও কোথাও এতে অসম্পূর্ণতা কিংবা তথ্যঘটিত অসংলগ্নতা থাকা স্বাভাবিক। এ ছাড়া এতো অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন গ্রামের কাহিনী নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করাও সম্ভবপর নয়। প্রথমখণ্ডে পুরাণো ও নতুন মিশিয়ে তাই মাত্র বত্রিশটি গ্রামের পরিচয় দেওয়া হলো। দ্বিতীয় খণ্ডে বাকি জেলা কয়টির কয়েকটি করে গ্রামের পরিচয় লিপিবদ্ধ করবার বাসনা রইলো।

প্রথম যখন 'যুগান্তরে'র পৃষ্ঠায় ছেড়ে আসা গ্রাম পর্যায়ের লেখাগুলো প্রকাশ হতে থাকে তখন সেগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশের কোন ধারণাই ছিল না আমার। এ বিষয়ে বহু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু আমাকে উৎসাহিত করেন। গ্রাম-পরিচয় সংগ্রহে ও গ্রাম পরিচয় দিয়ে যারা আমার এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের, বিশেষ করে শ্রীনরেশ গুহ, শ্রীদেবকুমার ঘোষ, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, শ্রীআশ্রয় তিলক গুহঠাকুরতা, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ও শ্রীবংশীধারী দাসের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। এ ছাড়া সম্পাদনায় সহযোগিতা করে আমাকে ঋণী করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ধর ও শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়। 'যুগান্তরে' প্রকাশিত পূব বাংলার ছেড়ে আসা গ্রামের কাহিনীগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষের কাছেও আমি বিশেষ ভাবেই কৃতজ্ঞ।

একটা কথা স্মরণীয়, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই কাহিনী লেখা নয়। গ্রামীণ মানুষের স্নেহ-লালিত চেতনা, জীবনের দুঃখ-মধুর স্মৃতি, আশৈশবের স্বপ্নপ্রেরণা এই কাহিনীগুলোকে আবেগ-প্রবণ করে তুলেছে। বস্তুতঃ, ছেড়ে আসা গ্রামের এক একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই সমগ্র গ্রামটির রূপ ভাষায় রূপায়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। জননী ও জন্মভূমি আমাদের কাছে স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। এই দৃষ্টি দিয়েই প্রত্যেকটি উদ্বাস্তু নরনারী তাঁদের জন্মভূমিকে দেখেছেন। এর ফলে অতি নগণ্য, অখ্যাত গ্রামকেও এই কাহিনীতে স্বপ্নসমৃদ্ধ রূপে প্রতিভাত করা হয়েছে। গ্রাম এখানে উপলক্ষ্য, গ্রামের মানুষই এখানে আমাদের লক্ষ্য। সেই সত্য দৃষ্টিতে মানুষকে ভালবেসে যারা এই পুস্তক পাঠ করবেন, তাঁরা এর প্রতিটি কাহিনীর অন্তরালবর্তী ভাগ্য-বিড়ম্বিত ছিন্নমূল বাঙালীর অন্তরের স্পর্শ অনুভব করতে পারবেন আশা করি।

২৫শে বৈশাখ,
১৩৬০

—দক্ষিণা রঞ্জন বসু

ঢাকা জেলা

বজ্রযোগিনী

কর্মমুখর নগরজীবনের এক সন্ধ্যায় সম্ভাষণ এলো এক আবাল্য বন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধু শুধু বন্ধুই নয়, যে আমার শিক্ষাজীবনের সহপাঠী, কর্মজীবনের সহযাত্রী তাঁর ডাকে পরম আগ্রহ নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। সবেমাত্র সে ফিরে এসেছে আমাদের দু'জনারই জন্ম-গ্রামের কোল থেকে। দেখা হতেই প্রশ্ন : তোমার জন্যে দেশ থেকে এনেছি এক পরম সম্পদ, বলো তো সে কী হতে পারে? ভাবতে চেষ্টা করলাম শতাব্দীর সন্ধিকালে এমন কী সম্পদ সে নিয়ে আসতে পারে দূরান্তরের সেই গ্রাম থেকে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বন্ধুটি তুলে দিল আমার হাতে এক কৌটো মাটি। আমার পিতৃ-পিতামহের আশিস্-পূত বসতবাটি 'বসু-বাড়ির ভিটে'র মাটি। এ মাটি আমার মা। এ মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্বপুরুষের যুগ-যুগান্তরের পুণ্য-স্মৃতি। আমার কাছে এ শুধু মহামূল্যই নয়— অমূল্য। মাথায় ঠেকালাম সে মাটি। এ মাটি ধুলো নয়। এ মাটি বাংলার হৃদয়-নিঙ্ড়ানো রক্তে সিক্ত আজ। তার দহন জ্বালায় সর্বংসহা ধরিত্রীর চোখ থেকেও ঝরছে অশ্রু-বহ্নি। জলে ঝাপ্সা হয়ে এলো দৃষ্টি। কেঁদে উঠলো অসহায় মন।

উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণে প্রমত্তা পদ্মা। মাঝখানে বহুর মধ্যে অন্যতম এই গ্রাম। বর্ষার প্লাবনে খরস্রোতা নদীর ঢেউ দোলন লাগিয়ে যায় আমার গ্রামের স্নিগ্ধ মাটির বুকে। বর্ষার বিক্রমপুরের রূপ অপরূপ! জলে জলময় ছল্-ছল্ সব পল্লী। একবারের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। একেবারে ছেলেবেলার কথা। ঘরে ঘরে সাঁকো। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেতে আসতে নৌকো। তার ওপর

বর্ষার জলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভাসিয়ে দেওয়া ছোটবড়ো কাগজী নৌকো, কলার মোচা ও কলাগাছের বাকলের নৌকোর ছড়াছড়ি। বাড়ির উঠোনে খেলে যায় ছোট ছোট মাছ। সে মাছ ধরার জন্যে ছোট বেলায় সে কী মত্ততা! সন্ধ্যা হতেই পাটক্ষেতে ধানক্ষেতে বঁড়শি পেতে রেখে আসার হিড়িক। ঘণ্টা দু'ঘণ্টা পর পর লণ্ঠন হাতে জল ঝাঁপিয়ে যেয়ে অনেক সময় হাস্‌তে হাস্‌তেই বঁড়শিতে সাপও তুলে নিয়ে এসেছে আমাদের মধ্যে অনেকে মাছের সঙ্গে সঙ্গে। সাপের ভয় ভয়ই নয় যেন! পুল থেকে দল বেঁধে লাফিয়ে পড়ে বর্ষার জলস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার আনন্দও ভুলে যাওয়া চলে না। এমনি কতো কী? শারদ বঙ্গের মাধুর্যও যেন ম্লান এখানে এক হিসেবে। মনে হয় বর্ষার বিক্রমপুরকে যারা দেখেনি, বিক্রমপুরের আসল রূপের সঙ্গেই তারা অপরিচিত।

আরো পরের কথা। আকাশে একটি দুটি করে সবেমাত্র তারা ফুটতে সুরু করেছে। তারই ছায়া পড়েছে গোয়ালিনীর কাকচক্ষু দীঘির জলে। কতকাল আগের কোন্ গোয়ালিনীর স্মৃতি বয়ে চলেছে এ দীঘি জানা নেই। তবে সে অজানা গোয়ালিনীর আভিজাত্য অস্বীকারেরও উপায় নেই। আমাদের বাড়ির সমুখ দিয়েই চলে গেছে বজ্রযোগিনী-মীরকাদিমের সড়ক। এই সড়কই আমাদের 'রাজপথ'। রাজপথের ধারে অনেক দীঘির মতো গোয়ালিনী দীঘিরও একদিন মর্যাদা ছিল। কিন্তু আজ সে হৃত-যৌবনা, তার কচুরিপানাময় জঞ্জাল রূপ আজ আর হয়ত কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আমরা ছোটবেলায় এ দীঘির ঘাটে বসে কত সময় কাটিয়েছি, কত গল্প করেছি, ছুরিতে কেটে ছেঁদা ঝিনুকে চেছেঁ দিনের পর দিন খেয়েছি কত কড়া-কাঁচা আম! সে সবই আজ স্মৃতি।

দীঘির পারের শ্মশানের আগুনের শিখাও চোখে ভাসে। কিন্তু আমার বাঙ্গাল দেশ জুড়ে আজ যে আগুন জ্বলছে তার লেলিহান শিখার, তার দাহিকা শক্তির প্রচণ্ডতার বুঝি তুলনা নেই! সে আগুনে ছাই হয়েছে মরা মানুষের অস্থি-মজ্জা-মেদ, এ আগুনে পূর্ণাহুতি তাজা তাজা হাজারো জীবন।

আমার গাঁয়ে পথ-চলতি মানুষ দলে দলে চলে উত্তরে দক্ষিণে—কাজ সেরে কেউ বাড়িমুখো, কেউ বাড়ি ছেড়ে কাজে, আবার কেউ বা হয়ত চলেছে আড্ডায়।

রাত পড়তেই পথের এপাশে ওপাশে কোন না কোন বাড়িতে নিশিকান্ত বা হরলালের কীর্তন আর না হয় শিশরির 'ত্রিনাথের মেলা'র গান সুরু হয়েছে বা হয় নি। এমনি ছিল আমার গাঁয়ের প্রায় প্রতিদিনকার সান্ধ্য পরিবেশ। সুখবাসপুরের সুধাকণ্ঠ গায়ক দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের বাড়িতে প্রায় রোজই শ্যামসঙ্গীত আর শ্যামাসঙ্গীতের আসর বসাতেন এবেলা ওবেলা। আর আমার ভক্তপ্রবর ঠাকুরদা স্বর্গীয় রাজমোহন বসু মজুমদার কেঁদে বুক ভাসাতেন সে সব গান শুনে। ভক্তিরসের বাহুল্য দেখে সেই ছোটবেলায় আমরা হয়ত অনেক সময়ই হেসেছি। কিন্তু দুর্গামোহনের—

"মা আছেন আর আমি আছি,
ভাবনা কি আর আছে আমার ?
মায়ের হাতে খাই পরি
মা নিয়েছেন আমার ভার।"

এ সব সুললিত গানের কথা আজো যে ভুলতে পারি নি! কর্মক্লান্ত দিনের অলস অবকাশে কলকাতার ফুটপাতে চলতে চলতে কতোদিন এসব ছায়া-ছবির মতো ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়।

আজো মনে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠে বিক্রমপুরের সেই গ্রাম, যে গ্রামের নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার নাড়ীর যোগ। যখনই চিন্তায় হাতড়াই, কাছে এসে পড়ে বজ্রযোগিনী গ্রামের স্বপ্ন-মাখানো স্নেহভরা সেই স্মৃতি। মায়ের মতো ভালবেসেছি এই গ্রামকে। আমার প্রায় সব-ভুলে-যাওয়া শৈশব আর সব-মনে-থাকা কিশোর-জীবনের কান্না-হাসির দোলার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে আমার সেই ছেড়ে-আসা গ্রাম।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বজ্রযোগিনীর নাম অবিস্মরণীয় সত্তা। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে এ গ্রাম লক্ষ গ্রামের দেশ বাংলায় যে কোন একটি নয়, স্বমহিমায় এ সবিশেষ। সুদূর অতীতের অন্ধকার যুগে বাঙ্গলার সত্যসন্ধানী যে ছেলে একদিন জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দূরধিগম্য হিমাচলের দুস্তর গিরিমালা অতিক্রম করে তুষার-ঘেরা ঘুমের দেশ তিব্বতে উপনীত

হয়েছিলেন ভগবান তথাগতের বাণী নিয়ে, সেই জ্ঞান-তাপস দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশের পুণ্য জন্মভূমি এই গ্রাম। কিন্তু আজ আর পুকুরপাড়ায় সেই দীপংকরের ভিটায় সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠে না বহুজনের কল্যাণ কামনায়, চলার পথে আজ আর হয়ত কোন মানুষ সে মহামানবের মহিমাকরুণার প্রত্যাশায় মাথাও নোয়ায় না ভক্তি-বিনম্রচিত্তে 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র সমুখ দিয়ে যেতে যেতে।

পাশের ঐতিহাসিক গ্রাম সেন রাজাদের অধিষ্ঠানভূমি রামপাল আজ শ্রীহীন। তার ভগ্নাবশেষের স্তূপের তলায় আশেপাশে অতীত স্মৃতির যেটুকু শুচিতা অবশিষ্ট ছিল তারও সবটাই হয়ত আজ বিনষ্ট। মাইল দীর্ঘ রামপালের সেই বল্লাল দীঘি। প্রজার জলকষ্টে দুঃখপীড়িতা রাজমাতা ছেলের কাছে জানিয়েছিলেন তাঁর মনের বেদনা। পরদিনই দীঘি খননের আদেশ হলো। রাজমাতা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যতদূর পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন ততদূর দীর্ঘ ও তার অর্ধেক প্রস্থ জলাশয় হবে, বল্লাল রাজার এই হলো প্রতিশ্রুতি। প্রজার জলাভাব মোচনে পথ চলায় রাজমাতার বিশ্রাম নেই। রাজ-পারিষদগণের চোখে-মুখে দেখা দেয় উদ্বেগের ছাপ। শেষটায় কি সারারাজ্য জলময় হয়ে যাবে! পায়ের সামনে অজ্ঞাতে আল্‌তা ঢেলে দিয়ে কৌশলে তখন কে থামিয়ে দেয় রাজমাতাকে পুরো এক মাইল পথ হাঁটার পর। রক্তচিহ্ন দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ান মা-রাণী। মাইলব্যাপী দীঘির জন্ম হলো রাতারাতি। সারা রাজ্য মুখর হয়ে উঠলো বল্লালরাজ ও রাজমাতার জয়ধ্বনিতে। কিন্তু আজ? আজ আর প্রজার দুঃখে রাজার মন কাঁদে না, এমন কি রাজমাতা, রাণী বা রাজ-ভগিনীদেরও নয়। সেখানে আজকের রাজা প্রজা রক্ষায় নয়, প্রজা হননে যেন উল্লসিত— রাজপুরুষেরা তারই নানা সাফাই গায় বেতারে, বক্তৃতায়! আজ আর জয়ধ্বনিতে নয়, ক্রন্দন আর্তনাদে সারা রাজ্য মুখরিত!

বল্লালদীঘির উত্তর পারের সুদীর্ঘ গজারী গাছ আজো সেন রাজার উদার উন্নত মনের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে কিনা জানি নে, তবে চার বছর আগেও জীর্ণ সে গাছের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি প্রায় আটশ' বছর আগের গৌরবময় অতীতকে। প্রচলিত ধারণা, রাজার হাতি বাঁধা থাকত এ গাছে।

কিন্তু দৈবপ্রভাব ছাড়া শ' শ' বছর ধরে কি করে একটা গাছ সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, বিক্রমপুরের মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসা অতি পুরাতন। ছেলে-মেয়ের দীর্ঘায়ুর আশায় কত মা এই অমর গাছের শীতল ছায়ায় বসে মানত করেছে, প্রার্থনা জানিয়েছে ভগবানের কাছে। কিন্তু আজকের ভগবানের দরজায় কি মানুষের কোন প্রার্থনাই পৌছায়? পূব বাংলায় আজ যাঁরা ক্ষমতার মালিক তাঁদের দম্ভকে স্বীকার করে আজো কি সেই গজারী গাছ তার অমরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে?

রামপালের হরিশ্চন্দ্রের দীঘির আশ্চর্য কাহিনীও বিস্মৃত হবার নয়। কতবার মাঘীপূর্ণিমার দিনে এ দীঘির অলৌকিক ব্যাপার দেখতে গিয়েছি বড় ঠাকুরদার সঙ্গে, আশপাশের গ্রাম থেকে এসেছে দলে দলে নরনারী আর ছাত্র-শিক্ষকের দল। সারা বছর ধরে যে দীঘির জল থাকে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে 'দাম'-বনজংলায় ঢাকা, মাঘী পূর্ণিমায় তার সে কী সজল হাসি মাখানো রূপ! যে 'দামে'র ওপর গরু চরে, ছেলেরা ঘুড়ি উড়ায়, পাখি ধরে, সাপ তাড়া করে দৌড়য় দিনের পর দিন, সে 'দাম' এই একটি দিনের জন্যে দীঘির জলের কোন্ অতল তলায় তলিয়ে যায় কে জানে? পূর্ণিমা পেরিয়ে গেলে আবার ভেসে ওঠে যেমনি তেমনি। বৃটিশ সরকার এ বিস্ময়ের যবনিকা উত্তোলনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ প্রাচীন কীর্তির অবমাননাকারীর দণ্ড ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'হাকিম নড়লেও হুকুম নড়ে না,' এ প্রবাদ হয়ত শুধু প্রবাদই। তা' ছাড়া পূব বাংলায় আজ হয়ত কোন হুকুমেই পরোয়া নেই কারুর। মানুষের জীবনেরই কোন মূল্য নেই যেখানে, সেখানে অজানা অতীতের হিন্দু কীর্তি রেহাই পাবে অমর্যাদার হাত থেকে এ আশা দুরাশা বৈ কি? তবু আশা হয় ভেঙে গেছে যেই স্বপ্ন, বাংলার বহ্নি-হৃদয়ে আবার উজ্জ্বল হয়ে আলো দেবে সেই স্বপ্ন।

কলকাতার মানুষ হয়ে গেছি আজ। কিন্তু জন্মেছিলাম যার আঁচল-জড়ানো কোমল মাটির নরম ধূলোয় তাকে তো ভুলতে পারি নি। দুঃখ আছে মনে, দিন-রাত্রির খাটুনিতে অবসাদ নামে দেহে, আর্থিক দৈন্যও থেকেই যায়। তবু ছুটি পেলেই একছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে প্রায় তিন শ' মাইল দূরের সেই গ্রামে!

জুড়ে বসে 'পলৈয়া'র মেলা। অফুরান আনন্দের ঝড় বয়ে যায় ক'দিন ধরে এ উপলক্ষে। চৈত্রমাসে নীলোৎসবে চড়কপূজা ও 'কালীকাছে'র নাচের কথা ভুলে যাওয়া বিক্রমপুরের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এই 'কালীকাছে'র নাচে ভট্টাচার্য পাড়ার দলই ছিল সবার সেরা। আর সত্যি নাচে-গানে এ পাড়ার নামই ছিল সব চেয়ে বেশি। সোমপাড়া-ভট্টাচার্যপাড়া 'এ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাব'ও ছিল এ পাড়াতেই এবং এই নাট্যাভিনয় ক্লাবটি ছিল আমার গাঁয়ের একটি গৌরবের বিষয়।

শ্রাবণ মাস পড়তেই ধুম পড়ে যেত মনসার পাঁচালী গানের। মূলগাইয়ে ছিলেন স্বর্গীয় লালমোহন বসু মজুমদার মশাই। মনসার ভাসান গান সম্পর্কে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। তিনি নিজেই তিন খণ্ডে এক পাঁচালী লিখে ফেলেছিলেন। আর সারা শ্রাবণ মাস ধরে সে পাঁচালীর গানই গাওয়া হতো। লালমোহন, হরিমোহনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরতাম আমরা সব ছেলেমেয়ের দল, 'পদ্মে গো পুরাও মনের বাসনা' বলে। কীইবা আমাদের এমন বাসনা ছিল? সাপের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই তো ছিল আমাদের আকুল আবেদন। দেশ বিভাগের যে বিষ-যন্ত্রণা আমরা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি তার তুলনায় সাপের কামড়ও যে নিতান্তই সামান্য!

পড়ার জীবনের অনেক স্মৃতিই আজ সামনে এসে ভিড় করে। মনে পড়ছে নাহাপাড়ায় হরিমোহন বসুর পাঠশালার আটচালার কথা। হাতেখড়ি হরিমোহনের কাছেই, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কতোদিন পড়া ফাঁকি দিয়ে পাঠশালা পালাতাম দল বেঁধে ঘুড়ি ওড়াতে কি হাডু-ডু খেলার নেশায়। যখন আকাশ বেয়ে নামতো বৃষ্টি আমাদেরও মনের দিগন্তে তখন শাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে আসতো ছুটির আমন্ত্রণ। হাই-স্কুলের ছোটখাটো মানুষ হেডমাষ্টার অম্বিকাবাবুর চলন, চেহারা ও চাহনিতে অধ্যয়নার্থী ছাত্রদের জাগাত হৃদ্‌কম্পন। তাঁর চলার পথে দু শ' হাতের মধ্যে যেতে সাহস হতো না কারুর। অথচ কী ভালই না বাসতেন তিনি ছাত্রদের। আদিনাথবাবু, তারাপ্রসন্নবাবু, পণ্ডিত মশাই, বিরজা বাবু এঁরা সবাই ছাত্রবন্ধু। স্নেহে ও শাসনে বাপ-মায়ের মতো আপন। অথচ দেশে গিয়ে এঁদের দেখা পাব এমন ভরসা কি আর আছে?

মাষ্টার ধীরেনবাবু ইতিহাস পড়াতেন আমাদের। খুব ভাল লাগতো তাঁর মুখে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কথা শুনতে এবং বইয়ে পড়তেও। পরীক্ষার আগে ইতিহাসের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তাম। মধ্যরাত্রে দক্ষিণের বিলে নলখাগড়ার বন থেকে ভুতুমের ডাক শুনে জেগে উঠে আবার সুরু করতাম ধীরেনবাবুর ইতিহাসের পড়া। সেই ধীরেনবাবুই ছিলেন গত কয় বছর ধরে আমাদের জয়কালী হাইস্কুলের হেড-মাষ্টার। কিছুদিন আগেও শুনেছিলাম সাহস করে তিনি তখনও আমাদের গ্রামেই আছেন। তাঁর সাহসিকতাকে নমস্কার জানিয়েছিলাম সে কথা শুনে। কিন্তু একী, তিনিই হঠাৎ একদিন আমার আফিসে এসে হাজির তাঁর দুঃখের কথা জানাবার জন্যে! তাঁর যে ছাত্র তাঁকে সপরিবারে মানে মানে সরে পড়ার পরামর্শ দিল, গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পথে তারই সাঙ্গোপাঙ্গোদের হাতে আটক পড়তে হলো তাঁকে সদলবলে। প্রিয় ছাত্রের মধ্যস্থতায় শ' দুই টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে গুরুমশাই ছাড়া পেয়ে কোনক্রমে পরিজনসহ পদ্মা পেরিয়ে কলকাতায় এলেন বটে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সরল-মন শিক্ষকের বিস্ময় কাটলো না—এ কী হলো, কেমন করে হলো, এ সব প্রশ্ন ঘিরে রইল তাঁর মনকে! একলব্যের কাল আজ অতলান্ত অতীতের গর্ভে, সে আর ফিরে আসবে না জানা কথা। তা'হলেও সদ্য স্বাধীন দেশে, এ বাংলারই মাটিতে যে গুরুদক্ষিণা দেয় হবে গুরুমশাইয়ের আর ছাত্র হবে গ্রহীতা, এ ছিল অকল্পনীয়। তবু তাই হলো এবং তাই পাকাপাকি নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে কিনা নতুন শরিয়তী রাজত্বে, কে তা বলতে পারে?

কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়েছি। কলকাতায় এসে খবর পৌঁছুলো ভুখা বাংলার পঞ্চাশী মন্বন্তরের হিংস্র আক্রমণে বজ্রযোগিনী মুমূর্ষু। বুদ্ধুদা, অমিয়দা প্রভৃতির সাহায্যে কলকাতায় বজ্রযোগিনী সমিতি গড়ে উঠলো হীরালাল গাঙ্গুলী মশাইকে সভাপতি করে। অর্থ আর অন্নবস্ত্র সাহায্য সঙ্গে করে গ্রামের পথে পা বাড়ালাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। দিগন্ত ছোঁয়ানো আকাশে ম্লানমেঘের ছায়া। আকাল।

আঠাশ পাড়ার গ্রাম বজ্রযোগিনী কণ্ঠাগতপ্রাণ। বকুলতলার ঘাটে স্নানার্থী জলার্থী মেয়েদের আর ছেলেদেরও ভিড় যেখানে জমে উঠতো, সেখানেও বিরলতর হয়ে আসে সন্ধ্যা-গুঞ্জন। সোমপাড়ার পুলে কত অক্লান্ত আড্ডা জমিয়ে পথচারীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে পাড়ার ছেলের দল। সে বছর সেখানেও দুরন্তদের ভিড় নেই। সোমপাড়া আমার শৈশবের স্বপ্নভূমি।

মন্বন্তর সর্বভুক সরীসৃপের মতো গ্রাস করে নিচ্ছিল গ্রাম-হৃদয় বাংলার জীবন। মনের টানে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা নিয়ে সেদিন গিয়েছিলাম গ্রামে। খবর শুনে এলেন এক মাষ্টারমশাই। বল্লেন : 'মনে রেখেছ বাবা গ্রামকে? গ্রাম যে যায়। আমরা শিক্ষক। আমাদের আর কি আছে, তোমরা ছাত্ররাই আমাদের যা কিছু সম্পদ।' আনন্দে যেন উচ্ছ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। আমার স্কুল জীবনের উত্তর-তিরিশের আধা-প্রৌঢ় গুরুমশাইয়ের চোখে মুখে বার্ধক্যের নামাবলী। সবগুলো চুল গেছে পেকে। সময় যে নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে চলেছে এ তারই স্বাক্ষর।

তারপরে চলে গেলো আরো কত বছর। নাড়ীর টানে বার বার ছুটে গিয়েছি গ্রামে। তার মায়ের মত স্নেহস্পর্শে অবুঝ হয়ে উঠেছে মন। দূর গ্রামের মুসলমানদের এক মেয়ে, ডাকতাম তাকে মধুপিসী বলে। কেউ নাকি ছিল না তার। প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি। আমরাই তার সব, এ কথা যে কতবার সে আমাদের বলেছে তার লেখাজোখা নেই। তার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করিনি কোনদিন। কোনদিন মনে হয়নি মধুপিসী মুসলমান। নিজের বাড়ির এটা ওটা, মাঠের ফল-মূল-শাক প্রায়ই সে নিয়ে আসতো আমাদের জন্যে। সাগ্রহে পরমানন্দে মধুপিসীর দেওয়া সে সব জিনিষ গ্রহণ করতাম।

শুধু কি এই? একদল বিহারী দেহাতী মানুষ—প্রতিবছর পূব বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যারা এসে সাময়িক আস্তানা গাড়ে তার একটা বড় অংশ এক রকম পাকাপাকিভাবেই রয়ে গিয়েছিল এই গ্রামে; আমাদের গ্রামের মানুষই হয়ে গিয়েছিল তারা—আমাদের সঙ্গে একাত্মা। তারা ডুলি পাল্কি বইত, অনেকে এমনি আর সব কাজ-কর্মে রুটি জোগাতো নিজেদের। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রায়

বাহাদুরের বাঁধা পাল্‌কি ছিল একটা। তাঁর চারজন বেহারাও ছিল নির্দিষ্ট। তারাই ছিল গ্রামের বিহারীদের মোড়ল। আজো কি তারা আমার গ্রামে আছে?

আমার সোনার গ্রাম! সিদ্ধা যোগিনী বরদার নাম-মহিমায় মহিমান্বিত এ গ্রাম। সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল এক সময় এ জনপদ। গোবিন্দ বেদধ্যায়ী, প্রসন্ন তর্করত্ন, শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীনাথ শিরোমণি ও দ্বারিকানাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি ভারত-খ্যাত পণ্ডিতেরা এ গ্রামেরই সন্তান। আমার গাঁয়েরই নাহাপাড়ায় জন্মেছিলেন লোককবি আনন্দচন্দ্র মিত্র। আনন্দচন্দ্রের হেলেনাকাব্য, মিত্রকাব্য বিবিধসঙ্গীত প্রভৃতি রচনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বড় দুঃখেই কবি গেয়েছিলেন—

(এসব) দেখে শুনে এ দুর্দিনে বল মা তারা, যাই কোথা?
মিলে যত ভণ্ড ষণ্ড দেশটা করলে লণ্ডভণ্ড;
ধর্মকর্ম ধোকার টাটি, (যত) বদমায়েসির ফাঁদ পাতা!

... ...

না জানি কি কপাল দোষে, হতভাগ্য বঙ্গদেশে
পশুর বেশে অসুর সৃষ্টি কল্লে দারুণ বিধাতা!
দেশ হয়েছে আস্ত নরক! একদিনেতে এসে মড়ক,
গো-বসন্তে উজাড় করলে তবে যায় মনের ব্যথা!!

প্রায় একশ' বছর আগের বাংলা দেশের অবস্থায় যে কবির কোমলপ্রাণে দেখা দিয়েছিল এমনি মর্মপীড়া, আজকের হতভাগ্য বাঙ্গালীর অবস্থা দেখতে হলে কী করে তা সহ্য করতেন কবি তা কি আমরা কল্পনাও করতে পারি?

'জাতের নামে বজ্জাতি' যারা করে তীব্র কশাঘাতে তাদের সংশোধনের কত চেষ্টাই না করেছেন চারণ-সম্রাট মুকুন্দ দাস! মুকুন্দ দাসের যাত্রাগানের কথা বাঙ্গালী কি ভুলতে পারে কোন দিন? ছোটবেলায় আমাদের গাঁয়েই শুনেছি তাঁর কত পালাগান। বাঙ্গালীর অধঃপতনে তাঁরও খেদের অন্ত নেই। তিনিও গেয়েছেন—

মানুষ নাই এদেশে—

সকল মেকি সকল ফাঁকি,

যে যার মজে আপন রসে।

আর তারই প্রতিফল আমরা আজ ভোগ করছি হাতে হাতে। চারণ-সম্রাট আজ আর বেঁচে নেই, তাঁর জন্মগ্রাম বিক্রমপুরের বানারিও কীর্তিনাশা পদ্মার গর্ভে। আর পদ্মাগর্ভে যাওয়াও যা, পাকিস্তানের কুক্ষিগত হওয়াও প্রায় তাই। তাই বানারির জন্যে বেশি দুঃখ করার আর কি আছে! সারা পূব-বাংলা ছাড়াই তো আমরা। রাজা রাজবল্লভের রাজনগর আর চাঁদ রায়-কেদার রায়ের রাজবাড়ি গ্রাস করেই তো পদ্মা নাম নিয়েছে কীর্তিনাশা। পদ্মার কবল থেকে রক্ষা পেলেও পাকিস্তানের হাত থেকে রেহাই পাবার তো উপায় ছিল না। আজ তাই তো ভাবি, আমার গ্রাম যে থেকেও আর আমার নয়। সে না-থাকার ব্যথা যে আরো দুঃসহ!

যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সারা ভারতের মুক্তির সাধনায় সর্বত্যাগী তাঁর পিতৃপুরুষের বাসভূমি আমার গাঁয়ের অদূরবর্তী তেলিরবাগ গ্রাম স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়—সে পুণ্যক্ষেত্র আজ বিদেশে, বিদেশীর শাসনাধিকারে, এ ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু কী হবে ভেবে?

কে জান্‌তো এমনি করে ছেড়ে আসতে হবে গ্রামকে। শরণার্থী পরিজন পরিবেশে এই মহানগরীর এক প্রান্তে সংকোচে আজ দিন কাটাই। তবু আশা জাগে, আজ যে দেশ দূর, দুঃশাসনের হাত থেকে সে দেশকে, সোনার বাংলার হৃদ্‌পিণ্ড সে বিক্রমপুরকে ফিরে পাব আমার মনের কাছে শুধু নয়, ভারত খণ্ডে।

সাভার

প্রতি অঙ্গে সে গাঁয়ের স্পর্শ। বড়ো মিঠে·· বড়ো মধুর। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওখানেই তো চল্‌তে শিখেছি। ওরই হিজলতলায়, পদ্মবিলে, ধলেশ্বরীর উচ্ছল স্রোতে সারা শৈশবটা কেটেছে। বুধু পণ্ডিতের পাঠশালা, বুড়ো বটের দীঘল জটা কতো স্মৃতির মাধুর্যেই না তা মধুময়!

ময়ূরপঙ্খীর গল্প শুনতে কতোদিনই না বসেছি ধলেশ্বরীর ধারে। সন্ধ্যা নেমেছে। চাঁদ উঠেছে কালো গাঁয়ের মাথায়। শত মুক্তোর প্রাচুর্য নিয়ে মাতাল হয়েছে ধলেশ্বরী। এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে আছড়ে পড়েছে ঢেউয়ের দোলায়। চেয়ে রয়েছি, কেবল চেয়ে থেকেছি।

সন্ধ্যের ঝিরঝিরে হাওয়ায় নোঙর খুলে পাল তুলেছে মাঝি-মাল্লারা। তাদের কলকণ্ঠে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠেছে যেন জ্যোৎস্নাস্নাত নিবিড় আকাশ। দিগন্ত তুলেছে প্রতিধ্বনি। কিশোর মন সন্ধান করেছে মধুমতির দেশের, ঐ বাঁক পেরিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে।

কেষ্ট বৈরাগীকে ভুলতে পারি? কতো ভোরেই না ঘুম ভেঙেছে তার সুললিত গানের সুরে। মায়ের আঁচল ধরে কতোদিনই না বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। ভোরের হাওয়া আমার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে গেছে মায়ের স্নেহের মতো। আমার আঁখির আবেদনে আবার নতুন করে গান ধরেছে কেষ্ট:

"সখিগো···ওগো প্রাণ সখি!
এই করিও তোমরা সকলে,
না পুড়াইও রাধা অঙ্গ
না ভাসাইও জলে,
মরিলে বান্ধিয়া রেইখো তমালেরি ডালে···গো।"

বিরহিনীর অশ্রু-ভেজা এ অন্তিম আবেদনে কৈশোরের অবুঝ মনও কেঁদে উঠেছে। কেষ্ট বৈরাগীর মরমী সুর ধলেশ্বরীর পলিমাটির মতোই নরম।

এমনি কতো টুকরো টুকরো স্মৃতি আর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা আমার গ্রাম সাভার, ঢাকা জেলার একটি প্রধানতম বাণিজ্য কেন্দ্র। বুকে তার কতো শতাব্দীর অক্ষয় ইতিহাস, অতীত সভ্যতার বিলীয়মান কংকাল। এখানে রাজ্য ছিল, রাজা ছিল একদিন, ছিল শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রাণবান প্রবাহ। এ দেশের বাণী সেদিন পৌঁছুত দূর দূরান্তে···হিমালয়ের শিখরচূড়া পেরিয়ে। দীপংকরের জ্ঞানের প্রদীপ এখানেই প্রথম জ্বলেছিল—গুরুগৃহে তাঁর শিক্ষা সুরু হয়েছিল এখানে। সেদিনের সাভার ছিল সর্বেশ্বর নগরী, রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজধানী, সর্ব-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। বৌদ্ধধর্মের বন্যা নেমেছিল এর দিকে দিকে। ধর্মরাজিকা কতো বিহার মাথা তুলেছিল এ অঞ্চল ঘিরে। কতো ভক্তমনের অন্তর মহলে ঠাঁই করে নিয়েছিল সর্বেশ্বর নগরী—আমার সাভার।

সেদিনের স্মৃতি আজও নিঃশেষ হয় নি। 'রাজাসনে' আজ রাজার আসন না থাকলেও সে গৌরবময় দিনের কতো স্বপ্ন-কথা এর মাটির অংকে অংকিত রয়েছে। সেদিনের কতো অস্পষ্ট স্বাক্ষর দিকে দিকে আজো বর্তমান। কর্ণপাড়ার ভগ্নস্তূপ, 'রাজাসনে' রাজপ্রাসাদের শেষ চিহ্ন কোর্ট বাড়ি আজও তো পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরাও কি আর কম ঘুরেছি? কতোদিন, কতো কাঠফাটা রোদ্দুরে বাড়ি থেকে পালিয়েছি দলবেঁধে। একটা নতুন কিছু যেন আবিষ্কারের ইচ্ছে। দুধসাগর, নিরেমিষ, লালদীঘি এমনি কতো পুকুরের ধারে ধারেই না সারাটা বেলা কেটেছে। রবীন্দ্রনাথের সে ক্ষ্যাপার মতো আমরা যেন করে ফিরেছি সে পরশমণির অনুসন্ধান। আম গাছের ছায়ায় বসে বসে ডাক দিয়েছি রমজানকে, আজমত শেখকে। রাজাসনের এখানে ওখানে আজ ওদেরই উপনিবেশ। দুধে ধোয়া শাদা বাবরি নেড়ে রমজান বলেছে কতো গল্প, কতো পুকুরের ইতিবৃত্ত: নিরামিষ্যিতে মাছ থাহে না কর্তা, ওডা রাজার মা'র পুকৈর।—অবাক হয়েছি। বোবার মতো চেয়ে রয়েছি রমজানের দিকে। কোদাল ধোয়ার ইতিহাস বলেছে

রমজান, কোটরাগত চোখ দুটো টেনে টেনে। ওটাই নাকি রাজা হরিশের শেষ পুকুর। শত পুকুর শেষ করে ওখানেই নাকি কর্মীরা কোদাল ধুয়ে উঠেছিল। —রমজান তার নানার কাছ থেকে শুনেছে সে সব কথা। সেদিন রমজানের কোন কথাই অবিশ্বাস করিনি। সাভারের এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে থাকা শত শত পুকুর দেখে বুড়ো রমজানের কথা সত্যি বলেই মনে হয়েছে।

আজ আরো কতো কথাই না মনে পড়ে। স্মৃতির মণিকোঠায় বিগত দিনের কতো ছবিই না জ্বলজ্বল্ করে ওঠে। যখন ভাবি, কিশোর বেলার স্বপ্ন-ছাওয়া সে গ্রামখানি থেকে কতো দূরে সরে এসেছি, যখন মনে হয় দেশ বিভাগের পাপে আত্মার আত্মীয় সে গাঁওখানি আমার, আজকে বুঝি পর হয়ে গেলো, তখন সজল চোখের আরশি দুখানি কতো বিচিত্রতর ছবিতেই না ভরে ওঠে! গত দিনের কতো কথা ও কাহিনী মনের দোরে এসে বারে বারে ঘা মেরে যায়।

মনে পড়ে নববর্ষের কথা। বৈশাখের রুদ্রদূত নতুনের জয়পত্র নিয়ে আসে। সারা গাঁয়ে পড়ে যায় সাড়া। দোকানীদের দোকানগুলো ফুলে পাতায় সেজেগুজে নতুনকে জানায় অভ্যর্থনা। গাঁয়ের মেটো পথ মুখর হয়ে ওঠে আনন্দপাগল ছেলে-ছোকরাদের কলকণ্ঠে। অপূর্ব হয়ে ওঠে সারা গাঁওখানি। অপূর্ব মনে হয় জীবনের স্বাদ।

বিকেলের দিকে মেলা বসে। পাঠানবাড়ির বটের ছায়ায়। নমপাড়ার হীরু সর্দার, বক্তারপুরের জনাব আলিরা সুরু করে ছড়ি খেলা। আগ্রহাকুল দর্শকেরা ভিড় করে থাকে চার পাশে। প্রতি বছর প্রতি বৈশাখের প্রথম দিনটি এমনি কতো সর্দারের ছড়ির প্যাচেই না হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত! বিজয়ীর সর্বাঙ্গে কতো জনেরই না উৎসুক দৃষ্টি পিছলে পড়ে!

হিরু সর্দারের নাম আছে। ঝাঁক্ড়া চুলে ঝাঁকুনি মেরে সে যখন ছড়ি নিয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে নতুন মানুষ বলে মনে হয়। দীঘল দুটি চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে আগুনে দৃষ্টি। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকের পাটাটাও যেন ফুলে ফুলে ওঠে। হেই…হেই…সামাল…সামাল…শব্দ করে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে হীরু সর্দার। পায়ের তলায় মাটি যেন একেবারে কেঁপে ওঠে। উৎসুক জনতার অজস্র

করতালির ভেতর খেলা শেষ করে কোমরের গামছা খুলে হীরু বাতাস করতে থাকে। গাঁয়ের মেয়েরাও আড় চোখে দেখে যায়।

বর্ষা নেমে আসে। শাওনের ঢল নামে গাঙে। নব-যৌবনা ধলেশ্বরী আপন গরবে ফুলে ওঠে। ওপারের কাশবন ডুবে যায়। মজে যাওয়া খালগুলো ছল্ ছল্ করে ছোটে; চাষীপাড়ার এক একটি কুটিরকে এক একটি দ্বীপের মতো দেখায়।

শাওনের অঝোর ঝরা রাতের একটি ছবি মনে ওঠে। গাঙিনীর জলে হেলে-দুলে একটি ভেলা ভেসে চলেছে। তালীবন শেষ হলো। সমুখে শুধু জল আর জল। বেহুলার অকম্পিত বুক। মা কাঁদছে, ভাই কাঁদছে, কাঁদছে প্রতিবেশীরা। বেহুলার সংকল্পের পরিবর্তন নেই!

মনসা পুজোর সাথে অংগাঙ্গি জড়িয়ে আছে এই বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। পল্লীকবি জিইয়ে রেখেছে চাঁদবেনের কথা। ভাসান গানের স্বরে স্বরে বেহুলার অবাধ অশ্রু আজও উছলে ওঠে। সনকার অশ্রুজলে কতো সন্ধ্যায় কতো মায়ের বুকও ভিজে যায়।

এ অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এই গান। রাতের পর রাত গান চলে। বেহুলা লখীন্দরের প্রথম পরিচয় থেকে বিদ্রোহী চাঁদের অন্তিম পরাজয় পর্যন্ত। হিন্দু-মুসলমান সমান সরিক সে গানের। মাখন দাঁ, এমন কি কেদার মুন্সীও। বেহুলার অটল সংকল্পে ভাই-এর ব্যথা যখন মূর্ত হয়ে ওঠে এ গানে—

"না যাইও না যাইও বইন
শুনলো মোর মানা;
তুমি গেলে বইন লো আমার
মায় যে বাঁচব না।"

তখন কতোদিন লুঙ্গীর কোণে ছাবেদালী বেপারীকে চোখের জল মুছতে দেখেছি। হিঁদুর 'কেচ্ছা' সেদিনও মুসলমানের 'গুণাহ' বলে বিবেচিত হয়নি। সনকার অশ্রুর আড়ালে তারা যেন তাদের ব্যক্তিক দুঃখেরই ছবি দেখতে পেয়েছে।

শরতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। এই সময়টির জন্যে সারা বছর ধরে কী বিপুল প্রতীক্ষা! সে কী আয়োজন! প্রবাসীরা ঘরে ফিরছে। ধলেশ্বরীর কূলে রোজই এসে নতুন নতুন নৌকো লাগ্‌ছে। আমরা ছেলেরা যেথে ভিড় করে দাঁড়িয়েছি। ক'দিনের জন্যে গাঙ্‌খালি লোকে ভরপুর। সবার সাথে আবার নতুন করে পরিচয়।

হিন্দু প্রধান গ্রাম সাভার। পূজো এখানে বেশ কয়েকখানিই হয়। তার মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর পাড়ার বারোয়ারী দুটিই প্রধান। আগে উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা হতো, প্রতিমা তৈরী থেকে আরম্ভ করে গান-বাজনা নিয়েও। দক্ষিণীরা ঢাকা থেকে কারিগর আনালে, উত্তুরেরা বিক্রমপুর পর্যন্ত ছুটতো। দক্ষিণীরা তিন রাত গানের ব্যবস্থা করলে, উত্তুরেরা নট্ট কোম্পানীর যাত্রাদলের সঙ্গে পাঁচ রাতের চুক্তি করে বসতো। সন্ধ্যে থেকে সুরু করে সারা রাত চল্‌তো গান। এপাড়া 'হরিশ্চন্দ্র' বই নির্বাচন করলে ও পাড়ায় আরম্ভ হয়ে যেতো 'রামচন্দ্র'।

ছোটবেলায় দেখেছি দুর্গাপূজোয় মুসলমানের আনন্দও কম নয়। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের ঘরেও আস্‌তো নতুন কাপড়। মুসলমান মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখে বেড়াতো। রঙ-বেরঙের লুঙ্গী পরে গলায় গামছা ঝুলিয়ে এ-গাঁয়ের সে-গাঁয়ের মুসলমানেরা সকাল সকাল ঠাঁই করে নিতো যাত্রার আসরে। 'রামচন্দ্র' কিম্বা 'হরিশ্চন্দ্র' পালায় হিন্দুর সঙ্গে তারা সমান ভাবেই হেসেছে ও কেঁদেছে। পূর্ব-বাংলায় দুর্গাপূজো ঠিক এমনি করেই হয়ে উঠেছিল সর্বজনীন উৎসব।

কোকিল-ডাকা বসন্তে আর একটি উৎসবে এ অঞ্চল মেতে উঠতো। এটা যেন সত্যিকারের গণ-উৎসব। এতে চাষীদেরই উৎসাহ বেশি। ষাট বছরের বুড়ো পাঁচু মণ্ডল হলুদ বরণ কাপড় পরে পা দুটিতে ঘুঙুর বেঁধে দুলে দুলে নাচতেও লজ্জা করেনি। সারা বছরের দৈন্যে ভরা জীবনকে ভুলে তারা যেন কেবল মুঠো মুঠো আনন্দ কুড়িয়েছে।

শিবপূজো বা শিব খাটুনাও সাধারণ মানুষের উৎসব। এ অঞ্চলে এর প্রাধান্য কম নয়। অন্তত দশ বিশ দল তো প্রতি বছরই আমাদের বাড়িতে এসে হাজির

হয়েছে। শিব ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করেছে এরা। গলায় কয়েকখানি 'মেডেল' ঝুলানো ঢাকি হরকেষ্টার ঢাকের তালে তালে বুড়ো-কাঁচায় সমান হয়ে নেচেছে। নাচনার শেষে গান ধরেছে প্রেমানন্দ। উমার গান, নিমাইসন্ন্যাসের গান। ডান হাতে মাথাটি রেখে প্রেমানন্দ যখন গেয়েছে—

'সন্ন্যাসী না হইও রে নিমাই
বৈরাগী না হইও,
(ওরে) ঘরে বইসে কৃষ্ণ নামটি
মায়েরে শুনাইও।'

তখন মায়ের চোখ দুটি কোন্ সে ব্যথার অনুভূতিতে যেন টল্ টল্ করে

দিনে 'খাটনা', রাতে 'কাছ'। 'কাছ' কথাটি এ সময় সম্পূর্ণ এক নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নানাপ্রকার রংগরসের ভেতর দিয়ে 'কাছ'নাচের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যেন বাংলার আদিম নৃত্য। জনসাধারণের কাছে অসীম এর আবেদন। ছেলেবেলায় মায়ের বকুনি খেয়ে সারারাত্রি জেগে বাড়ি বাড়ি এ 'কাছ' দেখে ফিরেছি। মহাদেব ঠাকুর যদি তার দীর্ঘ ত্রিশূলটি হাতে দিয়ে দুএকটি কথা বলেছে, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। হিংসুটে রাধাবল্লভটা অনুতাপে জলে জলে মরেছে। সে আনন্দ, সে অনুভূতি আজো উপলব্ধিতে জাগে। 'মুখা কাছ' দুর্লভ শীল আজো মনের নিভৃতে অগোচরে উঁকি দিয়ে যায়। তাদেব কি ভুলতে পারি ?

কতো মধুরই না ছিল সে সন্ধ্যেগুলো। তাল-তমালের ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপ জলতো, শাঁখ বাজতো, কর্মক্লান্ত দিনের শেষে সারা গাঁও জুড়ে নেমে আসতো একটা নিবিড় প্রশান্তির ছায়া। দোকানী ফিরতো হাট থেকে, মাঠ থেকে ফিরতো রাখালেরা। সন্ধ্যার আঁধারে তলিয়ে যেতো সকল বিচ্ছিন্নতা। নীরব নিথর গ্রামখানি দাঁড়িয়ে থাকতো পূজারীর মতো—একক—একনিষ্ঠ।

যেদিন চাঁদ উঠতো আকাশে, সেদিনের আর এক ছবি। ফুলকেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে সুরু হতো আলো-আঁধারের খেলা। জুঁই ফুলের গন্ধে বাতাস হতো মদির, স্বপ্নময় হয়ে উঠতো আমার গাঁওখানি।

মেয়ে মহলে সেদিন যেন মহোৎসব। সকাল সকাল সান্ধ্য আয়োজন শেষ করে দুর্গা খুড়োর পাকা উঠোনে সবাই এসে ভিড় কর্‌তো।

প্রিয়দার বৌ আসতো কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে, নেরুর মা আসতো হাতের চেটোয় 'সাদার' গুঁড়ো নিয়ে। এমন কি ফুলী আর সুধী বোন, যারা সূর্য সাক্ষী করে পরস্পরের মুখ দর্শন পর্যন্ত বন্ধ করেছিল, তারাও এসে পাশাপাশি মুখ ফিরিয়ে বসে থাকতো। হায়রে! সে নিবিড়তা, সে মাখামাখি চিরকালের মতোই কি শেষ হলো?

মতি সাধুকে ভুলবো না। কীর্তনীয়া মতি সাধু। দেশ-বিদেশে তার নাম-ডাক। অমন মধুর কণ্ঠ, অমন ভাবানুভূতির তুলনা খুঁজে পাইনে—আজো যেন মনে লেগে আছে। অমন প্রাণ দিয়ে গান গাওয়া আর কি শুনতে পাব?

গোপাল আখড়া, হরি আখড়া, বড়ো আখড়া। গাঁয়ের এক একটি কেন্দ্র এ আখড়াগুলোতে কতোদিন মতির গান শুনেছি। জলকেলি, মাথুর প্রভৃতি পালা। হাতে চামর নিয়ে হেলে দুলে গান করেছে মতি সাধু। গলায় ঝুলোনো গাঁদা ফুলের মালা এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়েছে। মাথুর পালার গান ধরেছে সে এই বলে—

'সর্ব অংগ খেয়োরে কাক
না রাখিও বাকি,
কৃষ্ণ দরশন লাগি
রেখো দুটি আঁখি।'

দোহারীরা সুর ধরেছে, তাল রেখেছে। তন্ময় হয়ে মতি সাধু সুরু করেছে কথকতা: ওরে কাক, ওরে তমাল-ডালে বসে থাকা কাক! তুমি আমার সর্বাংগ নষ্ট করো। কিন্তু যে কৃষ্ণের বিরহ ব্যথায় আমি জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে মরছি, সেই নিঠুর কৃষ্ণের দর্শন অভিলাষী আমার এই আঁখিযুগল কেবল তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। এ দুটো তুমি বাকি রেখো।

কথকতার পর আবার সুর ধরেছে মতি সাধু—

বাকি রাখিও,

কৃষ্ণ দরশন লাগি

বাকি রাখিও।

খোল বেজেছে। মাথা নেচেছে। তালে তালে পড়েছে করতালি। কিন্তু মনের অজান্তে আঁখিপল্লব ছুটি কখন যে একেবারে ভিজে উঠেছে—কেউ হয়তো তা টেরও পায়নি।

বাংলার লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অবদান এই কীর্তন গান—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পল্লীর গৃহকোণে বেজে চলেছে এর সুর, এর আবেদন। বাংলার সাধারণ মানুষের উপলব্ধিতেও এ গান সাড়া জাগিয়েছে। কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের কথা নয়, রামমঙ্গল, নিমাই-সন্ন্যাস, এমনি আরো কতো গানের মাধ্যমেই না পল্লীর জন-মানস রস সংগ্রহ করেছে। কতো দিন, কতো সন্ধ্যায় এরই আবেদনে কুসীদজীবী অধর ঘোষকেও কৈবর্তপাড়ার ভোলানাথের সঙ্গে কোলাকুলি··· গলা-গলি করতে দেখেছি। হিসেবী মানুষ অখিল সাহাও কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে।

সে গ্রাম আজ কতো দূরে! পদ্মা-মেঘনা পেরিয়ে কোথায় সে ধলেশ্বরী! এতো স্মৃতি, এতো স্বপ্ন-রঙীন সে মোহন পরিবেশ থেকে আজকে আমি নির্বাসিত। দেশ-বিভাগের পাপে আমার মতো ছিন্নমূল আরও অনেকে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে গেছে। ভেঙেছে সমাজ, ভেঙেছে ঘর-সংসার। শান্ত সুনিবিড় আমার সে গাঁওখানি আজকে বুঝি নির্বাক হয়ে গেছে! পুঁটি পিসীরা কোথায়? অমন অনাবিল স্নেহের উৎসটি আজ কতো দূরে! কাজ-না-থাকা অলস দুপুরবেলা আজ তো আর কেউ তেমন দরদ দিয়ে ডাকে না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আজ তো আর কেউ কাছে এসে বসে না। আজ আমি যেন আকাশ থেকে ছিট্‌কেপড়া তারা —স্মৃতির জ্বালায় তিল তিল করে পুড়ে মরছি।

নিশ্চয়ই আমাদের তুলসী তলাটি আজ একেবারে নির্জন। আজ আর সেখানে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বলে না, কাঁসর-ঘণ্টা বাজে না, সদিবোনের রাধাকৃষ্ণের গানে

সান্ধ্য হাওয়াও আর তো সজল হয়ে ওঠে না! পূর্ব-বাংলার নিভৃতে থাকা আমার সে গাঁওখানি রাতের আঁধারে আজ বুঝি কেবল থম্ থম্-ই করতে থাকে!

ধলেশ্বরী তেমন করেই বয়ে যায় কি? কাশফুলগুলো আজো কি তেমন করেই ফোটে? জ্যোৎস্নাস্নাত বালুচরে রাখালিয়া বাঁশি আজো কি তেমন করেই বেজে ওঠে? গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেয়ে এমনি কতো প্রশ্নই না মনে জাগে! চোখের সামনে ভিড় করে আসে ছবির পর ছবি। ব্রহ্মচারীর মাঠ, রজনী সা'র মশান—আরও কতো কিছুর কথাই না মনে পড়ে যায়! স্মৃতির জ্বালায় আঁখিপল্লব দুটি বারে বারে ভিজে ওঠে। মনে হয় সে যেন হারিয়ে গেছে। যে ছিল প্রিয়, যে ছিল শ্রেয়, সে যেন আর আমার নয়। আমার স্বপ্নে থাকা মাটির মাকে মা বলে ডাকবার অধিকারও যেন আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তার আহ্বানের তো শেষ নেই! আজো সে যেন আমায় ঠিক আগের মতোই ডাকে। স্বপ্ন-শিয়রে ধলেশ্বরী আজো যেন আছড়ে পড়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে বার বার—আয়, আয়, ওরে আয়!

ধামরাই

আবর্তিত হয়ে চলেছে মহাকালের রথচক্র। সেই রথচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে মানুষের জীবন। এমনি এক মহাকালের ত্রিকালবিধৃত বিগ্রহরূপের সঙ্গে শৈশবেই পরিচিত হয়েছিলাম আমাদের গ্রামে। ধামরাই-এর মাধব ঠাকুরের রথের সেই ঘূর্ণ্যমান চক্র দেখে মহাকালের চিরপ্রবহমান গতিস্রোতের যে বিশাল ব্যাপ্তি উপলব্ধি করেছিলাম ছোটবেলা সে স্মৃতি আজও অবিস্মরণীয়। প্রথম দৃষ্টি মেলেই যে গ্রামের মাটির সঙ্গে হয়েছিল পরিচয়, যার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে শৈশব ও যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলাম, এক অভাবনীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে জন্মভূমি গ্রাম-জননীর মাটি থেকে ছিন্ন হয়ে আজো দূরান্তরের এই জনারণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লেও সে দিনের স্মৃতি আজো আমার লক্ষ্যহীন যাযাবর জীবনের ধূলি-ধূসর মুহূর্তগুলোকে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সে গ্রাম যে আমার জননী।

বংশাই নদীর এক তীরে ধূ ধূ করছে প্রান্তর—যতদূর দৃষ্টি যায়, শ্যামল সবুজ। ধান্যশীর্ষগুলো দুহাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে কিসের প্রত্যাশী যেন—মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় বাতাসে দুলে দুলে শোঁ শোঁ শব্দে কেন যেন বাঁশি বাজায় ওরা। এপারে মল্লিক ঘাটের সামনে ঠক্‌-ঠক্‌ হাতুড়ি পেটানোর শব্দ—বড় বড় মালবাহী নৌকো তৈরী চল্‌ছে সেখানে। ঘাট থেকে একটি রাস্তা এঁকে-বেঁকে কিছু দূর গিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—একটি গিয়ে মিশেছে বাজারে যাওয়ার সড়কে, আর একটি চলে গেছে তাঁতিপাড়ার দিকে। দ্বিতীয় পথটি ধরে কিছু দূর গেলেই পাঁচিল-ঘেরা বাগান, পিছন দিকে মস্ত-বড় পাকা দোতলা বাড়ি। এ রাস্তার ওপরেই বাড়ির খিড়কি-দোর। সদর দোর বড় সড়ক থেকে পূবদিকে বেরিয়ে-আসা একটা গলির ওপর। তামাম দুনিয়ায় এইটেই ছিল আমার মাথা গুজবার ঠাঁই।

জীবনের এতটা বয়েস এখানেই কেটেছে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। কোনদিন দু মুঠো অন্নের জন্যে কপালে চিন্তার রেখা ঘনিয়ে ওঠেনি। অতিথি এসেছে, কখনো সেবার ত্রুটি হয়নি। আজ আমরাই অতিথি হয়ে পরের অনুগ্রহপ্রার্থী। অদৃষ্টের এ নির্মম পরিহাস!

আমাদের গ্রামটি ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষী, জেলে, গোয়ালা, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, ডাক্তার, কবরেজ প্রভৃতি নানারকমের লোকের বসবাস ছিল সেখানে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন সামগ্রীর অভাব সেখানে হতো না। প্রত্যহ বসতো বাজার। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার হাট। অতো বড় হাট এদিকটায় ছিল বিরল। নদীপথে ও উন্নত ধরনের গ্রাম্যপথে দূর-দূরান্তের পল্লীগুলোর সঙ্গে সংযোগ ছিল তার, তাই ধামরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ অঞ্চলের একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র। শিল্পসমূহের মধ্যে তাঁত ও কাঁসার জিনিষপত্রই ছিল প্রধান। শিল্পে-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ এমন গ্রাম এ অঞ্চলে খুব কমই দেখা যেতো ধামরাইয়ের মতো।

১৯৪৬ সালে বাংলার বুকে যখন সহসা সাম্প্রদায়িক দাবানল জ্বলে উঠলো, রাজধানী থেকে সুদূর শান্তিময় পল্লীতেও যখন তার লেলিহান শিখা বিস্তৃত হলো এবং তারি প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বাংলার বক্ষ দীর্ণ খণ্ডিত হয়ে গেল—ধামরাই শ্মশানে রূপান্তরিত হতে চলেছে তখন থেকেই। গ্রামের শেষে কয়েকখানি ঘর মুসলমানদের। তাদের সকলেই প্রায় কৃষক। প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে মিলেমিশে চাষ-আবাদ করে এবং হিন্দু জমিদার-মহাজনের সাহায্য নিয়ে বেশ শান্তিতেই কাটছিলো তাদের দিন। তাই বাইরের উস্কানি তাদের খুব একটা উৎসাহিত করতে পারেনি। তবু দুর্গের মত এই হিন্দুপ্রধান গ্রামের আকাশেও দেখা দিল অন্ধকারের অনিশ্চিত আশংকা। পথ চলার সময় আপন ছায়াও সচকিত করে তুলতে লাগলো আমার গাঁয়ের মানুষকে।

ত্রস্ত জীবন ও লাঞ্ছনা-গ্লানির অন্ধকূপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়ে সংসার পাতবার সুযোগ ও সংস্থান যাদের ছিল কিম্বা অনিশ্চিত ভবিষ্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নতুন ভাগ্য রচনা করার দুর্জয় দুঃসাহসিক মনোবল যাদের ছিল—

তারা যতটা সম্ভব বিষয়-আশয় বেচে দিয়ে বহু পুরুষের বুকের রক্তেগড়া আবাসভূমিকে প্রণাম করে অশ্রুজলে বিদায় নিলো। আপন কর্মশক্তি যারা নতুন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় শ্রমজীবীদের আছে—তারাই গেল সর্বপ্রথম। ধনিক ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা গুটিয়ে এনে স্থানান্তরে উদ্যোগী হলো। বিত্তবান জমিদারেরা সরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের অস্থাবর সম্পদ। ডাক্তারেরাও চলে গেলেন, সহরের ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি না করে গ্রামের দিকে গেলে কোনোরকমে চলে যাবে, এই ধারণা। পড়ে রইলো কৃষক-জেলে ও হতভাগ্য মধ্যবিত্তরা। কৃষক-জেলে জানে, গতর খাটালে কোথাও ভাতের অভাব হয় না। তবু শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে। কিন্তু মধ্যবিত্তরা কোথায় যাবে?—কোন্ ভরসায়? যাদের বাগানের শাকসব্জী, পুকুরের মাছ আর কিছু ধান-জমির ধান ও আয়ের ওপর দিন চলে—তাদের কি উপায়? ডিংগি নিয়ে নদীতে বা পুকুরে জাল ফেলতে তারা জানে না, গরু নিয়ে মাঠে লাংগল ঠেলতে পারে না, মাথায় মোট বয়ে উপার্জনও কল্পনার অতীত। যদি সকল সম্পত্তি উচিত মূল্যে বেচা এবং পশ্চিম বাংলায় উচিত মূল্যে অনুরূপ সম্পত্তি কেনা সম্ভব হতো, তবেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু উচিত মূল্যে বেচাও হবে না, কেনাও হবে না। কেনা-বেচার কালোবাজারের দাড়ি-পাল্লার দৌরাত্ম্যে সকল সম্পত্তি উজাড় হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও অবস্থা তেমনি। সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা শিক্ষক ও বে-সরকারী চাকুরেদের। নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় এসে পশ্চিম বাংলার দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ও জীবিকার সকরুণ আবেদন জানিয়ে মাথা কুটে মরবে তারা। হতভাগ্যদের নাম পুনর্বসতির দপ্তরে ও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের পর্বত-প্রমাণ ফাইলের তলায় চাপা পড়ে পড়ে কখন যেয়ে জঞ্জালের বাস্কেটে স্থান পাবে। এদের ভরসা রাজসরকারের অনুগ্রহ। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে প্রায় সবার অবস্থাই যে আমারই মতো দাঁড়াবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ কাউকেই যে আর বিশ্বাস করা যায় না এ সংসারে, কারুর কথার ওপরেই যে নির্ভর করা চলে না!

আমার কথাই বলি। পরকে বিশ্বাস করে নিজেকেই যে বিপন্ন করেছি বারে বারে। যারা না জানে এপারে এসে তারাও তো সেই বিপদের পথেই পা বাড়াবে।

বাইরের সহানুভূতি দেখে মানুষের অন্তর চেনা যায় না। এ অভিজ্ঞতা অনেক বাস্তুহারা পরিবারেরই হয়েছে কলকাতার শেয়ালদা স্টেশনে, পশ্চিম বাংলার নানা শরণার্থী শিবিরে। এমনি এক শিবির দেখতে এসে মনে পড়ে সেই কবে ধামরাইয়ে আমাদেরই এক প্রতিবেশীর দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে এক বাউল গেয়েছিল তার একতারা বাজিয়ে—

মনের মানুষ না পেলে সেই মনের কথা কইব না ;
মনের মানুষ পাবার আশে
ভ্রমণ করি দেশ বিদেশে
মানুষ মিলে শত শত মনতো মিলে না—
প্রাণ সজনী গো !

সংসারী মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে সংসার-বিবাগী বাউল আরো গেয়েছে—

শিমুল ফুলের রং দেখে ভাই রঙ্গে মেতো না ;
ও ভাই দেখলে চেয়ে মনের চোখে,
অহরহ পড়বে চোখে
চোরের নায়ে সাউখের নিশানা—
প্রাণ সজনী গো !

কিন্তু কলকাতায় নবাগত আমার গাঁয়ের সবহারা সরল-মন মানুষদের কি সে ক্ষমতা সে মনের অবস্থা আছে শিমুল-শিউলি বেছে নেবার ! কাজেই পুব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এ স্বাধীনতার স্বাভাবিক দান প্রতারণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায়ই যে দেখছি না আমি।

কলকাতায় এসেছি আত্মরক্ষার পথের সন্ধানে। এই জনকোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে, আমাদের ধামরাইয়েও তো দূর-দূরান্ত থেকে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী আসতো মাধব-দর্শনে। মেলা বসতো। মাধব ঠাকুরের ঘাট থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত অসংখ্য বিপণি। কতোরকম খেলনা, হাড়ি-পাতিল, ধামা-কুলো, বাক্স-ট্রাঙ্ক, বাসনপত্র, ছবি-ফটো, মাটির ঠাকুর প্রভৃতির বিরাট সমাবেশ। কতোরকম খাবারের দোকান ও রেষ্টুরেণ্ট। ম্যাজিক শো, সার্কাস। যাত্রীদের ভিড়ে গ্রামে

তিলধারণের স্থান থাকতো না। ঠাকুরমণ্ডপে, দালানে, প্রতিটি গৃহের বারান্দায়, গাছেরতলায়—সর্বত্র যাত্রীদল। সঙ্গে মেলার সওদা। মুড়ি, মুড়কি, ঢেপের খই, বিনি খই, চিনির মট, তিলা-কদমা, তেলে-ভাজা, দই-জিলিপি দিয়ে তাদের চলছে ফলার ভোজন। তা ছাড়া নুন-বিহিন খিচুড়ি প্রসাদ কেনারও ধুম পড়ে যেতো বিকেল বেলা। অসংখ্য বিপণির অপূর্ব শোভায়, আলোক-সজ্জায়, ম্যাজিক-সার্কাসের ড্রাম-পিটানোর আওয়াজে, যাত্রীদের কোলাহলে, শিশুদের ভেঁপুর শব্দে সমস্ত গ্রামখানা উৎসব-মুখর— সর্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনা, মুক্ত প্রাণের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। কিন্তু কলকাতার এই হট্টগোলে আনন্দের পরিচয় কতটুকু ?

ধামরাইয়ের মাধব ঠাকুরের রথ সুবিখ্যাত। অতো বড় রথ বোধ করি বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। পাঁচতলা উঁচু। বত্রিশটি লোহার বেড়-দেওয়া চাকা। ওপরে ওঠবার চওড়া সিঁড়ি। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরী রথটি। পৌরাণিক চিত্র খোদাই ও সুন্দর ভাস্কর্যশিল্পে অনন্য। রথটি রাখা হতো গ্রামের মাঝখানে সুবিস্তৃত সড়কের ওপর। গ্রামের বাইরে থেকেও দেখা যেতো তার চূড়া। দূর থেকে মনে হতো যেন একটি মন্দির। নবাগতদের কাছে ছিল এক বিস্ময়। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হতো রথটান উপলক্ষে। মেলাও বসতো তিন সপ্তাহ ধরে। অপূর্ব দ্রব্য-সম্ভার, অতুলনীয় ছিল তার আয়োজন। রথ চলতো বিশ হাজার বলিষ্ঠ হাতের যুক্তটানে। সে দৃশ্য সত্যই দর্শনীয়। কিন্তু আজ ?

দেশ বিভাগের পর পাক্‌নাথের রক্তচক্ষুর দাপটে জগন্নাথের রথ আর এক পা-ও অগ্রসর হয়নি। মেলা-উৎসব শরিয়তী শাসনের ভয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আত্মগোপন করেছে। যাত্রীদল সারা গ্রামময় ভিড় জমিয়ে তুলে তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ও মসজিদের শান্তি ব্যাহত করতে আর সাহসী হয়নি।

তীর্থক্ষেত্র ধামরাই। সুপ্রাচীন কালে সংস্কৃত নাম ছিল ধর্মরাজ্ঞি। তারপর পালিত নাম ধম্মরাই থেকে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের আধুনিক গ্রাম ধামরাইকে। বাস্তবিকই ধর্মপাগল ছিল আমার গাঁয়ের লোকগুলো। কিন্তু এতো ধর্ম-সাধনার এ কী সিদ্ধি ?—ধামরাইয়ের মানুষ হলো ধামছাড়া ! রথ, মাঘীপূর্ণিমা, উত্থান একাদশী ও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে চিরকাল সেখানে তীর্থের

উল্লাস মূর্ত হয়ে উঠতো। আর এখন? এখনো সে সব উৎসবের দিন ঘুরে ঘুরে প্রতি বছরই আসে, কিন্তু তারা যেন একে একে এসে স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতি সন্তর্পণে পালিয়ে যায়।

অতীতের স্মৃতি-তরংগ ভেসে চলেছে দূরে, আরো দূরে, মহাকালের মহাসমুদ্রে। এপারে পুনর্বাসনের প্রার্থনা নিয়ে আমরা যারা ঘুরে বেড়াই এক একটা পর্বদিন তাদের হৃদয়দোরে নিয়ে আসে অতীত স্বপ্নের দুঃসহ আঘাত। কিন্তু ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি আছে, আঘাতেরও তো আছে তেমনি প্রত্যাঘাত। এপারে যে প্রতিনিয়ত আঘাত আসছে আমাদের বুকে, তার প্রত্যাঘাত কবে যেয়ে ওপারে পৌঁছুবে?

সাত সাতটি পুরানো দেবালয়ের আশিসপূত ধামরাই। সর্বক্ষণ সরগরম থাকতো সারাগ্রাম। সকাল-সন্ধ্যায় দেবালয়ে দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টার আরতি-বাজনায় ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠতো সমগ্র পল্লী। পূর্ব বাংলার শান্ত পল্লী-সন্ধ্যা আজো কি কাঁসর-ঘণ্টার বাজনায় তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠবার সুযোগ পায়? সেদিনও শুনেছি, আমার গাঁয়ের দেবালয়ে এখনো নাকি পূজারতি চলে, কিন্তু নীরবে! বাজনা নিষিদ্ধ না হলেও ভয়ের কারণ, তাই বাজনা বন্ধ। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, ঝিল্লীরব উঠে—কিন্তু কীর্তন গান আর শোনা যায় না। অথচ এই কীর্তন গান ছিল মাধব-ক্ষেত্র ধামরাই গ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীমাধবের কৃপার ওপর ভরসা করে আজো যে সব কীর্তনীয়া পড়ে আছে গ্রাম-মায়ের মাটির বুকে তাদের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ। সমস্ত ভয়ভীতি ও নিষেধাজ্ঞার বাঁধ ভেঙ্গে কবে সেই রুদ্ধকণ্ঠ আবার নাম কীর্তনে মেতে উঠবে কে জানে?

এখনো বংশাই নদীর তীরে প্রতিদিন প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে। কিন্তু সে প্রভাত, সে সন্ধ্যার স্নেহ-পরশ তো আর আমার অনুভব করার অবকাশ নেই। বংশাইয়ের বুকে নৌকো পাড়ি দিয়ে মাটির মাকে ছেড়ে এসেছি, বিদায় দিয়ে এসেছি তাঁকে চোখের জলে—আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার মতো আরো অসংখ্য মানুষ শরণার্থীর বেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই সীমান্তে। তারা জানে না

কী তাদের পাপ, কী তাদের অপরাধ। তারাও তো ভালবাসতো তাদের দেশকে, দেশের মাটিকে আর সবারই মতো। দেশ-জননী কেন তবে তাদের তার কোল থেকে ঠেলে ফেলে দিলো? আবার কি মা ডেকে নেবে তার এসব নিরপরাধ সন্তানদের?

বাল্য ও কৈশোর-জীবনের কথা মনে আসে অহরহ আর অন্তরখানি ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালদেশী মানুষ আমরা। খেতে-খাওয়াতে সমান আনন্দ পেতো যারা, তারা আজ দুমুঠো ভাতের জন্যে ঘুরে বেড়ায় দৈন্যের বিষণ্ণতা নিয়ে। অথচ খাওয়া বাঁচিয়ে বাঁচবার কথা পূব বাংলার মানুষ কোন দিন ভাবতে পারেনি। কবিগুরু আমাদের লক্ষ্য করেই হয়তো রহস্য করে লিখেছিলেন—

'খাওয়া বাঁচায়ে বাঙ্গালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এদেশে তবে ধরিত না তো লোক!
অপরিপাকে মরণ ভয়
গৌরজনে করিছে জয়
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।'

কিন্তু রাজনীতির পাপচক্রে আমাদের না খাইয়ে মারার যে ব্যবস্থা হয়েছে তার জন্যে শোক বা দুঃখ করার লোকও তো আজ বড় একটা দেখতে পাই না স্বাধীন দেশ এ ভারতবর্ষে!

'আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো'—

পূব বাংলার বাস্তুহারা মা-বোনদের শিবির-জীবনে এ দৃশ্য কি সম্ভব?

মনে পড়ে ছোটবেলার আরো অনেক কথা। একবার পাঠশালা পালিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম বড়দার হাতে। দুষ্টু ছেলের সঙ্গে মিশতে দেখে তিনি যে আমায় শুধু গালমন্দই করেছিলেন তা নয়, কয়েক ঘা চাবুকও পড়েছিল সে যাত্রা আমার পিঠে। বুড়ো চাষী কদমালী পাশ দিয়ে যাচ্ছিল বাজার ফিরতি তার নিঃশেষিত সব্জীর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে। বড়দার হাতে আমার লাঞ্ছনা দেখে ব্যথায় যেন ভেংগে পড়ল কদমালী। মাথার ঝাঁকাটি নামিয়ে রেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো

বড়দার দু হাত আর বললো মিনতি করে—"আর মাইরেন না দাদাবাবু, ছাইড়া দেন। আহা, হা! বেতের মাইরে খোকা বাবুর পিঠ ফাটাইয়া দিছেন একে বারে! আর না, দোহাই আপনের, এইবারের মতন ছাইড়া দেন।" কদমালীর সকরুণ আবেদনে বড়দা সেদিন সাড়া না দিয়ে পারেন নি। সেবারের মত সত্যি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন আমায়। তবে বড়দার সুকঠোর শাসনের চেয়ে কদমালীর সস্নেহ স্পর্শই কিন্তু চিরকালের জন্যে গভীরতর দাগ কেটে রেখেছে আমার মনের মণিকোঠায়। সেই কদমালীরা গেল কোথায়? গাঁয়ের মাটিকে প্রণাম করে আমরা যখন চলে এলাম, কই, কোন মুসলমান ভাইতো সজল চোখে এগিয়ে এলো না 'যেতে নাহি দেবো' বলে! অসীম দুঃখে কদমালীর আত্মা হয়ত ডুকরে কেঁদে উঠ্ছে—ফেল্‌ছে দীর্ঘ নিঃশ্বাস আকাশ থেকে। কিন্তু সে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সুতীব্র তরংগস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি মানুষের সমস্ত অশুভবুদ্ধি সোনার বাংলার বুক থেকে?

বেদে-বেদেনীরা প্রায়ই আসতো আমাদের গাঁয়ে সাপের খেলা দেখাতে। বেহুলা-লখীন্দরের পৌরাণিক কাহিনী সুরে সুরে ছড়িয়ে দিয়ে তারা ঘুরে বেড়াতো সাপ-খেলা দেখিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধ হিংস্র সাপের সঙ্গে মানুষের মিত্রতা—তার সঙ্গে রহস্য ও রংগরস সে সময় লক্ষ্য করেছি শুদ্ধ বিস্ময়ে। কিন্তু তখন তো বুঝতে পারিনি যে, মানুষ যদি কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষপানে সাপের মতো হিংস্র হয়ে উঠে তার প্রতিবেশীকে আঘাত হানতে, তার জীবন-মান বিপন্ন করে তুলতে, তাহলে কোন মন্ত্রেই আর তাকে বশীভূত করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

শ্রীমাধবের ধাম ধামরাই মগ্ন আজ রাত্রির তপস্যায়। বংশাইয়ের কালো জলে আরো যেন কালি ঢেলে দিয়েছে রাত্রির অন্ধকার। যতদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার। কে জানে, কোথায় তার শেষ? এ জিজ্ঞাসা আজ লক্ষ লোকের মনে। কিন্তু কে দেবে তার উত্তর?

খেরুপাড়া

ভারতবর্ষের বিশাল ভূমিখণ্ডে বিদেশী বণিক-শাসনের অন্তিম লগ্নে মর্মান্তিক অভিনয় হলো—ব্যবচ্ছেদের ছুরির ইংগিতে ওরা হত্যার খড়্গাকে আহ্বান জানিয়ে খুশি মনে সরে পড়লো। মানুষের হৃদয়হীন দুর্বুদ্ধি সাপের ফণার চেয়েও সাংঘাতিক, তারই একটি দংশনে সমগ্র দেশ বিষ-জর্জর !

পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলির তীরে তীরে সেই খড়্গেরই বিদ্যুৎ-ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি। মাটি রক্তে লাল, আকাশ লাল অন্তরের আক্রোশে, বাতাস ভেজা চোখের জলের বাষ্পে—আর এই জল ঝরেছে অসহায় শিশু, বিপন্ন নারী, হাত-পা বাঁধা অক্ষম পুরুষের চোখ থেকে। ভাইয়ের মতো একান্ত আপন, একান্ত বিশ্বাসী যে, অন্ধকারে সে শ্বাপদের মতো লুকিয়ে এসে জালিয়ে দিলে ওর ঘর—ওর মাঠের ধান, গোয়ালের গরু, ঘরের ঐশ্বর্য দস্যুর মতো লুঠ করে নিয়ে গেল চোখের সমুখ দিয়ে।

পূর্ব বাংলার গ্রাম, গঞ্জ, জনপদ আজ নির্বাক, নিষ্প্রাণ। কল্পান্তের বিভীষিকায় চেতনা লুপ্ত তার। বারো মাসে তের পার্বণ যে দেশে—সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারকে চিহ্নিত করে আজ একটিও শঙ্খধ্বনি উঠে না, বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মী-সন্ধ্যায় গৃহবধূর আড়ষ্ট কণ্ঠ চিরে ফোটে না উলুধ্বনি। বোষ্টমের আখড়ার একতারা স্তব্ধ, গোপীযন্ত্রের ছেঁড়া তারে হয়ত মরচে ধরেছে, হরিসভার ভক্তদের খোলের চামড়া কেটে ইঁদুরে আর আরশোলায় তার ভেতরে এতদিনে সংসার ফেঁদে তুলেছে বুঝি বা !

লক্ষ গ্রাম শোভিত বাংলার এক গ্রামে, তার ধুলো-মাটির আদর-ভরা কোলে বিধি-নির্ধারিত এক দিনে আমি প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। দেশের ইতিহাসে সে গ্রাম গর্বে-গৌরবে উজ্জল নয়, কিন্তু আমার কাছে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়—সে যে আমার মা, স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। সেই মা আজ লাঞ্ছনাতে অহল্যাজননীর মতো পাষাণ হয়ে আছে। আমরা পলাতক, তবু জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় দিন গণনা

চলে তার। পরিত্রাতার আবির্ভাব কি হবে না, তার রাত্রির তপস্যা কি সূর্যালোকের আশীর্বাদে ধন্য হবে না কোন দিন ?

কতো গল্প, কাহিনী, স্মৃতি-উপকথায় জড়ানো আমার সেই মাটির মা—তার বুক জুড়ে আজ নির্জন শ্মশানের স্তব্ধতা! ভাবতেও চোখের কোণা জ্বালা করে জল ছুটে আসে। ঘরের কোলে সেই যে একফালি উঠোন, গণিতের মাপে বিশ পঁচিশ গজের বেশি প্রশস্ত হবে না হয়তো—অথচ সাত সমুদ্র তেরো নদীর চেয়েও তা দুস্তর দুরতিক্রম্য মনে হতো, পার হতে গেলে পা উঠে না—প্রাণ আর মানের দায়ে তাও শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে চলে এলাম, চোখের জলে তার শেষ ছবি এঁকে নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে, শাণিত বিদেশী ছুরির দাগের রক্তাক্ত সীমান্ত-রেখার ওপারে, যে বাড়ি যে ঘর পড়ে রইল, এখানে অদৃষ্টে নগর-লক্ষ্মীর অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য লাভও যদি ঘটে, তবে কি আমার মন থেকে মুছে যাবে তার স্মৃতি? লাট সাহেবের বাড়ির নেমন্তন্ন কিংবা মোটা মাইনের সরকারি চাকরি গৌরবে কি আমি কোন দিন ভুলতে পারব আমার জননী জন্মভূমিকে ? যত দূরেই থাকি, মাইল-ক্রোশের হিসেব-কষা ব্যবধান যতই দীর্ঘ হোক না কেন, সারা দিনের ব্যস্ততার পর অনেক রাত্রে আলো-নেবানো ঘরের অন্ধকারে বিছানায় যখন আমি একা, তখন সেই দূরান্তে ফেলে-আসা তাল, তমাল, হিজল, জিউল, নারিকেল, খেজুর গাছের ছায়ায় ঘোমটা-টানা সেই স্নেহময়ীর জলভরা বিষণ্ণ দৃষ্টির ছায়া মনের ওপর এসে পড়ে। মধ্য রাত্রের মন্থর বাতাসে জড়িয়ে জড়িয়ে ভেসে আসে তার কান্না—করুণ কান্নার সুরে সে যেন আমায় ডাকতে থাকে, টানতে থাকে। চোখের পাতা থেকে কখন্ ঘুম ঝরে যায়। শিয়রের কাছের খোলা জানালা-পথে বিনিদ্র চোখে উত্তর আকাশে তাকাতে নজর পড়ে, সপ্তর্ষির দৃষ্টির আগুনে কী একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন রাত্রির অন্ধকারকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ও যেন আমার মনেরই জিজ্ঞাসা, ঘোর অন্ধকারে আকাশের পটে গ্রহপুঞ্জের জ্যোতিতে লেখা।

কলকাতার নগর-বেষ্টনী ছাড়িয়ে প্রায় দুশো মাইল দূর। শেয়ালদা থেকে আট দশ ঘণ্টার ট্রেণযাত্রার পর, গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে পদ্মা পার হয়ে ছোট্ট একটা স্টেশন—কাঞ্চনপুর। শাল কাঠের তিনখানা তক্তা-ফেলা সিঁড়ি বেয়ে

স্টিমার থেকে নেমে বালুর চরে পা দিতেই কী এক আশ্চর্য আনন্দে মনটা কলরব করে উঠতো। দেশের আকাশ-আলো-মাটির স্নেহ সমস্ত শরীরে অনুভব করতাম। শিক্ষিত-নিরক্ষর, ভদ্র-অভদ্র পল্লীবাসীর সহজ সৌজন্য-সূচক প্রশ্ন আন্তরিক ভাল-বাসায় মাখা। অদ্ভুত ছেলেমানুষি খুশিতে বারবার মনে হতো, দেশে এলাম তবে, এবার কিছুদিনের জন্যে শহরের গিল্‌টিকরা নকল জীবনের বাইরে অনাবৃত আরামের ছুটি!

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ইছামতী—আমার শৈশবের বিস্ময়, কৈশোরের খেলার সঙ্গী। এর পারে দাঁড়িয়ে দূরের আবছা ধূ-ধূ বাঁকটায় নজর করতে করতে আমার প্রথম বিপুল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা, এর ওপর দিয়েই গেন্দু ভাইয়ের নৌকোয় চেপে প্রথম আমার কলকাতার উদ্দেশ্যে কাঞ্চনপুর স্টেশনে যাওয়া। ইছামতীর আঁকাবাঁকা পথ। ছোট ছোট বাঁক। শীর্ণ শান্ত নদী, সংযত উচ্ছ্বাসহীন। বর্ষায় কূলে কূলে ভরে উঠে জল, অথচ কূল ছাপিয়ে যায় না। জোয়ারের জলে তীব্র স্রোত—স্থানীয় লোকে বলে 'ধার'। কিন্তু পাড় ভেঙে ধারালো জিহ্বা বিস্তার করে সে ফসলের ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হয়ে যায় না, আক্রমণ করে না নিঃস্ব চাষীর জীর্ণ কুটীর। সে যে এই গাঁয়েরই মেয়ে—মেয়ের মতোই সুখের চেয়ে দুঃখ বোঝে বেশি। গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে খরখরে বালি বেরিয়ে পড়ে, কর্দমাক্ত ডাঙা জেগে উঠে এদিক ওদিক। তার ওপরে পলি মাটির স্বাদে নিবিড় হয়ে গজিয়ে উঠে বনতুলসী, কালকাসুন্দি, শেয়াল কাঁটার ঝাড়—কচুরি পানার বেগুনি ফুলে চারদিক আলো হয়ে থাকে। পংকিল জলের ওপর নৌকোর গলুই গলা উঁচু করে রাখে, তার চুড়োয় বসে কচ্ছপ-শিশু রোদে ঝিমোয়। জলের ধারে ধারে ঘোরে বক, বাবলা গাছের ডালে ধ্যানী মাছরাঙার নিঃশব্দ প্রহরগুলো কেটে যায়, পানকৌড়ি সেই পংকিল জলেই অনবরত ডুব খেয়ে চলে।

লেখাপড়ার তাগিদে শহরে আসতে হয়েছিল। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি, স্বাভাবিক নিয়মে বয়স বেড়েছে। কিন্তু সেই যে অভ্যাস, ছুটি হলেই পড়ি-মরি করে বাড়িতে ছোটা, তার কোন দিন পরিবর্তন হয় নি। প্রবাস-জীবনের দিন-গুলোর যাত্রাপথ বরাবর আমার টেবিলের সামনের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের

পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকতো—প্রতিদিন রাত্রে পড়াশুনা শেষ করে শুতে যাবার আগে সেদিনের তারিখটা আমি কেটে দিতাম। বিছানায় শুয়ে মনে হতো, একটা দিন তো কমলো, বাড়ি যাওয়ার সময়টা স্পষ্ট পদক্ষেপে চব্বিশ ঘণ্টা সরে এলো কাছে। স্কুলে যখন উঁচু মানের ছাত্র, জনৈক সহপাঠী একদিন শ্লেষ দিয়ে বলেছিল, ছুটি হলেই বাড়ি ছুটিস্, শহর ছেড়ে ভাল লাগে তোর পাড়াগাঁয়ে? কি আছে সেখানে—সেই তো বাঁশবন, মশা, ম্যালেরিয়া, ঘেঁটু ফুল আর কানাকুয়ো।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গিয়েছিল, ক্ষোভে দুঃখে জল এসে পড়েছিল চোখে। সেদিন বোকার মতো চুপ করে চলে এসেছিলাম; এত বড় মূর্খ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। পরে ভেবে দেখেছি, সব জিনিষ সকলের বুদ্ধি দিয়ে মাপা চলে না। শান্ত ইছামতীকে যারা বোনের মতো ভালবাসে নি, পূজোর দিনের ভোর বেলা শিউলি ফুলের গন্ধ জানালা দিয়ে ঢুকে যাদের ঘুম ভাংগায় নি, একবারও যারা জীবনে দেখেনি সূর্যোদয়ে সোনার এই পুরানো পৃথিবী আমার গাঁয়ে বিয়ের কনের মতো কেমন সুন্দর মধুর হয়ে দেখা দেয়, তাদের কী করে বোঝাব কি আছে সেই গাঁয়ে। ওরা সিনেমায় গিয়ে দেখে এসেছে গ্রাম, জানে না—সে গ্রাম, না গ্রামের প্রেতচ্ছবি। অন্য দশটা ফালতু ঘটনার মধ্যে দেখেছে, সিনেমা-ষ্টার অমুক দেবী গাঁয়ের বধূ সেজে সস্তা আর্ট দেখিয়ে কলসি কাঁখে জল আনছেন নদীর ঘাট থেকে। হলদে পাখির ডানায় রংয়ের মাধুর্য ওরা বুঝবে কি করে? শীতের দিনে নদীর চরের কাশবনে চড়ুই-ভাতি করার আনন্দ অজ্ঞাত ওদের কাছে। ফির্পো কিংবা গ্র্যাণ্ড হোটেলের খানার ওপারে ওরা তো জানে না কিছু।

ফাগুন-চৈত্র মাসে গ্রামের রূপ অপরূপ। ঝরাপাতা মরাফুল উড়ে যায় দমকা বাতাসের মুখে—নবীনের আবির্ভাবের আভাস পেয়ে জীর্ণজরা খসে পড়ে যেন আসন শূন্য করে দেয় তাকে। মৌমাছিদের অবিশ্রান্ত গুন্‌গুনানি শুনতে শুনতে আমের মুকুল বড় হতে থাকে। সড়কের ধারে টিলের মতো উঁচু জায়গায় ইঁদারা। অসংখ্য অনামী বন্য গাছ সেখানে। সাদা ফুলের ছড়া ঝুলে থাকে রাস্তার ওপর। কী মিষ্টি গন্ধ তার! অবহেলিত সেই বৈশিষ্ট্যহীন গাছগুলোও বসন্তকালে পরম আকর্ষীয়

হয়ে উঠে। প্রতি সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফুটবল খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরবার সময় নীচু ডালের ফুলগুলো আমরা পেড়ে নিয়ে আসতাম লাফিয়ে-লাফিয়ে।

চৈত্রের আগুনে মাটি পুড়ে যেতো, জলন্ত আকাশ থেকে নিদারুণ গ্রীষ্ম ঝরে পড়তো মাথার ওপর। এদিক-ওদিক শোনা যেতো তৃষ্ণার্ত চাতকের জলপ্রার্থনার করুণ সুর—ফটিক জল, ফটিক জল!

তারপর একদিন কালির দাগ লাগতো আকাশের দূরতম কোণায়। তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতো মহাশূন্যে, কড়্‌কড়্ শব্দে বজ্রের তরুণ কণ্ঠের হুংকার শোনা যেতো। কিছুটা সময় বায়ুলেশহীন স্তব্ধতা। নীড়-প্রত্যাশী পাখিদের শংকিত চিৎকার। চারিদিকে কী রকম একটা থমথমানি—তারপরই মনে হতো কারা যেন হাজার হাজার ঘোড়া ছুটিয়ে পদ্মার চরের ধূসর বালিতে চতুর্দিক অন্ধকার করে এই গ্রামের দিকেই আসছে। দক্ষিণ দিকের আকাশ চিরে শোঁ শোঁ শব্দ বেরিয়ে আসতো। ঘোড়ার খুরের বাজনা গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত তালে এগিয়ে আসতে থাকতো—কাছে···কাছে··আরো কাছে। অবশেষে এসেই পড়তো তারা—প্রচণ্ড ঝড়। আকাশে তখন রোদ থাকতো না, অথচ অন্ধকারও নয়—মেঘের গা চুঁইয়ে কী এক অদ্ভুত ধরণের পিংগল আলো টর্চের ফোকাসের মতো লম্বা রেখায় নেমে আসতো এদিক-ওদিক। ঝড়ের প্রহারে আকুল আর্তনাদে কেঁদে উঠতো বাঁশবন, মড়্‌মড়্ শব্দে পথঘাট আটক করে উপড়ে পড়তো গাছ, মত্ত বাতাসের মুখে হাল্‌কা তাসের মতো উড়ে যেতো চালা ঘর, তাল গাছের পাতায় ঝলসে উঠতো বিদ্যুতের আভা। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, কেন, জানি না, আমার শিশুমনে আশংকা হতো, রাস্তার ধারে ওই যে ফাঁকা জায়গায় নিঃসঙ্গ একলা দাঁড়িয়ে নারকেল গাছটা, ওটার মাথায় বজ্রপাত হবে। বড়মার কাছে গল্প শুনেছি, পদ্মায় যে বছর ঝড়ে কালীগঞ্জের স্টিমার ডুবে গিয়েছিল, সেবার আমাদের পুকুরপাড়ের তেমাথা আম গাছে বাজ পড়ে গাছটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর সেই থেকেই ওর তিন মাথা।

ঝড়ের বেগ শান্ত হয়ে এলে আসতো বৃষ্টি—স্নিগ্ধ বড় বড় ফোঁটায় নামতো বছরের প্রথম বর্ষণ। বৃষ্টি ধারায় স্নান করতে করতে আমাদের সেই করমচার গানের কোরাস চলতো—কচু পাতায় করমচা, যা বৃষ্টি উড়ে যা। ধূলিলিপ্ত গাছপালার

প্রসাধন হতো সেই জলে। ভেজা মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ উঠতো। চাতকের পিপাসা বুঝি ওতেও মিটতো না, কারণ একটু পরেই আবার শোনা যেতো—ফটিক জল, ফটিক জল!

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের মাঠে-মাঠে কে এক রক্তচক্ষু, পিংগলজটা, রুদ্র সন্ন্যাসী বহ্নিমান চিতা স্তূপের সম্মুখে বসে শান্তিপাঠ করে যান। তাঁর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি শুষ্ক দগ্ধ তৃণ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে যায়। তখন জনমনুষ্যের সাড়া পাওয়া যায় না কোথাও, কেবল তন্দ্রাতুর কপোতের ক্লান্ত স্বর কোথা থেকে ভেসে এসে যেন সেই গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মিশে যায়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে শান্তিনিকেতনের শুষ্ক মাঠে এই শান্তিপাঠরত সন্ন্যাসীকে একজন দেখেছিলেন—সিদ্ধ কবির দিব্যদৃষ্টি ছিল তাঁর। কিন্তু আমিও দেখেছি এঁকে, আমাদের বাড়ির সীমান্তবর্ত্তী দিগন্ত-ছোঁয়া বিস্তীর্ণ বাল্লার মাঠে।

তখন আমার বয়স কতো বলতে পারব না। তবে এটুকু বলা চলে, 'পথের পাঁচালী'র অপুর মতো তখন আমি, আমার নিজের জগতে আমি তখন একজন মস্ত বড় কবি, একজন আবিষ্কারক। কাজেই সেই শিশু আমি, যাকে সিদ্ধ কবির সঙ্গে বিনা দ্বিধায় এক আসনে বসান চলে।...হ্যাঁ, সেই সন্ন্যাসীর অস্পষ্ট স্মৃতি আমার মনে আছে। দুপুরবেলা বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, মায়ের বুকের ওপর থেকে কাশীরাম দাসের মোটা মহাভারতখানা এক পাশে কাৎ হয়ে নেমে এলে, পা টিপেটিপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম। খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, সভয় দৃষ্টিতে মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হতো, ওই দূরে মাঠের ঠিক মধ্যিখানে কিসের যেন ধোঁয়া—আবছা, অস্পষ্ট—শীতের দিনের কুয়াশার ধূসরতা। কী একটা উর্দ্ধমুখী হয়ে কাঁপছে—ছোট ছোট ঢেউ—আগুনের শিখা বুঝি! রোদের মধ্যে মিশে গেছে তা, ভাল করে বোঝা যায় না। তার ও-পাশে বসে কে যেন একজন—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মূর্তি, দেখা যায় না, চেনা যায় না, কিন্তু অনুমান করতে গিয়ে নিঃসংশয়ে মনে আসে, সে এক উগ্র-দর্শন সন্ন্যাসী, দু চোখে আগুন তাঁর, দয়া নেই, মায়া নেই, ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে যেন ওই চিতার আগুন এক লাথি মেরে সমস্ত গ্রামের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে নিমেষে তিনি সব ধ্বংস করে ফেলতে পারেন।

…ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে থাকতাম, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতো, শরীর শিউরে উঠতো মাঝে মাঝে, কিন্তু এক পা নড়তে সাহস পেতাম না। মনে হতো, নড়বার চেষ্টা করলেই তিনি টের পেয়ে যাবেন, আর একবার টের পেলে— !

একদিন অমনি দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে ঝড় উঠেছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সন্ন্যাসী বুঝি ক্ষেপে গেছেন কোন কারণে। বাতাসে শুকনো মাঠের রাংগা ধুলো উড়ছিল। আমি দেখছিলাম, চিতার আগুন পা দিয়ে তিনি লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছেন। চিৎকার করে বার-মুখো ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বাঁশের কঞ্চির স্তূপের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে। গলার বাঁ পাশে অনেকখানি কেটে গিয়েছিল, ক্ষত চিহ্নটা এখনো আছে।

সেসব দিনের ভয়ের কথা মনে পড়লে চোখ সজল হয়ে আসে কেন ? ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে বিস্তীর্ণ বাঙ্গলার মাঠ জলভরা অথৈ বিলের মতো ছল্‌ছলিয়ে উঠে। আমার ছোটবেলায় রোজ সন্ধ্যায় আমার গাঁয়ের পোড়ো মাঠে আলেয়া জলেছে, ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা আগাগোড়া ভয়ের কাঁথা মুড়ি দিয়ে চিরকাল দাঁড়িয়ে থেকেছে, অমাবস্যার রাত্রে কেউ-কেউ নাকি নারুদের পতিত ভিটেয় মেয়ে মানুষের হাসি শুনতে পেয়েছে—এ সব ভয়-কাহিনী-স্মৃতির দেশে আর একবার যেতে ইচ্ছে করে ; মনে হয়, আর একবার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে হিজল গাছের মাথায় সন্ধ্যার প্রথম তারাটা দেখি, ঝিঁঝির ডাক শুনি বেতের জংগলে।

বর্ষার মেঘান্ধকার বিষণ্ণ দিন কেটে গেলে এসেছে শরৎ। কাস্পিয়ান সাগরের ঘন নীল জল দিয়ে কে যেন ঘষে ধুয়ে দিতো আকাশ। সকাল-বিকেলের রাংগা রোদ তার ওপরে সোনা ছড়াতো। মাঠে-মাঠে পাকা ধান, সোনালি রং, বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর অংগ-আভা যেন। ফসল ভাল হলে মুসলমানরাও বলতো, মা লক্ষ্মী এবার ভাল দেছেন গো !

আমার গাঁয়ে বিলের জলকে ঢেকে রাখত পদ্ম আর শাপলা। খালের পারে, নদীর চরে উচ্ছুসিত কাশের বন—সাদা ফেনার সমুদ্র যেন। আশ্বিনের ছুটির বাঁশি বাজতো জলে স্থলে—স্টিমার ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে একটির পর একটি নৌকো এসে ভিড়তো ইছামতীর পারে। গ্রামভরা লোকজন, ঘরে-ঘরে প্রবাস প্রত্যাগতের

আনন্দ কলরব। বাংলা দেশের গ্রাম যে চিররূপময়ী কাব্যের নায়িকা নয় তা জানি। সবুজ মাঠ, সোনালি রোদ, পাখির ডাক, পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার জলে ধোওয়া আকাশের আড়ালে তার যে ঈর্ষা-নিন্দা-দলাদলি, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অকালমৃত্যু পীড়িত বিকৃত বিকারগ্রস্ত রূপ রয়েছে, তাও মিথ্যে নয়। কিন্তু তবু এই পুজোর দিনে একান্ত নিঃস্বের দরজার সমুখেও আঁকা হয় আলপনা, উঠোনে দাঁড়ালে প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে কেউ না কেউ এসে হাতে দিয়ে যায় ছুটো নারকেল-নলেনগুড়ের মিষ্টি। বিজয়ার দিনে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বুকে জড়িয়ে সবাই সবাইকে করে আলিংগন। প্রাত্যহিকতার অজস্র গ্লানি বিস্মৃত হয়ে, দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের কালো চিহ্নগুলো মন থেকে মুছে ফেলে, সমস্ত পৃথিবীকে বিজয়ান্তে একবার হৃদয়ভরে গ্রহণ করা ছিল পূর্ব বাংলায় চিরাচরিত রীতি। আমার গাঁয়ের তেমনি পরিবেশ আর জীবনে কোনদিন দেখতে পাবো, তা যে কল্পনার অতীত।

আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা তৈরী হতো। এক মেটে, দো মেটে, মাজাঘষা—তারপরে রং। পুজোর কাছাকাছি তিনজন কুমোরের অনেক রাত অবধি লণ্ঠন জ্বেলে কাজ চলতো। ঘুমের ঘোরে অবস্থা কাহিল হয়ে না-পড়া পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ভিড় কমতো না। নানা রকম বায়না নিয়ে তারা বসে থাকতো।

: যোগেন দা, এই যে দ্যাখ, আমার পুরানো পুতুলটায় একটু রং চড়িয়ে দেবে —তোমার ওই দুর্গার চূড়ার সোনালি রংটা?

: আর এই যে আমার ঘোড়াটা যোগেন দা, ঠ্যাংটা ভেংগে গেছে, একটু জুড়ে দাও না ওই এঁটেল মাটি দিয়ে!

যোগেনের কোন দিকে তাকাবার অবসর নেই, মুখে হুঁ-হ্যাঁ চালিয়ে সে তুলি টানতে থাকতো।

: এই ছাওয়াল পান, কামের সময় প্যানপ্যান কইরো না।—উঠানের ওধার থেকে ছেলেদের ধমক দিতো ইয়াদ আলি। প্রতিমা-সজ্জা দেখার সখ ছেলেদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয় তার। মুসলমান পাড়ার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সর্দার সে। পঞ্চাশের ওপরে বয়স। মাথায় কাঁচা পাকা চুলের বাবরি। প্রচুর পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো সে করেছে পাকা তরমুজের বিচির মতো কুচকুচে কালো।

চাষাবাদ আর দস্যুবৃত্তি তার উপজীবিকা। মানুষ খুনের ঐতিহ্যবাহী বংশের অধস্তন পুরুষ সে। দু চারটে লাস সে নিজেও যে মাটির নীচে পুঁতে দেয় নি এমন নয়।

: তুমি চ্যাংড়াদের কথায় কান দিও না পাল মশয়, মন লাগিয়ে চিত্তির কর,—ই সব ভগমানের কাম।—যোগেনকে পরামর্শ দিত ইয়াদ আলি।

কিন্তু গ্রামে থাকতেই দেখে এসেছি, সে ইয়াদ আলি পাল্‌টে গেছে। আনসার বাহিনীর নায়ক সে। হিন্দুর দেবতার নাম মুখেও আনে না, ইসলামের চমৎকার ব্যাখ্যা করে!

চলতি রাজনীতির সঙ্গে এ গ্রামের বরাবরই যোগ ছিল। পোড়ো ভিটের গভীর জংগলে বেশি রাতে গোপনে মিটিং হতো। তারপরেই শুনতে পাওয়া যেতো, আট-দশ মাইল দূরে সাহাদের পাটের আড়তের ক্যাশ লুঠ হয়েছে। মহকুমা শহর মাণিকগঞ্জ ছিল অনুশীলন পার্টির নেতা বিপ্লবী পুলিন দাসের অন্যতম কর্মকেন্দ্র, আর ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৺রজনী দাস ছিলেন মাণিকগঞ্জ শাখার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ গ্রামের কয়েকটি তরুণ সেখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতেন। সেই সূত্রে আমাদের বাড়ি পুলিশে সার্চ করেছে একাধিক বার; কাকাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। সে সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যায়াম এবং লাঠি চালনা শিক্ষার সমিতি স্থাপিত হয়েছিল অনুশীলন পার্টির নেতৃত্বে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সারা বাংলার লাঠিয়ালদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ গ্রামের ছেলে সুধীর দত্ত অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ানের গৌরব অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘকাল পূর্বে তিনি মারা গেছেন। এ জন্যে আক্ষেপ করি না। সে কালের বিপ্লবীকে আজ শরণার্থীদের মধ্যে দেখতে হচ্ছে না—নিঃসন্দেহে এ সৌভাগ্য নয় কি?···বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট মাসেও স্ফুলিংগ ছড়িয়ে ছিল এখানে। নিরুদ্বিগ্ন পল্লীজীবনের অনাবিল শান্তিতে লেগেছিল প্রচণ্ড দোলা। গাঁয়ের কাঁচা সড়ক ধরে ভারি বুটের শব্দ করতে করতে আসতে দেখেছি সংগীনধারী পুলিশ।

গ্রামের লোকের বিশেষত যুবকদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল প্রকাণ্ড পাব্‌লিক লাইব্রেরী, থিয়েটারের 'এভার গ্রীণ' ক্লাব। ক্লাবের ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টেজ। প্রতি বছর পূজোর সময় তিন রাত্রি অভিনয় বাঁধা ছিল এবং অভিনয় যাঁরা করতেন

তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ঢাকা কিংবা কলকাতার কলেজের ছাত্র। ক্লাব-লাইব্রেরী যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরা জীবনের জটিলতা আর জীবিকার ধাঁধায় জড়িয়ে পড়লে এর নায়কতা এসেছিল আমাদের হাতে। ভবিষ্যতে একদিন হয়তো আমাদের কাছ থেকে কনিষ্ঠদের হাতে উত্তীর্ণ হয়ে যেতো এই নেতৃত্ব। কিন্তু তার আগেই যে গ্রাম ভেংগেছে! কে কোথায় ভেসে গিয়েছে জোয়ারের মুখে কে জানে?

গ্রীষ্মকালে চারদিক যখন শুকনো খটখটে, ক্লাবের সভ্যদের উৎসাহে প্রতি বছরই একবার করে সে সময়ে গ্রামের স্বাস্থ্যোদ্ধার করা হতো। পুকুর থেকে নদী থেকে কচুরিপানা টেনে তুলে রোদে শুকিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতাম আমরা। সমবেত আক্রমণের মুখে অবাঞ্ছিত ঝোপ-জংগল নিঃশেষ হয়ে যেতো। দুর্গম রাস্তা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঝুপড়ি-কোদাল নিয়ে অভিযান চলতো—মাটির বোঝা বইতে গিয়ে টন্‌টন্ করতো আমাদের মাথার চাঁদ।

দুবছর আগে এক অপরাহ্ণে ইছামতী পাড়ি দিয়ে আমার জন্মভূমি খেরুপাড়া ছেড়ে চলে এসেছি। নিজের বাড়ি বিদেশ হয়েছে, ঘরে ফেরার পথে গজিয়েছে বিষাক্ত কাঁটা। এ জীবনে খেরুপাড়ার কালো মাটির পথে বুঝি আমার পায়ের চিহ্ন আর পড়বে না! কিন্তু যদি এ অনুমান ব্যর্থ হয়, কখনো যদি গংগা-পদ্মা ফের নতুন রাখি-বন্ধনে বাঁধা পড়ে, তা হলে কি আমি আবার তেমনি ভাবে ফিরে পাব আমার সেই হারানো খেরুপাড়াকে?

অবিশ্বাস গাঢ় হয়ে আসে, সংশয়ে দুলতে থাকে মনটা। আশার সার্থকতায় ফিরে-পাওয়া গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলে কেউ যদি হঠাৎ এসে খবর দেয়, ও-পাড়ার যারা প্রাণের মায়ায় সীমান্তপারের দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, মাঝপথ থেকে তাদের আর খবর নেই—কিংবা যদি কেউ বলে, পাশের গ্রামের এক অসহায় গৃহস্থ পরিবারের নতুন বৌ কোন উপায় না দেখে এক গোলা আফিম মুখে পুরে ঠাকুরের পটের সামনে চুপচাপ মুখ বুঁজে শুয়েছিল, সে আর উঠে বসে নি—অথবা যদি আমি শুনতে পাই, আমাদেরই প্রতিবেশীর এক কুমারী মেয়ে, আমাদের পুকুরধারের কৃষ্ণচূড়ো গাছটা ফাগুন মাসে যখন অসংখ্য রক্তমঞ্জরীতে লালে লাল হয়ে উঠে, তারই ডালে

চূড়ান্ত অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল, তখন আমার চোখ ফেটে যে জল আসবে, সে কি পুনর্মিলনের আনন্দে? আমি যদি অসহ্য চাঞ্চল্যে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ি, তা কি অদৃষ্টের দেবতাকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাবার জন্যে?

সময়ের গতি দুর্বার, জীবন অস্থির—পদ্মপাতায় জলবিন্দু টলমল্। যা হারালাম, যা ফেলে এলাম, অনন্ত অতীত তাকে গ্রাস করে নিলো, কোথাও তার আর সন্ধান মিলবে না।

আকাশে বর্ষার মেঘ, বিচ্ছিন্ন বর্ষণে কান্নার সুর। কিন্তু সে সুরে তো হৃদয় ময়ূরের মতো পেখম বিস্তার করে নাচে না। প্রাসাদের শিখর থেকে কারুর কালো চুলের ঢেউ আকাশ ঢেকে ফেলেছে—এ কল্পনাতেও মন তো এগোয় না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এই মেঘেরই ছায়া পড়েছে ইছামতীর জলে। তারই তীরে দাঁড়িয়ে জনহীন বিপন্ন খেরুপাড়া গ্রাম। অহল্যার পাষাণ-জীবন তার। মুক্তির অপেক্ষায় চলছে অপমৃত্যুর প্রহর গণনা। তবু কেন জানি না, প্রবল প্রত্যয়ে কবিগুরুর সেই অমৃতময়ী আশার বাণী বার বার মনে আসে—

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই!'

তেমনি স্থান কি পাবো না আমরা?

স গ্রামে নায়ক নিয়তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়েছে। তার রথচক্র গ্রাস করেছে মেদিনী, অন্যায় চক্রান্তে বিপর্যস্ত সে। কিন্তু তার পৌরুষ লুপ্ত হয় নি, বীর্যের বিনাশ নেই, আদর্শ অমর। দিগন্তের নিকষ অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, কিন্তু কার যেন পদধ্বনি শোনা যায়! অন্ধকারের যবনিকা থরথর করে কেঁপে উঠে।

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'—গানটি কতো উৎসবে কতোবার যে গেয়েছি তার ঠিক নেই। কবিগুরুর মহাবাণী শুনে প্রাণে শক্তি পেয়েছি সত্য, কিন্তু আমাদেরও যে সর্বস্বত্যাগী হয়ে 'জয় মা' বলে এমনিভাবেই তরী ভাসাতে হবে অনির্দিষ্টতার পথে তা আগে কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম? ভারত স্বাধীন হবে, আমরা সুখীস্বচ্ছল হবো, বাঙালীর ঘর ভরে উঠবে আবার ধন-ধান্যে, পূজো-পার্বণে—এই স্বপ্নই তো দেখেছি রাত জেগে! কিন্তু তার বদলে আমরা হলাম নির্বাসিত, অসহায় পাখির মতো বিপদগ্রস্ত।

মনে পড়ছে প্রায় বারো বছর আগে আমাদের গ্রামের এক বাড়িতে একমাত্র পুত্র দেবেন মারা গেলে আমার ঠাকুরমা দুঃখ করে বলেছিলেন,—'আহা, সারদার ভিটেয় আর প্রদীপ দেবার কেউ রইলো না!' কিন্তু আজ সমস্ত পূর্ব বাংলার প্রতি হিন্দু পরিবারেই ছেলে থাকতেও প্রায় ভিটেতেই প্রদীপ দেবার কেউ নেই!

নারায়ণগঞ্জ থেকে মাইল তিনেক দূরে আমাদের গ্রাম ধামগড়। স্টিমার বা নৌকো যাতে খুশি যাওয়া যায়। তবে নৌকোতে গেলে দেড় ঘণ্টা আর স্টিমারে গেলে লাগে আধঘণ্টা। ছাত্রাবস্থায় এ দুটোর কোনটাতে যেতেই মন সরতো না—সামান্য সময় অপচয়ও ছিল তখন প্রবাসীমনের পক্ষে অসহ্য। বাঁধন-ছেঁড়া মন মুহূর্তে বাড়ি পৌঁছুবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতো। স্টিমারে গেলে সারেং, সুখানী, ড্রাইভার কর্মচারীদের দেওয়া খাবার কপালে জুটতো প্রচুর। এ-উপহার জুটতো বাবার সম্মানে, তিনি তখন সোনাচোরা ডকের ডাক্তার। তাই ছোটবাবু (আমি) তাদের আপনার জন, তাকে আদর করার অর্থ তার পিতাকে সম্মান দেখানো। নৌকোতে গেলে যেতাম চারার গোপে। আমাকে দেখামাত্রই জন দশেক মাঝি হুমড়ি খেয়ে এসে দাঁড়াতো চারপাশে। তারা সবাই প্রায় মুসলমান। কার নৌকোয় উঠবো ভেবে ঠিক করতে পারা যেতো না। যাকে প্রত্যাখ্যান করবো তারই তো হবে অভিমান! তবুও কেউ কেউ আমার শোচনীয় অবস্থাটাকে আরো সঙীন করার জন্যেই ছোঁ মেরে নিয়ে যেতো বাক্স—বিছানা—সুটকেশ। তারপর সমস্বরে আহ্বান জানাতো—'আইয়েন ছোড ডাক্তারবাবু আমার নাওে, ছোড

' কইরা যাইতে পারবেন!' পিতার খেতাব আমার কপালে যেন উত্তরাধিকার-সূত্রেই জুটেছিলো! এরপর কাঁচুমাচুমুখে একজনের নৌকোয় গিয়ে হয়তো উঠতাম—যারা সুটকেশ ও বিছানাদি নিয়ে গিয়েছিলো তখন তারা তা হাসি-মুখেই ফিরিয়ে দিয়ে যেতো সে নৌকোতে। আমি সাধারণত যার নৌকোয় যেতাম, মনে পড়ে, সে গান গাইতে পারতো চমৎকার। রসুল মাঝি বলেই সে পরিচিত ছিল আমাদের কাছে। নৌকো ছেড়ে সে ডান হাতে দাঁড় টানতো আর বাঁ হাতে হুঁকো ধরে টানতো কড়া তামাক। তামাক খাওয়া শেষ হলে ছোট্ট একটা কাশির পর উদাত্তকণ্ঠে গান ধরতো সে—

'গুরু আর কতদিন থাকবা ফারাক্
পাইনা তোমার স্থাহা,
কত দুঃখ সইলাম দরায়
নাইকো ল্যাহা জোহা।'

গুরুভজা রসুলমাঝি গান গেয়ে চলেছে আনমনে একটানা। অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে শীতলক্ষ্যার পূব পাড়ে ঢাকেশ্বরী মিলের চিমনি, বসু গ্লাস ওয়ার্কসের কারখানা। পশ্চিমদিকে পাটের কল, দু নম্বর ঢাকেশ্বরী মিলের চোঙা, লক্ষ্মীনারায়ণ মিল আর চিত্তরঞ্জন মিলের খাড়া-উঠে-যাওয়াচিমনির শ্রেণী অবিরাম ধোঁয়া উদ্গীরণ করে চলেছে যেন মানুষের ইতিহাসকে কলংকমলিন করার উদ্দেশ্য নিয়েই!

আজ বেশি করে মনে পড়ছে রসুল মাঝির ভারি খোলা গলার ভক্তিমূলক সে সব গান। শীতলক্ষ্যার জলে তার দাঁড়ের ছপাছপ্ শব্দ আমাকে যেন অন্য কোন্ জগতে নিয়ে যেতো। সেদিনকার গোধূলি বেলায় বৈরাগীমন যেমন নিমেষে চলে যেতো অন্য জগতে আজ রূঢ় বাস্তবময় পরিবেশে দেহও স্থানান্তরিত হয়েছে অন্যদেশে! চিরদিনের জন্যেই কি হারিয়েছি শীতলক্ষ্যার শান্ত করুণ মিনতিভরা রূপকে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা জননী জন্মভূমিকে! বিচ্ছেদব্যথায় হৃদয় টন্‌টন্ করলেও সেই অভিশপ্ত দেশে আজ ফিরে যাবার আর কোন উপায় নেই। স্মৃতির সংগেই জড়িয়ে থাকুক আমার জন্মভূমির আগের সেই স্বচ্ছল রূপটি!

মাতৃভূমিকে ছেড়ে আসার সংগে সংগে ফেলে এসেছি সমস্ত ঐশ্বর্য ও সম্পদকে।

অকৃত্রিমভাবে বুঝতে পেরেছি স্বাধীনতা আমাদের দেশে পরাধীনতার অভিশাপ নিয়েই দেখা দিয়েছে। অমাবস্তার ঘোর কালরাত্রির মধ্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি বলেই জীবনেও দেখা দিয়েছে অমাবস্তার করাল ভয়াল মূর্তি! রাত্রি প্রভাতের কত দেরি কে বলে দেবে? মহামনীষীরা স্তোক দিয়েছেন wait for the morning owl! কিন্তু শীতলক্ষ্যার তীরে আবার পূবাকাশের সূর্যোদয়ের রক্তরাগ-রেখায় গোধূলির দেখা পাবো কিনা জীবনে কে জানে?

সন্ধ্যাবেলায় দেখতাম একহাতে প্রদীপ আর অন্যহাতে ধুনুচী নিয়ে প্রাংগনপাশে তুলসীমঞ্চে মা গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছেন। দেবতার কাছে তিনি কী প্রার্থনা করতেন জানি না,কিন্তু আজকের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, তাঁর ভীরু হৃদয়ের উজাড়-করা প্রণাম এবং প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি। জীবনকে বিপদমুক্ত করার সব আবেদনই ব্যর্থ হয়েছে আমাদের। একা একা থাকলেই মনে পড়ে যায়, গ্রামের নিস্তব্ধ দুপুরে জামের ডালের ওপর বসা ঘুঘু দম্পতির একটানা স্বর। আজো হয়তো শুনতে পাওয়া যায় সে স্বর, কিন্তু সে ডাকে ক'টা মানুষের মন সাড়া দেয় এখন? হয়তো সমস্ত ভিটেতেইআজ অসংকোচে ঘুঘু চরছে কিনা তাই বা কে বলবে?

দুরন্ত দুপুরের ছবি যেন ক্রমাগত চোখের সামনে ভেসে উঠছে আজ। মনে হচ্ছে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সামনে সবুজ মাঠের বিস্তীর্ণ ফসল ফলার ছবি। কোন জমিতে ধান গাছ বাতাসের সংগে মাথা দুলিয়ে নড়ছে সবুজ যৌবনকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে, আবার কোন মাঠে অজস্র পাট চারার সমারোহ। সব ক্ষেতে উবু হয়ে বসে মাথায় 'টোকা' দিয়ে ক্ষেত নিড়ি দিচ্ছে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে কৃষকের দল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আবার গানও হচ্ছে—'কোহিল ডাইক্কোনা ডাইক্কোনা ওই কদম্ব ডালে!' জমি থেকে উঠছে কুণ্ডলী কেটে ধোঁয়া, খড় পাকিয়ে লম্বা দড়ি করে তার গোড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছে তামাক খাওয়ার জন্যে। সংকীর্ণ আল দিয়ে হেঁটে চলেছে ক্লান্ত 'বি' সিফ্‌টে ছুটি পাওয়া শ্রমিকদল। কারুর মাথায় ছাতা, কারুর মাথায় বড় বড় কচু পাতা! কেউ যাবে রাণীঝি, কেউ জাঙ্গাল, কেউ বা পূবদিকের নমঃশূদ্র পাড়ায়। কারুর গন্তব্যস্থল মালীবাগ্, কারুর বা আরো দূরে লাংগলবন্ধ। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপাড়ে হিন্দুতীর্থ লাংগলবন্ধ খুব কাছে নয়।

ছোটবেলায় মায়ের সংগে অষ্টমীস্নান করতে কতোবার এই লাংগলবন্ধে গিয়েছি। দূরত্ব ছিলো আইল দুই পথ। গ্রামের গৃহিণীরা যেতেন পাল্কী চেপে, কিন্তু মাকে কোনদিন পাল্কীতে যেতে দেখিনি। তিনি বলতেন, "এইটুকু পথ চলতে না পেরে পাল্কীতে চড়ে তীর্থ করতে হয় যদি, তা হলে সে তীর্থের ফল কী? ওরকম তীর্থ করার চেয়ে না করাই ভালো।" তাই মুখ কালো করে আমাকেও হাঁটতে হতো তাঁর সংগে। মায়ের হাঁটা ছিল বড় আস্তে, ভোর চারটের সময় যাত্রা করেও তাই আমরা পৌঁছুতাম রোদ উঠে যাওয়ার পরে। আমাকে হাঁটতে হতো না বড় একটা, কেননা সংগে থাকতো দু জন প্রজা। একজন মামুদ আলী আর একজন কালীচরণ। চলার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে বিষণ্ণ মুখে মায়ের আঁচল চেপে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলতাম—'মা. পা বড্ড কন্‌কন্‌ করছে!' মা জবাব দেবার পূর্বেই চতুর মামুদ আলী বুঝে ফেলতো আমার চালাকি। হাসিকে আকর্ণ বিস্তৃত করে মায়ের হয়ে সে-ই বলতো—"আইয়ো, আইয়ো, তোমার চালাকি বুঝি বুজি না ছোট্টবাবু!" এই বলে স্বচ্ছন্দে সস্নেহে সে তুলে নিতো ঘাড়ে।

মাঠে মাঠে রাস্তা কিছু কম, তাই আমরা আল ধরে এগিয়ে যেতাম। দেখতাম অজস্র ভক্ত তীর্থযাত্রী ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে ছুটে চলেছে তীর্থ-সলিল স্পর্শ করতে। পুণ্যকামী বাঙালীর এই চিত্র সর্বত্রই এক। চল্‌তে চল্‌তে চোখে পড়তো শস্য-শ্যামলা মাতৃভূমির লুকানো সম্পদ। ধান-পাট-মেঠোকুমড়ায় মাঠ পরিপূর্ণ। কোথাও লাল লংকায় লালে লাল। মেলার পথে দোকানদাররা নিয়ে চলেছে ধনে-জিরে-তেজপাতার তৈজসপত্র! আবার কারুর মাথায় খৈ-মুড়কি-ডবল বাতাসার গুরুভার। যাত্রীরা এইসব জিনিস কিনে আনবে বাড়ি ফেরার পথে! মামুদের কাঁধে গদিয়ান হয়ে মনটা বেশ স্ফূর্তি স্ফূর্তিই ঠেকতো।

ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে মেলার হট্টগোল, খোলের মিঠে আওয়াজ, কীর্তনের অসমাপ্ত কলি। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন হাঁকছে 'বিশুবাই' নাম ধরে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি উজ্জ্বল দাঁত বের করে হাসছে গংগা। বাল্যবন্ধু গংগা, সহপাঠী গংগা—অবাঙালী গংগা। জন্মেছে আমাদের গ্রামে, বাড়ি মুংগের জেলার কোন পল্লীতে। তার বাবা রংলাল চৌকিদার। গংগার ভাগ্যে কোনদিন

জন্মভূমি দেখার সুযোগ হয় নি, সে আমার গাঁয়েরই ছেলে, তাকে দেখে কাঁধ থেকে নামতে চাইলাম, কিন্তু মামুদ ধমকে বলে উঠলো—"না ছোটবাবু আরাইয়া আইবা বীড়ের মইধ্যে লামতে দিমু না—' কি করি উঁচু থেকেই গংগার সংগে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললাম। মেলায় পৌঁছে দেখি স্নান সেরে মেয়েরা কাঁকে বা মাথায় নতুন হাঁড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী শিশু সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল কাঁধের ওপর থেকে—'মামুদ ভাই, হাঁড়ির মধ্যে কি নিয়ে যাচ্ছে ওরা?' মামুদ বিজ্ঞের মত কম কথায় উত্তর দিছে ছিলো—"পূইষ্যি!"

কলকাতার পথে চলতে চলতে শুনতে পাই বেতার শিল্পীদের ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, বাউল, শ্যামাসংগীত এবং আরো কত রকম ভক্তিমূলক গান। এসব শুনলেই মনটা আকুলি বিকুলি করে ওঠে শৈশবে দেখা কিশোরী বাউলের কথা ভেবে। কিশোরী বাউলের সেই টানাটানা চোখ দুটো আজো আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে যেন! ভুলতে পারিনি তার সৌম্য-সুন্দর ঢলঢলে মুখটি। পরণে গেরুয়া, এক কাঁধে ঝুলি আর এক কাঁধে সারেংগী। মাসান্তে দেখা পেতাম তার ঠিক দুপুর বেলায়। তার গান শোনার জন্যে উদগ্র হয়ে থাকতাম নির্দিষ্ট দিনে। কিশোরী বাউল তার সারেংগীর ওপর ছড় ঘষতে ঘষতে ঢুকতো লাল সুরকী-ঢালা পথ বেয়ে। বেরিয়ে বারান্দায় আসার সংগে সংগে কিশোরী প্রণাম করতো আমাকে। তারপর একটুখানি বসে গান ধরতো—'আলোকের পূর্ণ ছবি আর কতদিন রবে দূরে।' আজ কিশোরী কোথায় জানি না, তবে তার সংগে দেখা হতেও পারে একদিন। কারণ কিশোরীই বলেছিলো আমাকে—'বাবু বাংলা দেশের যেখানেই থাকেন না কেন, এই কিশোরীর সংগে আপনাদের দেখা হবেই।'

কলকাতার বর্ষা দেখে আমার ছেড়ে আসা গ্রামের বর্ষার রূপ মনে পড়ে। ডোবা নালা সব জলে টইটম্বুর। পুকুরের পাড় ভেঙে ছুটছে জলের স্রোত—সেই স্রোতের একপাশে বঁড়শি নিয়ে মাছ শিকারে ওৎ পেতে আমি বসে। শোঁ শোঁ শব্দে জল যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। আজ মনে হয় সেই অশ্রান্ত বাঁধ ভাঙা জলের কল্লোল ধ্বনি আর কিছুই নয়, বিপর্যস্ত মানুষের হাহাকার যেন—জলস্রোতের শিহরণ আজকে আমার মনে জনস্রোতের বিহ্বলতার কথাই মনে করিয়ে দেয়

ঘরছাড়া মন জলস্রোতের সংগে জনস্রোতের সাদৃশ্য কী করে খুঁজে পেলো জানি না। জল ঝরে পড়ার শব্দে শিশুমন যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো আজকে কেন জানি না হৃদয়তন্ত্রীতে সেই শব্দ ব্যথার রেশ লাগায়। হয়তো ব্যথাতুর মন প্রকৃতির মধ্যে বেদনা-বিধুর আবেশটিকেই গ্রহণ করে। মেঘের খেয়ায় খেয়ায় মন উদাসী।

বর্ষার জলে মাঠ থৈ থৈ করছে, পাটগাছগুলো কাটা হয়ে গেলেও ধানগাছগুলো খাদ্যভারে বাতাসে দোল খাচ্ছে জলস্রোতের মুখে। জলের মধ্যে মাথা তুলে রয়েছে একটা কদম গাছ ফুল সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে। পাতার গা বেয়ে জল ঝরছে টিপটিপ শব্দে। সামান্য শব্দ সামান্য দৃশ্য যে মনকে এতখানি ভাবিয়ে তুলতে পারে কোনদিন তা দুঃখ না পেলে বুঝতে পারতাম না। মনকে উৎসুক, উদগ্র করেছে সংকট—আজ বুঝতে পারছি সংকট না এলে ইতিহাস সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রাণঘাতী এ ইতিহাস আমাদের জীবনকে মূলধন করে না গড়লে কী ক্ষতি হতো ভবিষ্যতের ?

জীবনকে ঘিরে রয়েছে দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। রাত্রিকে পাড়ি দেওয়ার শক্তি কোথায় পাবো? প্রতি বাস্তহারার চোখের জল যেন অশান্ত পদ্মার উন্মত্ততার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অহরহ। যাদের ছিলো ঘর তারা আজ মুক্ত আচ্ছাদনহীন বিস্তৃতভূমিতে নিরলম্ব হয়ে রাতের পর রাত কাটাচ্ছে। একপ্রদেশ থেকে এক এক দলকে বিতাড়িত করা হচ্ছে অন্য প্রদেশে। ভয় হয় এ ধরণের বিতাড়নে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের থিসিসের খোরাক হয়ে দাঁড়াবে না তো শেষে ? যাযাবর জাতিরা মাটিকে কেন্দ্র করে তবেই সভ্য হয়েছিল একদিন আর আমরা মাটিকে হারিয়ে হলাম যাযাবর ! আমাদের এই ভ্রান্ত পথের অবসান কবে হবে কে জানে ! অসভ্য থেকে সভ্য হবার নীতি, না, সভ্য থেকে অসভ্য হবার নীতি কোন্‌টা বেছে নেবে আজকের মানুষ ?

আনরাবাদ

দেশের কথা নির্জন জীবনে আজ নানাভাবে বেশি করে মনে পড়ছে। মনের ছায়াতলে বিনা ভাষায় বিনা আশায় আমার ছোট্ট, নিরালা গ্রামখানি বার বার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পরমুহূর্তে যাচ্ছে মিলিয়ে। দেশজননীর কথা, জন্মভূমির কথার অর্থই হোল অজান্তে নিজের কথা। শিশু শুধু নামের নেশাতেই ডাকে, সে যে কথা বলতে শিখেছে এটাই সেখানে বড় কথা। সেই রকম আমার গ্রামের কথা বলাও একটা সুখস্মৃতি। আজকে প্রাকৃতিক সুষমামণ্ডিত আমার সেই ছোট গ্রামখানিই মনের মণিকোঠায় পূর্ণতালাভ করেছে।

বসন্তের প্রতীক কচি কিশলয়, ফোটা মুকুলের মিষ্টি গন্ধ, লতাগুল্মের ছায়ায় বসা দোয়েল-শ্যামার ডাক মনকে কেন জানি না লোভার্ত করে তুলছে এই ইটকাঠ ঘেরা অকরুণ মহানগরীর কারাগারের মাঝখানে। এখানে রাত্রির কোন মনোহারিণী রূপ নেই, রাতের কলিকাতা ভয়ংকরতারই প্রতীক! কিন্তু আমার সেই ছেড়ে আসা গ্রামের অন্ধকারের রূপও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! ঝিল্লিমুখরিত অন্ধকার রাত্রে শেয়ালের ডাক এক নিমেষেই চমৎকার একটি গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। এ কথা বুঝতে পারছি অনেক দূরে এবং চিরতরে গ্রামকে প্রণাম করে আসার পর। 'নগরজীবন বনাম গ্রাম্য-জীবন' সম্বন্ধে শৈশবে একবার আমাদের মাষ্টারমশাই রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিন আমি নগরের রূপটির বাইরের চাকচিক্য দেখে তার দিকেই ভোট দিয়েছিলাম। আজ আক্ষেপ হয় গ্রামকে অবহেলা করেছি বলে, গ্রামকে সেদিন চিনিনি বলে! শৈশবের সেই বোকামির জন্যে দূর থেকে পরবাসীর মতোই ভক্তিভরে তাকে প্রণাম জানিয়েছি এই বলে—'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।'

ঢাকা জেলার কুখ্যাত রায়পুরা থানার অন্তর্গত আনরাবাদ আমার গ্রাম। গ্রাম হিসেবে ইতিহাসবর্জিত, অখ্যাত অজ্ঞাত হয়তো অন্যের কাছে। কিন্তু তবু সে যে

আমার আরাধ্যা জন্মভূমি! মাইল তিনেক দূরে মেঘনা, এক মাইল দূরে রেল-ষ্টেশন, দু' মাইল দূরে থানা, আর ষাট মাইল দূরে কাছারি বাড়ি। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, বাঁশ, বেত আর বনালী গাছের ছায়া ঘেরা আনরাবাদ নিস্তব্ধ। কোলাহলমুখর জীবন থেকে মুক্তি চাইলে আনরাবাদ আজকের বিংশ শতাব্দীর কেজো মানুষদের শান্তিময় পরিবেশের সন্ধান দিতে পারে।

আমাদের গ্রামে বাস করতেন অনেক বড় বড় পণ্ডিত। বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ বিদ্যালংকার, স্মৃতিতীর্থের তীর্থভূমি বললেও এ গ্রামকে বাড়িয়ে বলা হয় না। দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসতো এই গ্রামের পণ্ডিত সমাজের কাছে বিধান নিতে; তাঁদের মুখের কথাকে আমরা বেদবাক্য মনে করতাম। টোল ছিল অনেকগুলো, ছোটবেলায় দেখেছি সেখানে বহু বিদ্যার্থী আসতো বিদ্যার্জনে। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের আশ্রমের কথা শুনেছিলাম ঠাকুরমার মুখে, এগুলো দেখে সেই আশ্রমস্মৃতি যেন চোখের সামনে উঠতো ভেসে।

গ্রামবাসীর প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত অল্প, তা ছাড়া, মালিন্য যারা আনে তেমনি সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের গ্রাম থেকে দূরে থাকায় মিথ্যে-গোলমালের হাত থেকে আমরা একরকম মুক্তি পেয়েছিলাম। থানা-পুলিশের দূরত্ব, কোর্ট-কাছারির দূরত্ব একটু বেশি হলেও শান্তিভংগ কোনদিন হয়নি। সেই শান্তি-শৃংখলার কোন বালাই আর আজ নেই সেখানে। তবু আজো মরুভূমির মধ্যে আমার গ্রামটি দাঁড়িয়ে আছে ওয়েসিসের মতো।

পাকিস্তান হবার কিছুদিন পরে দেখে এসেছি আমার গ্রামকে—মায়ের আমার সে রূপ গেল কোথায়? অশ্রুরোধ করতে পারিনি তাঁর হৃতশ্রী দেখে। ঝাড়ের বাঁশ বাড়ি ফেলেছে ঘিরে, যে আঙিনায় বারো মাস থাকতো আলপনার ছাপ সে ছাপ কবে মুছে গেছে। আঙিনায় গজিয়েছে মানুষ সমান বুনোঘাস। ঘরদোর খাড়া রয়েছে বটে, কিন্তু সমস্তই শ্রীহীন—প্রেতপুরীর মতো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রামটি! বিষাদবিধুর নিস্তব্ধতা শ্বাসরোধ করে তুলেছিলো আমার। এমন রূপ কোনদিন আমার দেশজননীর দেখবো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন সূর্যাস্তের সংগে সংগে সুরু হয় নিশাচর শ্বাপদ এবং দ্বিপদের অভিযান। কোন

উপায় যাদের নেই তারা সেই সব অত্যাচার সহ্য করে আজো মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে সে গাঁয়ে। প্রকৃতির শ্যামচিক্কণ আঁচল দিয়ে যে গ্রাম ছিল ঢাকা তার এ ধরণের শান্তিভংগ যারা করেছে তাদের কি প্রকৃতিদেবী কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন ?

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি জননীর অঞ্চলতলে ছিলাম নির্বিঘ্নে নির্ভাবনায়। তাই বুঝিনি গ্রামের শান্তি, জননীর স্নেহ কতোখানি নিবিড় হতে পারে। বিগত জীবনে সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে মায়ের যে অভয়বাণী অথবা স্নেহ সুনিবিড় শীতল ছায়ার আস্বাদ পেয়েছি তা আজ এক সংগে ভেসে এসে বিষাদখিন্ন মনকে শৈশব-কৈশোর-যৌবনের পরমানন্দরূপটি মনে করিয়ে দিয়ে অসহ্য ব্যথায় হৃদয়তন্ত্রীকে বিকল করে দিচ্ছে যেন। আজ সেদিনের স্মৃতিকে স্পর্শ করতে যাওয়াকেও আমার পক্ষে দোষাবহ মনে হচ্ছে! যেখানে চল্লিশ বছর কাটিয়েছি, যেখানকার বাতাস আমার জীবন বাঁচিয়েছে, যে গ্রামের রূপ দেখে জ্যোৎস্নারাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছি এক একদিন, যেখানকার বাসিন্দাদের গলা জড়িয়ে ধরে পরস্পরের সুখে দুঃখে হেসেছি অশ্রু বিসর্জন করেছি, লজ্জার কথা, সেখানে আমি অনাত্মীয় আজ—নিজের মায়ের ওপর কোন স্নেহের দাবীই নেই আমার, আইনের চোখে আমরা আজ বিদেশী! দেশে যেতে গেলেও চাই পাসপোর্ট, চাই ভিসা। এরকম লজ্জা বিশ্বের অন্য কোন জাতি এতো নিবিড় করে অনুভব করেনি বোধহয়।

আজো নিয়মিতভাবেই আসে দুপুর, কিন্তু দেশের মতো ছুটে আমবাগানে গিয়ে দুপুরটা কাটাতে পারি না। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত লোভনীয়—সকাল থেকে নুন-লংকা গুঁড়িয়ে কাগজে জড়িয়ে রাখার ইতিবৃত্ত মনে করলে চোখটা সজল হয়ে ওঠে আজো। মা-বাবার তন্দ্রা আসার সংগে সংগেই সন্তর্পণে খিড়কি খুলে বাগানে পালানো বইপত্র ফেলে, তার তুলনা কোথায়! ছোট বোনকে পরিবেশ-পরীক্ষক হিসেবে রেখে পালাতাম আমের লোভ দেখিয়ে—বেচারী ঠায় বসে থাকতো গুরুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের কাঁচা তন্দ্রা ভাঙবার আগেই সে ছুটে গিয়ে খবর দিতো চুপিচুপি—আর আমিও ঠিক আগের মতোই আবার শান্তশিষ্ট ছেলের মতো অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে

বিভাজ্যানে লেগে যেতাম। বই-খাতার নীচে থাকতো আমের কুচি। নুন-লংকা সহযোগে যথা সময়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহারও আমার পক্ষে ছিল একটা কর্তব্য কাজ! এই ধরণের ফাঁকি দেওয়া অবশ্য রোজ সমান চাতুর্যের সংগে সম্ভব হতো না। কোন কোন দিন বোনটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে রেখে যাওয়ার ফলে বিপদে পড়তে হতো। সে দুষ্টুমি করে খবরই দিতো না আর সেদিন। আমরা তো অকুতোভয়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ফলাহারে উন্মত্ত হয়ে উঠতাম সময়ের দিকে না তাকিয়েই! অবসাদ এলে বা পেট ভর্তি হয়ে গেলে গাছ থেকে নীচে নেমে দেখতাম সন্ধ্যের আর বেশি দেরি নেই! সেদিন কপালে চড়-চাপড় যে পরিমাণ জুটতো তার কথা আর নাই বা বললাম! সে কথা আমাদের লজ্জার ইতিহাস—সুতরাং চেপে যাওয়াই ভালো!

সন্ধ্যেবেলায় ব্রাহ্মণপাড়ায় কাঁসর ঘণ্টা বাজাবার সংগে সংগে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম প্রসাদ পাওয়ার লোভে। সেদিনের সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ যদি কিছুটাও অবশিষ্ট থাকতো তা হলে মনে হয় এতোখানি মিইয়ে পড়তাম না দুঃখের ভারে। লাঞ্ছনা-অপমান পেয়ে পেয়ে মনের অপমৃত্যু ঘটেছে—সৌন্দর্যের মৃত্যু মানেই মানুষের মৃত্যু। যদি বাঁচতে হয় এগুলোকে আবার জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, কিন্তু যা প্রয়োজন এবং যা করা কর্তব্য তা সব সময় আমরা করি কোথায়? বাসস্থান, চাকুরিসংস্থান, দৈনন্দিন অনটনের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে কি আমাদের ভবিষ্যৎ তলিয়ে যাবে?

এ কি জীবন, না জীবনের অভিনয়? এ প্রসংগে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গ্রীষ্মকালে আমাদের থিয়েটার হতো প্রতি বছর মহা ধুমধামের সংগে। গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলোকে স্মরণযোগ্য করার উদ্দেশ্যেই হতো অভিনয়ের ব্যবস্থা। সচরাচর আমরা অভিনয় করতাম পৌরাণিক নাটক। নরমেধযজ্ঞ, বিল্বমংগল, জনা, সগরযজ্ঞ, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদির অভিনয় একদা মাতিয়ে তুলতো সমগ্র গ্রামখানিকে। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, এর মূল অভিনেতারা প্রায় সবাই ছিলেন গুরুজনস্থানীয়। বাবা, মামা, মেসো, পিসে, দাদা ভাই সবাই মিলে পার্ট মুখস্থ করেছি সারাদিনরাত ধরে—একে ওকে হঠাৎ মাঝখান থেকে খানিকটা দরাজ গলায়

অভিনয়াংশ শুনিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত মজার ব্যাপার ছিল। এতোটুকু আবিলতা ছিল না তার মধ্যে। বাবাকেই হয়তো আমি অভিনয়ের ঘোরে এক ফাঁকে কখন বলে ফেলেছি—"দেখো সেলুকস্, কি বিচিত্র এই দেশ!" বাবা শুনে মুচকি হেসেছেন। তাঁর ছেলে রাতারাতি যে আলেকজাণ্ডার বনে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি তাঁর। কিন্তু উজ্জ্বল সেই দিনগুলোর ওপর কালবৈশাখীর ঝড় এলো কেন? মনের আনন্দে মিলে-মিশে কাজ করতাম, তার বিপক্ষে এমন সুনিপণ করে জাল পাতলো কোন্ হৃদয়হীন ব্যাধ?

গ্রীষ্মের পরই সুরু হতো বর্ষা। কাজলকালো মেঘমেদুর বর্ষা গ্রামটিকে থম্‌থমে করে দিতো এক নিমেষে। টিপ্ টিপ্ ইলসে গুঁড়ি থেকে ঝম্‌ঝম্ ধারার মুষলবৃষ্টি সবই লক্ষ্য করতাম সেই ছোট বেলায় জানলায় বসে বসে। মাঠ-ঘাট জলে থৈ থৈ করতো, কৃষকেরা ভিজতে ভিজতে কাজ করে আর গান ধরে মনের খুশিতে। শ্রাবণ-দিনে চাষবাস আর রাত্রে মনসার পুঁথি পড়াই তাদের দৈনন্দিন কাজ। বানান করে করে অপটু পড়ুয়ার মতো পুঁথি পড়লেও তাতে আনন্দ পায় তারা বেশ—সেই সংগে আনন্দ বিতরণও করে পড়শী ভক্তদের মনে। শ্রাবণ মাসের শেষদিনে লখীন্দর উপাখ্যান শেষ করে তারা পদ্মপুরাণ কাপড়ে জড়িয়ে উঠিয়ে রাখে চাঙে।

আজ মনে পড়ে কৃষ্ণকিশোর কীর্তনীয়াকে। বড় ভালো কীর্তনগান করতো, সে ছিল গ্রামের প্রাণস্বরূপ। তার পালা-কীর্তনে মুগ্ধ হতো না এমন লোক দেখিনি। সুললিত কণ্ঠস্বরে তালমান বজায় রেখে অকৃত্রিম ভক্তিভরে চোখ বুজে সে কীর্তন ধরতো যখন—

ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধ দিব কেমনে
বুঝাইলেও বুঝ মানে না নিমাই চান্দ বিনে—
যেমন তৈল বিনে বাত্তি জলে না,
প্রাণ বাঁচে না জল বিনে।

অথবা

শুয়েছে গো বিষ্ণুপ্রিয়া—
কাল ঘুমেতে অচেতন

মায়া-নিদ্রা ভেঙে নিমাই হলো সন্ন্যাসে গমন।
আমি বিদায় হলুম, ওগো প্রিয়ে দেখে যাও
জনমের মতন।

তখন অতিবড়ো পাষণ্ডেরও চোখে জল দেখেছি। কৃষ্ণকিশোরের গলা আজো মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাতাসে, অনেক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে বসি মনের ভুলে, কানে বাজে, সেই কৃষ্ণকিশোর যেন সতর্ক করার জন্যে গান ধরেছে—"বিদায় হলুম, ওগো প্রিয়ে দেখে যাও জনমের মতন!" সত্যি বিদায় হয়েছি জন্মের মতো, কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে নয়, অপরাধীর চরম দণ্ড দ্বীপান্তর সাজা গ্রহণ করে!

এই বিষাদময় দুঃখের মধ্যেও আনন্দের দিনগুলোকে বাদ দিতে মন সরে না। বারোমাসে তের পার্বণ লেগেই থাকতো আমাদের গ্রামে। শারদোৎসবই হতো সব চেয়ে ধুমধামের সংগে। মেঘমুক্ত আকাশ, বাড়ির প্রাংগণে শিউলি ফুলের বন্যা, স্থলপদ্ম, জলপদ্মের সমারোহে মন থাকতো এমনিতেই খুশি। মাঠে মাঠে ধানের শিশিরভেজা সোঁদা সোঁদা গন্ধে অনির্বচনীয় মনে হতো আনন্দোচ্ছ্বাসকে। শারদীয়ার আগের আর একটা দুষ্টু অনুষ্ঠানের কথাও বাদ দেওয়া চলে না। সেটা হলো নষ্ট চন্দ্র! ভাদ্রের শুক্লাচতুর্থীর রাত্রে এই নষ্টচন্দ্রের কোপে কতো গৃহস্থ যে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন তার হিসেব নেই। রাত্রে কতো যে চুরি গেছে গৃহস্থের মিষ্টি কুমড়ো, শশা, জাম্বুরা (বাতাবীলেবু) আর আখ তা ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা মনে মনে হয়তো একটা হিসেব করে নিতে পারবেন! একে চুরি বললে ভুল করা হবে। গাছের জিনিস ভাগ করে রেখে দেওয়া হতো সকলের দরজা গোড়ায়। সকালে উঠে এসব দেখে কেউ বড়ো একটা আশ্চর্য হতো না, শুধু যাদের বাগান থেকে ফল খোয়া গেছে তারাই পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের উপলক্ষ্য করে সামান্য গালিগালাজ করতো মনের দুঃখে! সে গালাগালও আজকের বাস্তব গালাগালের চেয়ে মিষ্টি ছিলো ঢের। তার ভেতর খানিকটা স্নেহের আমেজও মেশানো থাকতো, কেন না অনেকক্ষেত্রে বাড়ির দু একটি ছেলেও যে সে চুরিতে যুক্ত থাকতো।

আর একটা ভোজের মওকা জুটতো ভাইফোঁটা উৎসবে। সে আর এক

বিরাট ব্যাপার ! গ্রাম সম্পর্কে বোন হলেও অনেকেই ফোঁটা দেবার অধিকারী। ফোঁটা নিতেই হবে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। ফোঁটায় ফোঁটায় সেদিন কপালের অবস্থা হতো সঙীন,—এক ইঞ্চি 'লেয়ার' পড়ে যেতো পুরু কাজলের আর চন্দনের। বাড়ি ফিরতাম চন্দনচর্চিত-বনমালীর 'পোজে'—নড়তে চড়তেও বড় কষ্ট হতো সারাক্ষণ ভালোমন্দ খেয়ে খেয়ে ! বাঙালী ভাই-বোনের প্রীতি-বন্ধনের সে কী মধুময় স্মৃতি ! ভাইয়ের দীর্ঘ-জীবন কামনায় বোনদের কী সে আকুল আন্তরিকতা ! ভাইদের কপালে কাজল-চন্দনের ফোঁটা দিতে দিতে বোনেরা ছড়া কেটে বলতো—

প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা,
দ্বিতীয়ায় দিয়া নিতা ;
যমুনা দেয় যমেরে ফোঁটা
আমরা দেই আমাদের ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।
আজ অবধি ভাইয়ের আমার যমদুয়ারে কাটা !
ঢাক বাজে ঢোল বাজে আরো বাজে কাড়া,
যাইও না যাইও না ভাইরে যমেরি পাড়া।
আজ অবধি ভাইয়ের আমার যম দুয়ারে কাটা !

পূব বাংলার ঢাকা জেলার প্রায় সর্বত্রই ভাইফোঁটার উৎসব চলতো দুদিন ধরে। প্রতিপদে দেওয়া হতো ফোঁটা, আর দ্বিতীয়ায় বোনের দেওয়া প্রীতিভোজ। ভাইদের যমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে যে বোনেরা আজন্ম এমনি করে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছে বছর বছর, তাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতির বিনিময়ে কী করেছি আমরা তাদের জন্যে ? দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বোনেদের মান-মর্যাদাটুকু পর্যন্ত রক্ষা করতে পারিনি ! ভগিনীর সম্মান আমাদের প্রাণের চেয়েও যে অনেক বড়ো, একথা বিস্মৃত হয়েছিল আত্মবিস্মৃত বাঙালী। তাইতো আজকের এই লাঞ্ছনা !

এরপর থেকেই একনাগাড়ে চললো উৎসব। শীতে ঝরঝরা ভাত, সর পড়া ব্যঞ্জন আর পিঠে-পায়সের সমারোহ। পৌষ সংক্রান্তি, মহা-বিষুব সংক্রান্তি। বাস্তু পূজোর ধুম। হাজার বছরের পূজিত বাস্তু আজ যে এমনিভাবে ত্যাগ,

করে আসতে হবে তা কে জানতো! হায় বাসুদেব, অদৃষ্টের কি পরিহাস, তুমিও আমাদের রাখতে পারলে না! মাঘের প্রচণ্ড শীতে অনূঢ়া মেয়ের দল সূর্যোদয়ের পূর্বে পুকুরে স্নান করে দূর্বাদল মুঠো করে ধরে আবাহন জানাতো প্রাণের প্রতীক সূর্যদেবকে—

উঠো, উঠো সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া ··
উঠিতে না পারি হিমালয়ের লাগিয়া,
হিমালয়ের পঞ্চকন্যা সূর্যে করল বিয়া—
লও লও সূর্য ঠাকুর লও ফুল পানি।···ইত্যাদি।

এই যে কৌমার্যব্রত, এই যে কৃচ্ছ্রতাসাধন এই কি তার সফল প্রতিদান? এখানেই শেষ নয়। এরপর চলতো উদিত সূর্যের আরাধনা। গোময় প্রলেপিত আঙিনায় ইঁটের গুঁড়ো, বেলপাতা গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো, আবির হলুদের গুঁড়ো, তুষের গুঁড়ো দিয়ে কতো বিচিত্র চিত্রাংকণ হতো বাড়ির উঠোনে। মাসান্তে ব্রত সাংগ হলে কুমারীরা গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের খাওয়াতো নিমন্ত্রণ করে। এই মাঘমণ্ডল ব্রত পূব বাংলার পল্লীজীবনের এক অচ্ছেদ্য অংগ। এমনি ভুলে যাওয়া ব্রত যে কতো ছিলো আমাদের গাঁয়ে তার ইয়ত্তা নেই।

গোটা চৈত্র মাসটা ঢাকের বাজনায় মুখরিত থাকতো। গ্রামের সব যুবকরা আর প্রৌঢ়রা সন্ন্যাসী সেজে নামতো গাজনে। কী কঠোর ছিল সেই ব্রহ্মচর্য! এতে কোন জাতিভেদের বালাই থাকতো না। উচ্চনীচ সবাই এক সংগে পূতচিত্তে গুরু-সন্ন্যাসীর অনুশাসন মেনে চলতো। ঢাক-পাট নিয়ে তারা গান গাইতো মহাখুশিতে—অনেক সময় নিজেরাই বাদক, নিজেরাই গায়ক। শেষের দিকে রাত্রে 'কালীকাছ' অনুষ্ঠানটি ছিল বড় মজার। কেউ একজন অবিকল মা কালীর সাজে সজ্জিত হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতো বাজনার তালে তালে। সংগে সংগে চলতো মশাল। ঘুমন্ত চোখে ছেলেমেয়েরা জেগে উঠে সময় সময় ভয়ে শিউরেও উঠেছে। চীৎকার করে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে মায়ের আঁচলের তলায়। শেষ দিন হরগৌরীর যুগল মূর্তি গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে কল্যাণ কামনা জানাতো। তাঁদের হতো ব্রহ্মচর্যের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। নিজে চোখে দেখেছি কত বাজে

হাত দীর্ঘ জলন্ত অগ্নিচুল্লীর মধ্যে সন্ন্যাসীরা অবলীলাক্রমে পার হয়ে চলে যেতো। সুতীক্ষ্ণ খাঁড়ার ওপর উঠে নৃত্য করতো হাসিমুখে।

পার্লামেন্ট সভ্যদের মধ্যে লজ্জাকর গালাগালি আর কাদা ছিটোনো দেখে মনে পড়ে যায় আমাদের গ্রামের সেই বিরাট বকুল গাছ তলার কথা। ঐখানে জমতো গ্রাম্য পার্লামেণ্ট! আলোচনা, সমালোচনা, বিচার, বিধান প্রভৃতি সব কিছুরই নিষ্পত্তি হতো বকুলতলায়। আমাদের গ্রামে কোন কালেই পুলিশ আসেনি। এখানকার লোককে কোনদিন আইন-আদালত দেখেনি করতে। তারা ছিল নিরীহ শান্তিপ্রিয়, শাস্ত্রানুশীলনে রত। মেয়েরা ছিল ব্রত-পূজো-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত। অশান্তি দেখিনি গ্রামের কোথাও।

আজ আমরা সবাই গ্রাম ছাড়া। বকুলতলায় বয়োবৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, পূর্বে নদী ছিল এ অঞ্চলটা। কালক্রমে চরা পড়ে পড়ে এবং মুসলমান আমলে ধীরে ধীরে বসতি হতে হতে গড়ে উঠল এই গ্রাম। আনোয়ার খাঁ বলে কে একজন প্রথম এই জায়গাটি আবাদ করে বলে তারই নাম অনুসারে নাকি গ্রামের নাম হয় আনোয়ারাবাদ বা আনুরাবাদ। গ্রামের চতুষ্পার্শেই হিন্দু। এক সংগে এত হিন্দু খুব কম জায়গাতেই আছে। কিন্তু কালের গতি চিরকালই কুটিল। গ্রামের চারদিক কানা বিল, ঘাগটিয়া বিল, গজারিয়া বিল, মহিষা বিল, দীঘলী বিল, রাজুখালি বিল ও ইনাম বিল দিয়ে ঘেরা। মনে হয় এই সপ্তবিল দিয়ে পরিবেষ্টিত করে প্রকৃতি-দেবী শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যেই আনরাবাদ তৈরী করেছিলেন। দুর্গের মতো চারধারে পরিখা অতিক্রম করে শত্রুর আক্রমণ সত্যই ছিল এক অসাধ্য ব্যাপার। জানি না আবার আমরা পরিখা পেরিয়ে নিজের বাস্তুভিটেয় স্থান পাবো কিনা। আর কি কোন দিন দুই বাংলা এক হয়ে আনন্দোৎসবে মাতবে না! কিপলিঙের 'East is East and West is West' কথাগুলোকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আমরা কি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ কোন দিন আর দিতে পারবো না? হিন্দু-মুসলমান আবার আগের মতো নির্ভয়ে মনের সুখে পরস্পরের হাত ধরে বেড়াতে পারবে না, সে কথা যে আমি বিশ্বাস করতে পারি না!

শুভাঢ্যা

'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া !'

দৈন্যের দায়ে বেঁচে আসিনি, প্রাণের মায়ায় ছেড়ে এসেছি আমরা আমাদের সোনার মাকে। কবিগুরুর 'লক্ষ্মী ছাড়া' তিরস্কার আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় জানি, কিন্তু যে ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে এমনি লক্ষ্মীছাড়া, গৃহছাড়া হতে হলো সে ব্যবস্থার অধিকারীদের বিচারকর্তা কতোকাল ঘুমিয়ে থাকবেন ? এতোগুলো অসহায় মানুষের আর্ত ক্রন্দনে বিশ্ব-বিচারকের আসন কি টলে উঠবে না ? যদি না উঠে তা হলে তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই যে প্রশ্ন উঠবে !

কতোটুকুই বা তার আয়তন। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাইলখানেক আর মাইল দেড়েক মাত্র হবে হয়তো। কিন্তু দশ দশ হাজার লোকের ঘন বসতি ছিল একদা এ গ্রামে। ঢাকা শহরের দক্ষিণতীরে বাবুর বাজার ও কালীগঞ্জ খেয়াঘাট থেকে সুরু করে একটা পথ জিঞ্জিরা গ্রামের গোরস্থানের পাশ দিয়ে এবং আর একটি পথ শুভাঢ্যা খাল ঘিরে তার পশ্চিম তীর দিয়ে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর আখড়ার নিকট এসে মিলিত হয়েছে। ঢাকা থেকে আসতে হলে এ আখ্‌ড়া হয়েই আসতে হয় আমাদের গ্রামে। শুভাঢ্যা ছিল হিন্দু-প্রধান গ্রাম।

বাংলার এককালীন বিখ্যাত মল্লবীর স্বর্গত পরেশনাথ ঘোষের (ঢাকার পার্শ্বনাথ) জন্মভূমি, তাঁর শৈশব ও যৌবনের লীলাক্ষেত্র শুভাঢ্যা। এ গ্রাম ক্ষাত্রশক্তির জন্যে চিরকালই ছিল প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কাছে সে ক্ষাত্রশক্তির পরাক্রম যে অতি সহজেই পরাভব মেনে নিলো। এ পরাজয়ের কলংক আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষ কি মোচন করতে পারবে না কোন দিন ? না তারা শুধু অভিশাপই দেবে তাদের অপরাধী পূর্বপুরুষদের ?

নামকরা শিক্ষাবিদ্ ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় ও কলকাতার এককালের প্রসিদ্ধ

ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় এ গাঁয়ের মাটিতেই হয়েছিলেন ভূমিষ্ঠ। তখনকার দিনে সমগ্র বিক্রমপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম এ গাঁয়েরই এক পর্ণকুটীরে বাস করতেন; টোলে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন তাঁর ছাত্রদের। তাঁদের স্মৃতিপূত আমার পল্লীজননীকে চোখের জলে বিদায় দিয়ে এসে আমরা আজো বেঁচে আছি। কিন্তু এ বাঁচা যে মরার চেয়েও করুণ, তার চেয়েও বেদনাদায়ক।

কিন্তু চরম আঘাতে ভেংগে পড়লেও, চূড়ান্ত দুঃখের মধ্যে আজো সগৌরবে স্মরণ করি আমার গ্রামের নওযোয়ানদের আর তাদের অভিভাবকদের। বিদেশী চক্রান্তে বার বার ঢাকায় সুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আর সেই উন্মত্ততা পার্শ্ববর্তী পল্লীর শান্ত পরিবেশে করেছে অশান্তি উদ্গীরণ। আমার গাঁয়ের ওপরও তেমনি হামলা করার উদ্যোগ হয়েছে কয়েকবার। গোপীনাথজিউর আখড়া অবধি এগিয়ে এসেছে উন্মত্ত জনতা—কিন্তু তার বেশি আর নয়। শুভাঢ্যার শুভবুদ্ধি তার সমগ্র সত্তা ও শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে আর আক্রমণকারীদলের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেছে প্রতিবার সেই সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে।

সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। '৪৬ সাল। মুস্লিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র তাণ্ডবলীলা চলছে কলকাতায়, ঢাকায়, প্রায় সারা বাংলা জুড়ে। বাইরে থেকে শুভাঢ্যার দিকেও এগিয়ে এলো মারমুখো হয়ে একদল হাংগামাকারী—সাম্প্রদায়িক ধ্বনি তাদের সুউচ্চ কণ্ঠে, সশস্ত্র তাদের বাহু। কিন্তু সুবিধা হলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেলো তারা যে, এ বড় কঠিন ঠাঁই। দুর্জয় প্রতিরোধে স্তব্ধ হলো সমস্ত কলরব, ব্যর্থ হলো দুর্বৃত্তদলের অশুভ প্রবৃত্তি। শুভাঢ্যার জাগ্রত তারুণ্য সেবার শুধু তাদের আপন গ্রাম-জননীকেই রক্ষা করেনি, তাদের ঐক্যবোধ ও সাহসিকতায় রক্ষা পেয়েছে আশপাশের অন্যান্য পল্লী অঞ্চলও। তবে তার জন্যে দক্ষিণাও বড় কম দিতে হয়নি শুভাঢ্যাকে। লীগ সরকারের পুলিশী গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে আমার গাঁয়ের তিন তিনটি বীর যোয়ানকে। সেই গদাধর, ফুলচাঁদ আর ক্ষুদিরামের স্মৃতি-তর্পণই কি করে চলেছি আমরা সব-হারানোর অশ্রু আঁখিজলে? এ তর্পণের শেষ কি নেই?

আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের লীলাক্ষেত্র, [illegible] ভিটে ও অতি আদরের জন্মভূমি সেই গুভাট্যা গ্রামটি ছিল কতো বিচিত্র! গোপীনাথ জিউর আখ্‌ড়া থেকে শুরু করে যে দো-পায়া সড়কটা অনেক খাল ও নালা ডিঙিয়ে গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, তারই একটি শাখা আবার গাঁয়ের পশ্চিমাঞ্চল বেয়ে আঁকাবাঁকাভাবে পশ্চিম পাড়ার খেলার মাঠে মূল সড়কটার সংগে এসে মিশেছে। উত্তরপাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়ায় ছিল বিভক্ত আমাদের গ্রামটি। তার প্রত্যেকটি পাড়া ছিল আবার নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের পেশা অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা। যেমন কামারহাটি, মাঝিহাটি, বৈদিকহাটি ইত্যাদি। পূজো-পার্বন, খেলা-ধূলো, গান-বাজনা, প্রভৃতি প্রত্যেক অনুষ্ঠান নিয়ে এ তিন পাড়ায় কতো হৈ-চৈ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই না ছিল! পশ্চিমপাড়ার জনবল ও অর্থবল বরাবরই ছিল বেশি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাকি দুপাড়াকে হার মানিয়ে দিতো তারা। উত্তরপাড়ার জনবল ছিল কম। তাই ওপাড়ার ছেলের দল খেলাধূলো ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতো পশ্চিমপাড়ার সংগেই।

পদ্মা পার হয়ে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু ছেড়ে আসা গ্রামের সেই পুরানো স্মৃতি কি বিস্মৃত হওয়া যায়? পূজোর দিন ঘনিয়ে আসতেই আমাদের মতো প্রবাসীদের মধ্যে দেশে যাবার কী ধুমই না পড়ে যেতো। কাপড়-চোপড় অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে অনেকদিন আগে থেকেই আফিস ছুটির প্রতীক্ষায় দিন গুণতাম। আর দেশে যাবার দিনটিতে গাঁয়ে ফেরার মহানন্দে ঢাকা মেলে সে কী ভিড়! জোর ঠ্যালাঠ্যালি—সবাই উঠতে চায় গাড়িতে একসংগে—তর সয়না কারুর। তল্‌পা-তল্‌পি নিয়ে সবাই চলেছে 'দেশের বাড়ি'তে বাদুড় ঝোলা হয়ে। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে কতোবার গোয়ালন্দ পর্যন্ত চলে গেছি, তার ঠিক নেই। মনের আনন্দে কখন যে স্বর ভাঁজতে সুরু করে দিয়েছি রেল চলার তালে তালে তা নিজেরই হয়তো খেয়াল নেই। কখনো হয়তো বা জেনেশুনে 'অজান্তে' গেয়ে ফেলেছি—

'ফিরে চল, ফিরে চলে, ফিরে চল
আপন ঘরে।'

আমার গানে দোলা লেগেছে আর সব ঘরমুখো যাত্রীদের মনে। কিন্তু আজ পথমুখো হয়ে যেভাবে ঘুরে মরছি আমরা দোরে দোরে তার অবসান কবে ঘটবে, কবে ফিরে পাবো আমরা আমাদের জীবনের সেই হারানো স্বরকে! আমাদের মতো প্রকাণ্ড একটা গ্রামের আট-দশখানা দুর্গাপুজোর মধ্যে কেবলমাত্র দু'খানা ছিল সর্বজনীন। ব্যক্তিগত পুজো অপেক্ষা এ দুটি পুজোই হতো খুব ঘটা ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে। ঢাকীদের ঢাক বাজনায় সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠতো। দশহরার দিন বড় বড় পেটওয়ালা পাটের নৌকো ভাড়া করে প্রতিমা ভাসান হতো। নৌকোগুলোকে নানাস্থান ঘুরিয়ে রাত্রিবেলা বুড়িগংগার অপর পার—ঢাকা সহরের 'বাকল্যাণ্ড বাধে' ভিড়ান হতো। বিরাট এক মেলা বসতো সেখানে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই আসতো প্রতিমা দর্শন করতে। মিঠাই-মণ্ডা খেয়ে সারা রাত জেগে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর সবাই বাড়ি ফিরতো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

মনে পড়ে আমাদের পশ্চিমপাড়ার খেলার মাঠের কথা। পাঠ্যাবস্থায় গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে ঐ টুকুন চতুর্ভুজ মাঠে ফুটবল খেলার কী বিরাট ধুমই না পড়ে যেতো! ঐ মাঠেই অনুশীলন করে আমরা আশ-পাশের—এমন কি বিক্রমপুরস্থ দূর গ্রাম থেকেও কত শীল্ড-কাপ জয় করে নিয়ে এসেছি তার ঠিক নে।

ছেড়ে আসা গ্রামের আরো অনেক কিছুই আজ মনে পড়ে। মনে পড়ে. শীতের সময় শিবরাত্রির উৎসবের কথা। রাত্রি জাগরণের নামে যখন সবাই নির্জলা উপবাসে কাতর, আমরা তখন গাঁয়ের গৌর মুন্সী, আদিত্য ভট্ট আর শরৎ ভট্টদের খেজুর গাছের রস চুরি করে খেতাম। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতো সবার শরীর। কিন্তু তাতে কী?

চৈত্র মাসে চড়ক পূজোর কথাও ভুলতে পারা যায় না। গাজন দলের লোকেরা বাড়িবাড়ি কতো সঙ্ দেখিয়ে বেড়াতো, বেদে-বেদেনীর নাচ নাচতো। গাঁয়ের কবিয়ালরা চমৎকার নতুন নতুন গান বেঁধে তাদের সহায়তা করতেন। কুমাই-মুদি আর ট্যানা সাধু প্রভৃতি গাঁয়ের সে সব জনপ্রিয় কবিয়ালরা আজ কোথায়?

আমি তখন একেবারেই প্রাইমারী পাঠশালার নীচের ক্লাসে পড়ি। আমাদের গাঁয়েরই এক বাড়িতে কবিগানের আসর বসেছে'। '[illegible]' একজন উৎসুক

বোঝা। ঐটুকু বয়সে সে গানের অর্থ বোঝা দুরূহই ছিলো আমার পক্ষে। তবু দু'পক্ষের কবির লড়াই যে খুবই উপভোগ করেছিলাম, সে কথা আজো বেশ মনে পড়ছে। কি অস্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি দেখেছি সেকালের কবিয়ালদের! সংগে সংগে কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলেছে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে। কখনো চলেছে কেচ্ছা এবং পাল্টা কেচ্ছার তুফান আবার কখনো বা চলেছে ধর্মালোচনা। তার প্রায় সবটাই ছিল আমার উপলব্ধির বাইরে। তবু নেহাৎ হুজুগে মেতে এবং কবিয়ালদের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি কবিগান শুনে। বড় হয়েও কবিগান শুনেছি নতুন নতুন দলের। সে সব গান বুঝেছি, তার অন্তর্নিহিত কথা উপলব্ধি করেছি। সখী-সংবাদের একটি গানের কয়েকটি পদ এখনো ভুলতে পারিনি। শ্যামের আগমন প্রতীক্ষায় সেজেগুজে প্রায় সারা রাতই কাটিয়ে দিলেন বিনোদিনী রাধা। কৃষ্ণ যখন এলেন শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে তখনকার পরিবেশ এবং তার প্রতিক্রিয়া কী নিখুঁত ভাবেই না বর্ণনা করেছেন পূর্ব বাংলার কবিয়াল! দুইদলের বাদ-প্রতিবাদ ও হাস্যপরিহাস চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু যখনি আরম্ভ হয়েছে তত্ত্বকথা বা অবতারণা করা হয়েছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তখনই সমগ্র জনতা হয়ে গেছে একেবারে নীরব নিথর। কবি গেয়েছেন—

শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখিগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতা জল আশায়
কুঞ্জ সাজায় তেমনি কমলিনী॥
সাজাল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হলো বিপরীত।
ফুলের শয্যা সব বিফল হলো, অসময়ে চিকণ কালা এল—
ব্রজদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে।

এর পরেই সংগে সংগে সুরু হয়েছে ধুয়া—

ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর
আছে ঘুমাইয়ে।
ও ফিরে যাও শ্যাম তোমার [illegible]।

এমনি ভাবায় কৃষ্ণকে সতর্ক করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি কবি। পরচিতেনে তিনি সখীমুখে শ্যামকে আরো কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে তরুণী হত্যার দায়ে ফেলারও ভয় দেখিয়েছেন তিনি। বলেছেন শ্যামসুন্দরকে—

ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে।

বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি শেষে এলে রসময়।

বঁধু, প্রেমের অমন ধর্ম নয়।

তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যেজন দীক্ষে

এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুই-এর মন কি রক্ষা হয়।

প্যারী ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না,

এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে॥

চাঁদোয়ার নীচে গাঁয়ের মাটিতে বসে এমনি সব কবিগান আর হয়তো শোনবার সুযোগ হবে না।

'চৈত্র-সংক্রান্তি'র আগের দিন হরগৌরী নৃত্য ও তার সংগে নানাপ্রকার নাচ-গান হতো। যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম—ওদের মতো আমরাও সঙ্ সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম—পয়সা সংগ্রহ করতাম। আর তার সদ্ব্যবহার করতাম চড়ক-পূজোর মেলায়। এ উপলক্ষে 'চন্দ্রপিকারা'র মেলা কতো নামকরাই না ছিল—দূর দূর গ্রাম থেকে কতো লোকই না আসতো এ মেলায়।

প্রখর গ্রীষ্মের ভীষণতা অসহ্য মনে হতো। কিন্তু বর্ষাকালে আমাদের গাঁয়ের চেহারাই যেতো পাল্টে। সমস্ত মাঠ, ঘাট, ক্ষেত-খামার জলে থৈ থৈ করতে থাকে বর্ষায়। দূর গাঁয়ের জলেঘেরা পাড়গুলোকে ছোট ছোট দ্বীপ বলে ভুল হতো। পায়েচলা পথ প্রায় সবটাই হয়ে যেতো অদৃশ্য। নৌকোই যাতায়াতের একমাত্র বাহন। ধান আর পাটগাছের সবুজ মাথার ওপর দিয়ে যখন মেঠো হাওয়া হু হু করে বয়ে যায়, সান্ধ্য পরিবেশে কী মনোরমই না লাগতো সে দৃশ্য! বিকেলে নৌকো করে রোজ বেড়াতে যেতাম আমরা সে পরিবেশ, সে দৃশ্য উপভোগ করতে।...

মনসা ভাসান উপলক্ষে শুকাচ্যা খালের একপ্রান্তে হরিরমঠ সংলগ্ন বিরাট জলা-ভূমিতে 'নৌকোবাইচ' ও মেলা বসতো। ছোট বড় সব ধরণের নৌকোই এ

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো সুসজ্জিত হয়ে। মাঝি ও দাড়িরা তালে তালে বৈঠা ফেলতো—লোকসংগীতের ঝড় বইতো সংগে সংগে। নৌকোয় নৌকোয় ভাসমান মেলাই যেন এক একটি বসে যেতো। তাদের কোনটাতে থাকতো নানা পণ্যসম্ভার, কোনটাতে ক্রেতা, কোনটাতে বা দর্শক।

কার্তিক অগ্রহায়ন মাসের দিকে জলে যখন টান ধরতো, তখনকার প্রধান আকর্ষণ ছিল মাছ ধরা। জল কমে আসায় তখন পুকুর, ডোবা, নালায় এসে আশ্রয় নিতো মাঠের মাছগুলো। ছিপ, পলুই বা জাল ফেলে মাছ ধরার তখন মহা ধুম পড়ে যেতো চারদিকে। জীবন্ত পুঁটি 'খোটে, খোটে' উঠতো বরশিতে। বড় বড় শোল আর গজার মাছ ধরারই বা কী আনন্দ! টোপগেলার সংগে সংগেই দৌড়ে গিয়ে ছিপ টেনে মাছ তুলতে সে কী ছুটাছুটি! একটু দেরি হলে শিকার হাতছাড়া হবার খুবই সম্ভাবনা। 'মৎস্য ধরিব খাইব সুখে'—কথাটা পূববাংলার এ নীচু জলাভূমির ক্ষেত্রেই বুঝি বেশি খাটে!

আমাদের ছেড়ে আসা গ্রামের এমনি কতো কথা—এমনি কতো স্মৃতি আজ চোখের সামনে এসে ভিড় করে—মানসপটে দেখা দেয় পল্লীমায়ের এমনি কতো স্নেহস্নিগ্ধরূপ। জীবনের এতোগুলো বছর যার স্নেহক্রোড়ে কেটে গেছে হাসি-কান্না রঙ-তামাসার মধ্য দিয়ে তার কোলে ফিরে যেতে আবার যে সাধ যায়—ইচ্ছে হয় পরম পীঠস্থান আমার গাঁয়ের জন্মভূমিকে আবার আপনার করে ফিরে পেতে! সে কামনা কবে পূর্ণ হবে?

জটাখোলা

রাজনীতি কীর্তিনাশা পদ্মার ওপরেও টেক্কা দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে! পদ্মা এক পার ভেঙে অন্য পারে সমৃদ্ধির প্রাসাদ তোলে, কিন্তু ভেজাল রাজনীতি বড়ো নির্মম! পিতৃভূমি ত্যাগ করে আজ কতো নিরাশ্রয় মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দুঃখ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার উপলব্ধি অধিকাংশ মানুষের মনকে স্পর্শও করছে না! সমস্ত জীবন সুখে কাটিয়ে শেষ জীবনে যাঁরা দুটি ভাত কাপড় আর একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে হন্যে হয়ে মানসম্মান হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদের অবস্থার কথা ক'জন ভাবছেন দরদ দিয়ে? স্বাধীনতার জন্যে জীবন বিপন্ন করেছি—আমাদের ভয়ে একদিন বিদেশী শক্তিও ভীত হয়েছিল, কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধ সেই ঐতিহ্যটুকু হরণ করে সর্বদিক থেকে যেন সমস্ত বাঙালী জাতিকে হীন করে তুলেছে! বাংলার মানুষ আত্মীয়বোধে জীবন দিতে পারে, কিন্তু আজ হীন স্বার্থ বড়ো হয়ে উঠে মানুষের মানবতাবোধকেও যেন বিপর্যস্ত করতে বসেছে। আমাদের এই যে অপমৃত্যু এর জন্যে দায়ী কে? জাতীয় ঐতিহ্য বিসর্জন দেওয়া আর আত্মহত্যা করা দুইই যে সমান কথা।

পদ্মার কুলুকুলুধ্বনি একদিন মনে যে আমেজ আনতো আজ আর গংগার কূলে বসে সে অনুভূতি যেন পাই নে। আমাদের অবস্থা যেন সেই ছড়া বর্ণিত 'এপার গংগা ওপার গংগা মধ্যিখানে চর' গোছের। দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করে করে অবস্থা হয়েছে জাওউইসের মতো করুণ! গ্রামের মানুষ আমরা শহর-জীবনে অভ্যস্ত নই। তাই পদে পদে কলকাতায় পায়রা-খুপি অস্বাস্থ্যকর ঘর নামধের বস্তীজীবন আমাদের শ্বাসরোধ করে তুলছে দিন দিন। এই দ্বীপান্তর থেকে কবে মুক্তি পাবো তা ঈশ্বরই জানেন। ছেড়ে আসা গ্রামকে আজ তাই

বেশি করে মনে পড়ছে। খুঁটিনাটি জীবনকথা চোখের সামনে ভেসে উঠে মনকে উদাস করে তুলছে বার বার। মুক্ত জীবন, মুক্ত বাতাস থেকে উপড়ে নিয়ে এই যে ইটকাঠ ঘেরা কারাগারে আমাদের জোর করে বন্দী করে রাখা হয়েছে একে কি স্বাধীনতা আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করা মৃতপ্রায় মানুষের পক্ষে সম্ভব?

পদ্মার উত্তাল তরংগ কূল ছাপিয়ে তীরবর্তীদের ভিজিয়ে দিতো, আর সেই ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে চলতো গাঁয়ের কতো রকমের নৌকো। কোন কোনটার বুকে আঁকা থাকতো ছোট ছোট লাল তারকা। গাঁয়ের ছেলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে, বাঁকে বাঁকে, ডিঙি নৌকোয় মাছ ধরতো; কৈবর্তরা ঘাটে ঘাটে তাদের ডিঙি ভিড়িয়ে সেই মাছ কিনে নিতো। গ্রাম ছেড়ে সে মাছ চলে যেতো দূরে—কতো দূরে—কলকাতায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে নাগাদ পদ্মার বুকে চলতো হাজার হাজার নৌকোর আনাগোনা—দেশী বিদেশী ছোট ছোট ডিঙির মাঝখান দিয়ে পাল তুলে চলতো বড়ো বড়ো হাজারমনী পাঁচশমনী চালানী নৌকো—দূর থেকে মনে হতো ছোট ছোট পাতিহাসের দলে চলেছে যেন এক একটা বড়ো বড়ো রাজহংস।

নারায়ণগঞ্জ লাইনের স্টিমারগুলো গোয়ালন্দ বন্দর থেকে ছেড়ে এসে মাঝখানটায় কাঞ্চনপুরে ভিড়তো; সেখান থেকে স্টিমার ছাড়বার ভোঁ পদ্মার বাতাসে ভেসে ভেসে এসে পড়তো আমাদের স্টেশনঘাটে। সেই ধ্বনি ইলামোরার মাঠ পেরিয়ে, আইড়মাড়া বিলের ওপারেও শোনা যেতো ভিন্ গাঁয়ে। পাটগ্রাম, পাঠানকান্দি, হেমরাজপুর, বাহাদুরপুর—এপরগণার প্রায় সমস্ত লোকই জানতো—শহর কলকাতা থেকে গ্রামের প্রবাসী কুটুম্ব ঐ স্টিমারে আসছে। ভোরের সেই স্টিমারের ভোঁ, আর সন্ধ্যায় গোয়ালন্দগামী স্টিমারের বাঁশী, এ গাঁয়ের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের নরনারীর মনে জাগিয়ে তুলতো মিলনের আনন্দ, বিচ্ছেদের বেদনা। আজো সকাল সন্ধ্যায় শোনা যায় সেই স্টিমারের ভোঁ। কিন্তু স্টিমার ঘাটে নেই সে ভিড়—নেই আর সেই দোকান পাট। জেলেরা পালিয়েছে, নয়তো মরেছে না খেয়ে—কৈবর্তরা পালিয়ে এসেছে রাণাঘাটে, নয়তো নবদ্বীপে। এখনো কি নেই বিরাট বিরাট চালানী নৌকো তেমনি পাল তুলে

চলে? বড়ো বড়ো পান্‌সীগুলো নদীপারের যাত্রী নিয়ে আজো কি পদ্মার বুকে পাড়ি জমায়? ঘাটে ঘাটে গাঁয়ের মেয়েদের কচ্‌কচানি, ছেলেমেয়েদের জলে দাপাদাপি হয়তো ফুরিয়ে গেছে, শাঁখ বাজিয়ে ঘণ্টা পিটিয়ে গংগাপূজোরও হয়ে গেছে হয়তো অবসান!

ছত্রিশ জাতের গ্রাম ছিল আমাদের নটাখোলা। ব্রাহ্মণপাড়ার ভট্টাচার্যিদের বাড়িতে বাড়িতে ন্যায়ালংকার, বিদ্যালংকার, তর্কতীর্থ, কাব্যতীর্থদের টোলে ঢুকে ঢুকে দেখছি, টোলের প্রবাসী ছাত্ররা সুর করে পড়তো বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, তর্কশাস্ত্র, কাব্য, দর্শণ। গোঁসাই পাড়ায় গোস্বামিগণ শোনাতেন 'চৈতন্য চরিতামৃত'। আধুনিক গাঁয়ের একমাত্র মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছেলেরা ইংরেজির দুরূহ উচ্চারণ অভ্যাস করতো চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। তাদের বিজাতীয় বিকৃত উচ্চারণে চমকে চেয়ে থাক্‌তো কলসী কাঁখে পদ্মার ঘাটে গমনরত গাঁয়ের কুললক্ষ্মীরা। গাঁয়ের হাটা-পথে ধাবমান বলদজোড়াকে আপন মনে যেতে দিয়ে লাঙল কাঁধে করিমচাচা অথবা মহেন্দ্র বিশ্বাস সেই পড়ুয়াদের ইংরেজি বুলিতে হক্‌চকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তো,—ওরা হয়তো মনে করতো গুহ, বসু ও মজুমদার বাবুদের ছেলেরা তাদের গালাগাল দিচ্ছে। সেই ব্রাহ্মণপাড়ার কোল ঘেঁষেই মস্ত বড়ো দাসেরপাড়া। এ পাড়ায় থাকতো গাবর দাসেরা। এদের কাজ ছিল সম্পন্ন গৃহস্তবাড়ির কাজ করা—ভিটেয় মাটি তোলা, বাগান তৈরী করা, ধান মাড়াই করা ও ফায়ফরমাস খাটা। এতেই সুখে দুঃখে পঞ্চাশ যাট ঘর দাসের চল্‌তো অনাবিল জীবন সংগ্রাম।

দাসেদের পাড়া পেরিয়ে গেলেই সাহাদের বাড়ি ঘর। এরা সবাই ছিল সম্পন্ন, যেমন শ্রী ছিল ঘরদোরের তেমনি ফুটফুটে আঙিনা। অনেকেই তাঁদের করতো চালানী কারবার। সেই চালানীর পেঁয়াজ, রশুন, তিল, সরষে, খেজুরে গুড়, কলাই ছাঁদি-নৌকোয় ভরে গাঁয়ের মাঝিমাল্লারা 'গাজী পাঁচপীর বদর বদর' বলে পদ্মার বুকে ভাসিয়ে দিতো সপ্তডিঙা মধুকর। এমনি পাকা-মাঝি ছিল তারা যে, কোন দিন নৌকো ডুবে যায়নি তাদের, যদিও তারা সুন্দরবন পেরিয়ে এসেছে কলকাতায়, উজান ঠেলে গিয়েছে আসামের ধুবড়ী, তেজপুরে। কলকাতার পর

ওরা গিয়েছে পাটনায়, কানপুরে—ফিরে এসেছে। সরিষার তেল নিয়ে, বিহারী আখিগুড় নৌকো ভর্তি করে। আর আসাম থেকে ওরা এনেছে ধান আর ধান—কতো ধান! এই গাঁয়ের ঘাট থেকেই রপ্তানী হতো ঝিটকা বন্দরের প্রসিদ্ধ হাজারী গুড়, কিন্তু পরিমাণ ছিল বড়ো অল্প। আজকালকার ফিট্‌কারী মেশানো নকল হাজারী গুড় সে নয়। আসল হাজারী গুড় বেশি সাদা হয় না—তাতে পায়েস রান্না করলে দুধও জমে যায় না। কাঁচা রসের সুমিষ্ট গন্ধে পদ্মার ঘাট মিষ্টি হয়ে যেতো মাত্র দুএকমণ হাজারীগুড়ের সুগন্ধে। কোথায় লাগে তার কাছে ভীমনাগের সন্দেশ—কলকাতায় নলেন গুড়! যা খেয়েছি আজো যে তার আস্বাদ ভুলে যেতে পারছি না। হাজারী সেখ জন্মেছিল ক পুরুষ আগে জানি না, হাজারী নিজে কিন্তু ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় অমর হয়ে রয়েছে—থাক্‌বেও।

সাহাপাড়ার ডান পাশেই, পূবের দিকে আইড়মারার মাঠের কোল ঘেঁষে উত্তর দক্ষিণে ছিল তাঁতী পাড়া—মুসলমান কারিগর। মাঝখানটায় একটা মাত্র গেঁয়োপথের ব্যবধান—হিন্দু-মুসলমানের সীমান্তরেখা। দিবারাত্র শুনতাম খটাখট্‌ শব্দ। তাদের মাকু চালানোর আওয়াজ আইড়মারার বিল পেরিয়ে, পাঠানকান্দির গ্রাম ছাড়িয়ে শোনা যেতো ইছামতী নদীর কোলের বন্দরে—লেছড়াগঞ্জে। বন্দরের ব্যবসায়ীরা সেই তাঁতীদের কাপড়, শাড়ি, চাদর, গামছা বিকিয়ে দিতো ঘরে ঘরে। পঞ্চাশএর মন্বন্তর এলো—সেই তাঁতীকুল সুতোর অভাবে বেকার হয়ে গেল, না খেয়ে শুকিয়ে মরলো অনেকে। দুর্ভিক্ষের পরে এল মহামারী। গ্রাম উজাড় হয়ে যায়! আমি নিজে ধর্ণা দিলুম তৎকালীন চিকিৎসা মন্ত্রীর কাছে—ফল হলো না কিছু। সামান্য কজন কর্মী যতটা পারি করলাম। স্বাভাবিক ভাবেই মেরে, মরে ফুরিয়ে এলো সেই মহামারী। তাঁতীপাড়ার মাকুর আওয়াজ তখনো বন্ধ হয়নি। দেশ ভাগ হবার পূর্ব পর্যন্ত চলেছে কোন ক্রমে। তারপরে ধীরে ধীরে থেমে গেছে—সাতাশ ঘরের সাতঘর হয়তো টিকে আছে। তাঁত বেচে ফেলেছে—ক্ষেতখামারে নিড়ানি দিয়েছে তারা—নিড়ান ও ফুরিয়ে গেছে, এখন তারা নিকটের শহরের পথে

পথে হেঁটে বেড়ায়,—পাকিস্থানী কোঁদল শোনে—আর ভাবে, এ জীবনের আর কত বাকি!

চাষীরা ছিল দু জাতের। হিন্দুও ছিল, তবে মুসলমানই বেশি। তারা নির্দিষ্ট কোন পাড়ায় থাকতো না। যে কোন দিকে হিন্দুমুসলমানের ঘর পাশাপাশিই ছিল। ব্রাহ্মণ হলেও, আমাদের বাড়িটার ঠিক গা ঘেঁসে তিনদিকেই ছিল মুসলমান প্রতিবেশী—সবাই চাষী। জহিরুদ্দীন সেখের স্ত্রী আমাদের ছিলেন বড়ো-চাচী, বুধাই সেখের সুন্দরী স্ত্রীকে বলতাম 'ধলা-ভাবী'—গোপাল সেখের স্ত্রীকে তো ভাবী বলেই ডাকতাম—কারণ গোপাল আমার বাবাকে 'বাবাই' বলতো। আমার বাবা ডাঃ হৃদয় ভট্টাচার্যকে সারা পরগণার লোকেই চিনতো। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম পর্যায়ের পাশ করা ছাত্র ছিলেন তিনি, পাশকরা হৃদয় ডাক্তার। গোপাল একবার কলেরায় তাঁর চিকিৎসায় বেঁচে উঠে পিতৃদেবকে বাবা বলে ডেকে চিকিৎসার দক্ষিণা দেয়—সেই থেকে চিরদিনই ছিল সে আমাদের বড়ো ভাই। আমাদের সুখের দিনে বাব্‌ড়ি চুল ঝুলিয়ে লাঠি নিয়ে নাচতো আর দুঃখের দিনে—শোকে-সন্তাপে আমাদের উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে সবার সংগে সমানে কাঁদতো। ধমক খেয়ে বাগানের আমগাছ কেটে শ্মশান যাত্রার ব্যবস্থা করেও দিতো। মোল্লা পাড়ার মাজুদিদিকে আজো পারি না ভুলতে। আমার মাকে তিনিও মা বলেই ডাকতেন। রাত্রির আঁধারে বোরখা পরে, চাকরের হাতে লণ্ঠন দিয়ে চটিজুতো পায়ে তিনি সপ্তাহে প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি—তখনকার দিনে মেয়েদের জুতো পরার রেওয়াজ হয়নি। কাজেই মাজু দিদির ঐ অপরূপ মূর্তিটা চোখে বেশি করেই বাজতো। দিদির কাজ ছিল ভারি মজার। যতোরাজ্যের ভালো ভালো জিনিষ চাকরকে দিয়ে বয়ে নিয়ে এসে আমাদের সকল ভাইবোনকে, মা, দিদিকে সামনে বসে খাইয়ে, তবে তিনি যেতেন। কোন নতুন জিনিষ তার আগে আমাদের কেউ এনে দিতে পারতো না। দিদি ছিলেন নিঃসন্তান—আমাদের কোলে না নিতে পারলে তার ভাল লাগতো না। কতোদিন পণ্ডিত মশাইয়ের মার খাবার ভয়ে পালিয়ে গেছি মাজু দিদির বাড়িতে সেই পণ্ডিত জমির ওপারে। মাজুদিদির

কোলে বসে বসে কতো দিন মজা করে দুধভাত খেয়েছি বর্তমান কলা দিয়ে আর পুরানো খেজুরেগুড় মিশিয়ে। আমার ব্রাহ্মণত্ব তাতে ঘোচেনি। মা জানতেন, বাবাতো ছিলেন সাহেব। নিষেধের প্রাচীর সেই পুরানো দিনেও আমাদের ভ্রাতাভগ্নির সম্বন্ধটাকে ঘিরে ফেলতে পারেনি। এর সংগেই মনে পড়ে সেই ছোটবেলার শীতের দিনের কথা। গাছের তলায় সকালের রোদ্দুরটা আগে এসে পড়তো আমাদের বাড়িতে। সেইখানটায় ছেঁড়া চট বিছিয়ে ইস্কুলের পড়া তৈরী করতুম। এক এক ফাঁকে কেপু সেখের স্ত্রী 'চাচী' হাতছানি দিয়ে ডাকতেন। ছুটে গিয়ে কাঁঠাল পাতায় করে সদ্য তৈরী নতুন গুড়ের 'চাচি' নিয়ে মহা আনন্দে রোজ চাখতুম। পঞ্চাশের ধাক্কায়ও বেঁচে ছিলো চাচী, যদিও তাঁর তিনকুলে কেউ ছিল না। কিন্তু যেই আমরা দেশ ছেড়েছি চাচী আর বেঁচে থাকতে চাইলেন না। শুনেছি তাকে পদ্মার ভাঙাপারের ফাটলে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছে গাঁয়ের দয়ালু মুসলমানেরা, ছাফনকাফনের খরচা জোটেনি। এই কলকাতায় বসে কতোদিন ভেবেছি, ছুটে গিয়ে চাচীর সেই কবরখানা দেখে আসি, আর ফেলে আসি সেখানে তার দেশছাড়া এক জিম্মি-ছেলের কয়েক ফোঁটা অশ্রু। রাক্ষসী পদ্মা কি সে কবর এখনো রেখেছে?

গ্রামের একটাই ছিল প্রধান রাস্তা—প্রথমে লোকালবোর্ডের, পরে উন্নীত হোল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে। পদ্মাপার হতে মহকুমার সদর মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ষোলমাইল রাস্তা। সেই পথের পাশ ধরেই থাকতো কৈবর্ত্তরা। তারা ছিল প্রায় দুশ ঘর। মাছের চালানী কারবার করতো তারা। স্টিমার ঘাটে বরফ দিয়ে কলকাতায় এতো মাছ তারা পাঠাতো যে, স্টিমারকে কোন কোন দিন তারা দুঘণ্টাও আটকে রাখতো। এখন তারা আর বেশি কেউ নেই, দু এক ঘর হয়তো আছে। জেলেরা রাস্তার পারে মেলে দিতো কতো রকমের জাল—ইলিশ ধরা, চিংড়িমারা, নদী-বেড় দেওয়া। তারা সব দেশ ছেড়ে এসে নবদ্বীপের আশপাশে 'হা গৌরাংগ,' 'হা গৌরাংগ' করছে এখন। কুমোড়দের সংখ্যা খুব ছিলো না বটে, তবে দুটো বাড়িতে হাঁড়ি কলসী যা হতো তাতে গ্রামের তৈজস পত্রের অভাব মিটে তো

যেতোই, তারপর তারা নৌকো করে বাড়তি হাঁড়ি কলসী সুন্দরবনে বিকিয়ে দিয়ে নৌকোভর্তি ধান নিয়ে ফিরে আসতো ফি বছর। তারা পাট উঠিয়ে কোথায় গেছে জানিনা। এছাড় ছুতোরপাড়া, কামারপাড়া নিয়ে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম আর কোথাও গিয়ে পাবো কিনা সন্দেহ। অভাব হয়তো ছিল, তবে অভাবের বোধ ছিল না বলেই জিনিষের অপ্রতুলতার কথা শোনা যায়নি সে গাঁয়ে।

বারোমাসে তেরো পার্বন, আর তার ঘটাও ছিল তেমনি। দেখতে দেখতে কার্তিক মাস পড়ে যেতো। ধান ঘরে উঠেছে, পথঘাট কিছু শুকিয়েছে, লেগে গেলো বারোয়ারী কালীপূজোর ঘটা এ উপলক্ষে। ভদ্র পাড়ায় হতো কালীর আসরে যাত্রাগান, সখের থিয়েটার, কবিগান, জারীগান। হিন্দু মুসলমান চাঁদা দিয়ে, পান তামাক খেয়ে একত্রে গলাগলি করে রাতের পর রাত গান শুনতো—কবিদের গানের লড়াই, ছড়ার কসরত শুনে তারিফ করতো। মদন কবিওয়ালা, ছমির বয়াতী উভয়েরই ছিল গ্রামের মহলে মহলে সম্রাটের সম্মান। চৈত্রসংক্রান্তি, রথ ও দোলের মেলায় গ্রামে চলতো সস্তা বিপিনির বিকিকিনি, কতো ভিন্ন গাঁয়ের কতো জিনিষের হতো আমদানী! চারপয়সা, আটপয়সার পুতুল থেকে এক পয়সার বাঁশি পর্যন্ত কিনে আমরা কতো যে সুখি হয়েছি সে সুখ আর কি ফিরে পাবো? দশহরাতে নিজেদের দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে জেলেদের মাঝিদের বড়ো বড়ো ছান্দি-নৌকোয় বের হতুম আমরা। সাতখানি প্রতিমার সঙ্গে চৌদ্দজন ঢাকী বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে মরাগাংগের স্থিরজলে বেদনার মূর্ছনা বইয়ে দিতো। দু-পারের হিন্দু-মুসলমান গৃহবধূরা সজল চোখে বিদায় দিতো দেবী জগন্মাতাকে। বাইরের নৌকোতে ঘুরে ঘুরে খঞ্জনিতে তাল ঠুকে গাইতো মুসলমান বয়াতী বিদায়ের বিসর্জন গান। দশহরার পরের দিন সকল বাড়িতেই লেগে যেতো তাড়াহুড়ো। মাইলখানেক দূরে বাহাদুরপুরের ঘাটে যেতে হবে ইছামতী নদীর কিনারায়। ঐখানেই হতো নৌকো বাইচ—একশ হাতের, আশি হাতের লম্বা নৌকোর পাল্লা দিয়ে বেয়ে আসতো কতো শত শত নৌকো নীল, লাল, সবুজ নিশান উড়িয়ে। সব নৌকোই মুসলমান মাঝিদের—গলুইয়ের উপর বাবরি উড়িয়ে

কালো, পিতলের বাঁধান বৈঠা ঘুরিয়ে পঁচিশ বাট জন বাইছ খেলোয়াড়কে সমান তালে, সমান জোরে জল টেনে চলতে তারা সংকেত করতো। এ যেন মহাযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির ইংগিতে যুদ্ধ করে চলেছে সৈন্যদল—সেনাপতি অলক্ষ্যে নন,—পুরো ভাগে। প্রতিযোগিতা চলতো দেশবিদেশের নৌকোয়, পাল্লা দিতো গ্রামে গ্রামে, মহকুমা মানিকগঞ্জের পরগণায় পরগণায়। যে বছরে পাটের দাম যতো বেশি মিলতো, সেই বছরে ততো জোর পাল্লা। হারজিতের সমাধান কোনদিন দেখতে পেতুম না, কারণ কোথায় যে ঐ পাল্লা শেষ হতো, কতো মাইল দূরে, তা মাত্র ইছামতী নদীই বলতে পারতো। আমরা দেখতুম শুধু উল্কাবেগে ছুটে চলেছে এক এক জোড়া নৌকো। নয়তো দেখেছি, ধীরে ধীরে বেয়ে চলেছে একখানি বাইচের নৌকো—চার পাঁচজন বয়াতী গায়ক ঘুঙুর পরে নেচে নেচে খঞ্জনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে বরাতী গান—নিজেদের রচনা, বর্তমান যুগধারা ও অতীতের সুখ-দুঃখের ব্যাংগ প্রকাশ। দেশ ভাগ হবার পরে শেষ গান শুনেছি ছমির বয়াতীর কণ্ঠে বিষাদের সুরে—

'কলি যুগে জান্ বুঝি আর বাঁচে না—
কোথায় থ্যেক্যে তুফান আইল,
ঘর বাড়ি সব উড়াইয়্যা নিল,
মানুষজনে খাইত্যাছে আইজ কুত্তা শিয়ালে।'

সেই বরাতী সুরের বিদায় ক্রন্দন আজো কানে বাজে—কলকাতায় সুর-লয় সংযোগে আভিজাত্যমণ্ডিত যে সব ভাটিয়ালী গান আজ শুনছি, তার চাইতেও গভীর করে যে সেই বৈঠার তাল, খঞ্জনীর মূর্ছনা মনে প্রাণে দাগ কেটে রেখেছে। তেমনটি কি আর শুনবো? ছন্দহীন পংক্তিবিহীন সেই গেঁয়ো কবির মর্মভরা কবিতা, ইছামতীর জলেই কি চিরকালের মতো বিসর্জন দিয়ে এলাম?

পৌষমাস এসে পড়লো। এই সময়েই হতো আলীজান ফকিরাণীর দরগায় বছরের উৎসব। সারা মুলুকের হিন্দু-মুসলমান ছুটে যেতো ফকিরাণীর আশীর্বাদ, দোয়া নেবার জন্যে। তার দরগা ধুয়ে মুছে ধূয়ে দিতো, তার সর্বজনীন্ সিন্নির খিচুড়ি মাথায় করে নিয়ে যেতো হিন্দু মুসলমান সবাই। পংগু ফকিরাণী তার রুক্ষ জটাজালপূর্ণ মাথাটি নাচিয়ে নাচিয়ে একবার এর আবার ওর গলা জড়িয়ে

ধরে 'আল্লার জান্, বাঁচো' বলে ছুটতো এধার ওধার। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে এই গেঁয়ো 'তাপসী রাবেয়া'র আশীর্বাণী মাথায় করে কৃতার্থ হতো সবাই। মকিম সেখের কোলে চড়ে কতোবার গেছি সেই প্রসাদী সিন্নি খেতে। সেই ফকিরাণীও আজ নেই—সিন্নিও ফুরিয়ে গেছে। দরগা নাকি পদ্মার জলে অতলে তলিয়ে গেছে। ভোর হলেই এখনও কানদুটো শুনছে শেষরাতের আজানধ্বনি, উদ্ধব বৈরাগীর উদাসীয়া গান। চৈত্র মাসের কালীকাচ্ আর বুড়ো মোল্লার বহুরূপ এখনও যে চোখের সমুখে নেচে বেড়ায়! ঘোষালের যাত্রার আসরে ভীমের গদা এখনও যে বন্‌বন্ করে মনের চোখের সামনে ঘুরছে!

কলকাতায় পথে ঘাটে কতো রকমের পাগলই না দেখছি—তবু দিনু পাগলাকে ভুলতে পারি না। সেই দিনু সেখের মেয়েটাও মরে গেল—আগের বছর বৌ মরেছে তার কলেরায়, দিনু পাগল হয়ে গেল। ঘন কালো সুঠাম দেহে, এক ঝাঁকড়া কালো চুলে সে পরতো বেছে বেছে ধুতরো ফুল। সুদে ও তস্য সুদে তার ভিটেমাটি আগেই গ্রাস করেছিল মহাজনরা—তাই ছিল না তার কিছুই। কালী-তলায় পড়ে থাকতো রাতের বেলায়, দিনভর বসে থাকতো সে পদ্মার ঘাটে। বৌ-ঝিরা তার রক্তচক্ষু দেখে একটুও ভীত হতো না—আর দিনুর কড়া পাহারায় একটিও বাচ্চা জলে ডুবতে পারতো না। একটু বেকায়দায় গিয়েছে তো—দিনু ডাঙা থেকে লাফিয়ে পড়েছে—জল থেকে তুলেছে ডুবন্তকে। খিদের বেলায় একটা কলাপাতা নিয়ে যেমন খুশি ঢুকে পড়েছে যে কোন বাড়িতে—পেয়েছে পেটভরা ভাত। ফুর্তি করে খেয়ে 'আল্লাকালী', 'আল্লাকালী' বলে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেছে বাইরে, ত্রুচোখের পরপারে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যেতো তাকে চাষীর হাতের লাঙল কেড়ে নিয়ে সে চালাচ্ছে বলদ—'হেঁইও'—'হুট্'—। ততক্ষণে আইলের ওপর বসে চাষী ভাই একটু তামাক খেয়ে নিচ্ছে। সে আর কতোক্ষণ! একটু পরেই দিনু ছুটেছে পদ্মার তীরে।

সেই শান্ত পাগল দিনুই একবার ভীষণ কাণ্ড করে বসলো। শীতের মধ্য রাত্রি, হরি পোদ্দারের খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে জোর চেঁচাতে সুরু করলো—'ও পোদ্দার মোশাই—ভাহেন কত্তা, কী লাল ঘোড়া নাবাক্ দিছি!' যতো লোকজন

হৈ হুল্লোড় করে আগুন নেভায়, দিনু ততই নাচে বগল বাজিয়ে, কী সুকর্মই না সে করেছে! অগ্নি নির্বাপন হলো। তারপরে গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা বসে গেলেন বিচার করতে। পঞ্চায়েতী বিচার সভায় হিন্দু-মুসলমান দাসকৈবর্ত সকলেই থাকতেন। দিনুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন সে এমন কাজ করলো। সাফ উত্তর দেয়, দিনু—'জারা, বড়ো কড়া জারা (শীত)'। সেই বছর থেকে যেবারই বেশি শীত পড়েছে, গাঁয়ের লোকে চাঁদা করে দিনুর জন্যে শীতের কম্বল কিনে দিয়েছে, নয়তো জোগাড় করে দিয়েছে। দিনু আর শীতেও কাঁপে নি—লাল ঘোড়াও আর ছুটোয়নি। দিনু আর নেই। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখি সেই দিনু পাগলার মৃত্যু হয় নি। সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে দিনু পাগলার জন্ম হয়েছে—তারা ছুটিয়ে আসছে লাল ঘোড়া, এসে গেছে হিমালয়ের ছাদে তিব্বতে। এবার হরি পোদ্দারের দলের যে কী দশা হবে ভেবে পাইনে কিছু, তাদের রুখতে হলে যে কম্বলের দরকার, তা দেবে কে?

চৈত্র মাসের খরার দিনে দেখতুম গাঁয়ের চাষী ছেলেরা মাগনে বের হতো। ঝক্‌ঝকে একটা ঘটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে, কাঁধে আম্রপল্লব গরু তাড়াবার লাঠিতে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে ঘরে ঘরে সিন্নির চাল মেগে নিতো। বলতো 'এক-দিলের সিন্নির চাল দেন'। কোন্ আল্লাদেবতা যে এই 'একদিল' জানতুম না। এখন বুঝি একদিল্ মানে এক প্রাণ। এত বড়ো দেবতার কৃপা কুড়োতে হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের মধ্যে বিভেদ হতো না। সেই ভিক্ষালব্ধ চাল দিয়ে সম্মিলিত যে সিন্নি পতিতের ভিটেয় হতো—তাতে হিন্দু-মুসলমান সবাই যোগ দিয়ে বৃষ্টির কামনা করতো। মন্তর তন্তর কিছু ছিলো না। এক প্রাণের কামনার ফল ফলতো বই কি—হয় শীঘ্র, নয় বিলম্বে।

সেই ছেড়ে আসা অবিখ্যাত আমার গ্রাম! কলকাতার মিলের চিম্‌নী ভোরের বেলাতে ভোঁ করে ওঠে—ঘুমভাঙ্‌তেই শুনি; মনটা রোজই ছ্যাৎ করে ওঠে,। ওই গোয়ালন্দের স্টিমার কাঞ্চনপুরঘাট ছেড়ে এসেছে—যাবে নারাণগঞ্জে বাঁশি বাজাচ্ছে—ভোঁ ভোঁ।

সোনারং

খাওয়া পরা দেখছি হলো ভার,

মায়ের মুখ কেবল মনে পড়ে ;

তাদের কথা বলচ কিবা আর,

দূর থেকেও সংগ নাহি ছাড়ে।

খাওয়া পরা সকল দিছি ছেড়ে,

ছেলেগুলোই সব নিলরে কেড়ে !

কতোকাল আগে কোন্ কবি এ গান গেয়ে গেছেন তার সঠিক সংবাদ না পেলেও তাঁর দুঃখের সংগে আমাদের দুঃখের মিল দেখে আশ্চর্যবোধ করছি। আজ আমরা জন্মভূমি ছাড়া হয়ে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেছি, আমরা মাকে ভুলতে চাইলেও তিনি চোখের সামনে উঠছেন ভেসে বার বার। স্মৃতিসংগ কিছুতেই মুক্তি দিচ্ছে না,—তাঁর দুরন্ত ছেলেগুলো তাঁকে কেড়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে ! মাকে ছেড়ে প্রবাসী হয়েছি, প্রবাসযাত্রার শেষ কবে হবে জানি না।

বার বার মনে পড়ছে আমার গ্রাম সোনারং-এর কথা। আশা নিরাশার স্মৃতি মনের মনিকোঠায় ভিড় করে রয়েছে জট বেঁধে,—মন হাঁপিয়ে উঠছে চারপাশের দেয়ালঘেরা শহুরে আবহাওয়ায়। এখানে মুক্তি নেই, উদারতা নেই, ছুটি নেই, ফাঁক নেই। আমার গাঁয়ের উন্মুক্ত প্রান্তরের উদার হাতছানি কোথায় পাবো শাণ বাঁধানো কলকাতার বুকে ? হৃদয়বীণার তারে মরচে ধরেছে—তাকে হয়তো আর সুরে বাঁধতে পারবো না ! সুর কেটে যাচ্ছে তাই বার বার। সুরহীন জীবন নিয়ে কি করবো ভগবান ? তুমি পথ নির্দেশ করো ভবিষ্যতের।

আমার গ্রামটির ইতিহাস শান্তির ইতিহাস। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সে গ্রাম মহান্। আজো সেখানে বৌদ্ধযুগের শান্তির ধ্বজা উড়তে দেখা যায়। সেখানে

রয়েছে বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ। গ্রামের কবি ৺হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মশায়ের কাছে শুনেছি সেই আলো ঝলমল তথাগতের শান্তির ললিতবানীর মনোরম গল্প। আজো বর্ষার দিনে যেখানে বাঁকাজল খেলা করে তার তলায় বিশ্রাম করে তথাগতের সারিবদ্ধ সোনার দেউল। জন্মভূমি পক্ষবিস্তার করে রক্ষা করছেন বিস্মৃত ইতিহাসকে। ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্যেই চীন-জাপান পর্যন্ত ভারতকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর শান্তির বাণীকে বর্বর মানুষ আর ব্যর্থ পরিহাস করতে পারবে না—সলিলসমাধি সৌধরেখা আজ জলরেখায় গেছে মিশে! মনে পড়ে প্রথম যেবার ঢাকা শহরে ক্ষুদ্র মিউজিয়ামটি দেখতে যাই, সেবার প্রথমেই দেখতে পাই স্বচ্ছ স্তূপের ওপর ভগবান বুদ্ধের শুভ্রমূর্তিটি। আপনা আপনিই সেদিন তাঁর পায়ে আমার মাথা পড়েছিল লুটিয়ে। সেখানে দাঁড়াতেই কানে বেজে উঠেছিল কবিরাজ গোস্বামীর গানটি—

“উপজিল প্রেমবন্যা, চৌদিকে বাঢ়য়।
জীবজন্তু কীট আদি সকলে ডুবায়॥”

বুদ্ধের অনন্তমাধুরীপূর্ণ প্রেম ও দয়ার অমৃতমন্ত্র পুণ্যবতী বাংলা মাকে তো বাঁচাতে পারলো না? বর্ষার স্ফীতবক্ষা পূতসলিলা জাহ্নবীধারার মতো হিংসা-দ্বেষকে তো প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না মানুষ! হৃদয়-আত্মা বাসনাহীন নির্লোভ হয়ে চিদাকাশে বেলুনের মতো অদৃশ্য হতে পারে না কি? কেন আজ আমাদের পদে পদে পরাজয়ের গ্লানি? সংসারী মানুষ ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে আর কত নীচে নামবে? শাক্যসিংহের মতো আজ আমাদের কে বলবেন: “সকলই জ্বালাময়। কিসের অগ্নিতে জ্বলিতেছ? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,—ক্রোধের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ,—মোহের শিখায় দগ্ধ হইতেছ!”

সেদিন বুদ্ধমূর্তির সামনে একটি ফলক দেখে চমকে উঠেছিলাম,—মূর্তিটি আমার গ্রামের একটি পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গেছে। জানিনা সেই সদা-হাস্যময় বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি আজো ঢাকার যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে কি না! যাঁর চরণতলে একদিন কোটি কোটি মানুষ নিয়েছিল শান্তির পাঠ আজ তিনিই শান্তিতে আছেন কিনা ভাবতে হচ্ছে! সর্বদেশে সর্বকালেই দেশের বুকে জগাই

সাধাই মাথা নাড়া দিয়েছে,—কিন্তু এরা কি শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝতে পারবে? পারবে তো আবার সবাইকে বুকে টেনে নিতে? আমাদের আশা ব্যর্থ হবে কিনা জানি না, কিন্তু সেই সুদিনের প্রতীক্ষাই করছি সব সময়।

স্টিমার ঘাটে নামতেই শরীরে জাগতো কেমন অনির্বচনীয় একটা রোমাঞ্চ, সোনালী স্বপ্নের আবেশে মন হয়ে উঠতো আবেশময়, সেখান থেকেই পেতাম সোনারং-এর পরশ। মাঝিদের আহ্বানে চমক ভাঙতো হঠাৎ। কানে এসে বাজতো—'আহেন্ কর্তা আমার নায় আহেন্, যাইবেন কৈ?' দরদস্তুর বা কথাবার্তার মধ্যে না গিয়ে শুভ্র-শ্মশ্রু বৃদ্ধ মাঝির নৌকোয় গিয়ে উঠে পড়তাম বাক্স-বিছানা নিয়ে। আমার নির্লিপ্তভাব দেখে মাঝি কি বুঝতো জানিনা, তবে আশ্বাস দিয়ে বলতো: 'আমিই যামু কর্তা, ভারা যা অয়্ দিয়েন অনে!' নৌকোয় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসার পর প্রশ্ন করতাম—'সোনারং চিন?' হাসতে হাসতে সে জবাব দিতো—'হোনারংও চিনি না? কন্ কি কর্তা, হেই দিনও আইলাম্ আপনেগ গেরাম থিকা।' সুতরাং আর চিন্তা কি? পাটাতনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি নিশ্চিন্ত আরামে! নৌকো ছাড়া অন্য যান কিছু নেই গ্রামে যাওয়ার। গ্রাম পত্তন যিনি করেছিলেন তিনিও এসেছিলেন এই নৌকো করেই মনের খুশিতে গান গাইতে গাইতে! বেতবন আরহিজলের জংগলের বুক চিরে নৌকো ঠিকই পথ চিনে বার বার এসেছে গেছে যাত্রী বুকে নিয়ে। আজ ভাবি সে জংগলে যে শয়তান লুকিয়ে ছিল তা কারো নজরেই পড়ে নি!

নৌকো ভ্রমণ চুপচাপে হয় না,—পেঁচার মতো মুখ করে আর যাই করা যাক নৌকোতে বেড়ানো যায় না! তাই মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে মাঝির সংগে আলাপে রত হতাম। আলাপ জমাতে মাঝিদের কেউ বলে চাচা কেউ বলে মামু। আমি মামু বলেই গল্প আরম্ভ করতাম। পেটে তখন পদ্মার বাতাস ক্ষুধার উদ্রেক করেছে, তাই আমার প্রথম কথা ছিল সেদিন: 'মামু খুদাতো বড় লাগছে, বাজার টাজার আছে নাকি সামনে?' আন্তরিকতায় মাঝির মুখও দেখেছি সেদিন ব্যাথাতুর হয়ে উঠেছে। আমার ক্ষিধে তার বুকেও এনেছে ব্যথার পরশ,—ম্লান হয়ে সে জবাব দিয়েছে: 'আগে কইলেন না ক্যান্, এই তো দিগিরপারের

আটটা ছারাইয়া আইলাম। আইচ্ছা, সামনে পুরার বাজার আছে, চিড়া-মুড়ি কিন্না দিমু আনে।' কী সহানুভূতি, কতো দরদ পেয়েছি সেদিন। মাঝিকে নিজের পরিবারের লোক বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু আজ? কোথায় গেল সে সরল-সহজ মানুষ? প্রাণভরা, দরদভরা, সহানুভূতি দিয়ে যারা মানুষকে বুঝতো তারা কি চিরবিদায় হয়েছে এই কলুষ-পংকিল পৃথিবী থেকে? না চক্রান্তকারীদের ভয়ে ভয়ে মুখ তারা খুলতে দ্বিধাবোধ করছে? সৌন্দর্যের মৃত্যু হওয়া দেশের পক্ষে চরম লোকসানের কথা—সেই অশুভ দিন কেন নেমে এল কালো পাখা মেলে এই বাংলার ওপর?

সেদিন মাঝির সংগে ভাগ করে চিড়ে-মুড়ির পর খালের জল খেয়ে যে কতো আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় বলা যায় না। পদ্মার বাতাস, পদ্মার জল সেদিন কাছে টেনে নিয়ে ভাই-ভাই-এর একপ্রাণতা একতার সূত্রে বেঁধে দিয়েছিলো,—আজো সেই পদ্মা আছে, কিন্তু সে তো আজ চুপচাপ সাক্ষীর মত ভ্রাতৃবিরোধ দেখে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে পারে কি সে আমাদের সকলের হাত এক করে দিতে? পদ্মার জলের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের চোখের জল! কীর্তিনাশা বলে তার বদনাম আছে, কিন্তু তার কীর্তিকথার খোঁজ আমরা কজন রাখি? মানুষ কি তার চেয়েও বেশি কীর্তিনাশ করেনি? মানবতাবোধের সংহার কে করেছে? মানুষ না পদ্মা? আজো ঘুমের মধ্যে পদ্মার ঢেউ বুকের ভিতর আছাড় খেয়ে পড়ে সমস্ত অভিমান নিয়ে! সে ঢেউ কি আর কারো বুকে লাগে না?

এক একটি ভাব মানুষের মনে এক একরকম প্রেরণা জোগায়! তা না হলে যে পদ্মা রবীন্দ্রনাথের মনে কাব্যের প্লাবন এনেছিল সে পদ্মাই কি করে মারণ-মন্ত্রের প্রেরণা দিল? কবিতার প্রেরণা ও লুণ্ঠনের প্রেরণা কি একই উৎসকেন্দ্র থেকেই উঠছে না? পরস্পর বিরোধী এভাব কেন জাগে হৃদয়তন্ত্রীতে? সুকুমার বৃত্তির চির উচ্ছেদ হতে পারে না মানুষের মন থেকে। সাময়িক ক্ষিপ্ততার শেষ হবেই হবে।

শহরে সন্ধ্যায় চিমনীর ধোঁয়া দেখলে আমার সেই মাঝির তামাক খাওয়ার কথা মনে পড়ে। হুঁকোকে সাজিয়ে ধূম্রকুণ্ডলীর যে আবর্ত সেদিন তারা সৃষ্টি

করেছিল তার থেকেই বোধ হয় আরব্য উপন্যাসের দৈত্যটা প্রবেশ করেছে তাদের মনে! এ দৈত্যের সংহার মন্ত্র কি? তাকে আবার কি বোতলে ঢোকাতে পারা যাবে না?

দুহাতে বৈঠা মারতে মারতে নৌকো যেতো এগিয়ে। ছোট খালের দুধারে কতো রকমের গাছ। যোগীর জটাজালের মতো মাটির ওপর দিয়ে শিকড়গুলো এসে নেমেছে খালের জল ঘেঁষে। সেই বিরাট গাছের ধ্যানরত স্তব্ধতা, অনন্ত নীলিমার দিকে চেয়ে থাকার ছবি আজো ভুলতে পারছি না। তাদের ধ্যান বোধ হয় আজো ভাঙেনি,—তারা শান্তিতে থাকুক, মনে গৈরিক ধূসর বৈষ্ণবতা এনে মানুষকে আবার স্বচ্ছল করুক এই প্রার্থনাই করি দূরে বসে।

মাঝে মাঝে বেতের ঝোঁপ। বিক্রমপুর আছে অথচ বেতবন নেই এ কল্পনাই করা যায় না! ঘন জংগল সৃষ্টি করে কতো রকমারি পশু-পাখিকে আশ্রয় দিয়েছে এই বেতঝাড়। এই খালের বুক থেকেই ভোরের কাকলি ওঠে প্রথম। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর পিংগল ডাক ওঠে এখান থেকেই, এখান থেকেই নিশুতি রাত্রে ককিয়ে ওঠে বক-শিশুরা! জংগলের সংগে যোগ দিয়েছে কচুরিপানার বংশ। বিক্রমপুরের শ্বাসরোধ করার চক্রান্ত এরা কোথা থেকে পেলো? বিক্রমপুরের সংগে সংগে সমস্ত পূব বাংলার লোকের শ্বাসরোধ কি এই রক্তবীজের বংশধরেরাই করেছে?

খালের ঘাটে গৃহস্থ বধূরা জল নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কটাক্ষে দেখে নিত্যো হাট ফিরতি নৌকোর আরোহীদের। তাদের মুখে খুঁজে পেতাম যেন রাঙা বৌদি, মণিদি, মনোপিসির মুখের আদল! প্রবাসী মন থেকে উৎপাটিত হয়ে তারা নানান্ দিকে পড়েছে ছড়িয়ে, জানি না তারা আজকে কোথায়। জানি না তাদের কজনই বা নির্বিঘ্নে চলে আসতে পেরেছে সম্মান বজায় রেখে। দিকে দিকে মেয়েদের অসম্মান—তাদের আর্তরবে মা বসুন্ধরার কি ঘুম ভাঙবে না? নারীর লজ্জা কি নারী চোখ মেলে দেখেই যাবে শুধু? দ্বিধা হয়ে, সংকুচিত হয়ে আর কতোদিন ভারতবর্ষ থাকবে? নারীর সম্মানের জন্যে আগে মানুষ কেমন উত্তেজিত হতো, নারীরা আসন পেতো সবার ঊর্ধে। নারীর অসম্মান তখন

সমগ্র দেশের অসম্মান বলে বিবেচিত হতো, সেদিনের সে মনোভাব গেল কোথায়? হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান চিরদিনই নারীকে সম্মান দেখিয়েছে, অথচ আজ এ কি হলো? জাতি বিচারই কি নারী বিচারের মাপকাঠি হয়ে মনুষ্যত্ববোধের অধঃপতন ঘটাবে বাংলায়?

রাজ্যের ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসে যেতো। সে তন্দ্রা টুটতো বৃদ্ধ মাঝির সস্নেহে ডাকে—'উঠেন কর্তা টংগীবাড়ি আইয়া পড়ছি। টংগীবাড়ি এসে পড়েছি? তাহলে তো এসেই পড়েছি। মনে পড়ে যায় কতোদিন এখানে এসেছি হাট করতে; হাট সেরে অকারণ দাঁড়িয়ে থাকতাম ঐ পুলের ওপর। গ্রাম সম্পর্কে মতি কাকার মাল কাঁধে বয়ে পৌছে দিয়েছি তাঁর বাড়িতে কতোদিন। বাড়ি হাজির হয়ে মতি কাকা বাতাসা দিয়ে জল দিতেন আদর করে। তারপর হেসে বলতেন: আরে আদা শুকাইলেও ঝাল থাকেরে, তগ মতন বয়সে আমরা দুই মুনি আড়াই মুনি বোঝা লইয়া আইছি টংগীবাড়ির থন।' সেদিনের গল্পগুজবের মধ্যে মতি কাকা, মতি কাকীমার সহৃদয়তা আমাদের মুগ্ধ করতো। মুড়ি, বাতাসা, নারকেল নাড়ু আমাদের বারবার টেনে নিয়ে যেতো মতিকাকার বাড়ি! জানি না, ঝড় তাদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে আজ। যেখানেই হোক, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন! বেঁচে থাকলে দেখা হবেই একদিন না একদিন। দুঃখ লাগে ভেবে, যারা মুড়ি নাড়ু বিলি করেছে বে-হিসেবীভাবে আজ তারাই করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে খাবার জিনিষের দিকে! কপালের পরিহাস আর কাকে বলে জানিনা, কিন্তু নিজেদের দৃষ্টান্ত করে তার পরিচয় পাচ্ছি! সামান্য ডালভাতের জন্যে আজ আমাদের স্বার্থপরতা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি!

টংগীবাড়ির পর মনে পড়ছে মুন্সীবাড়ির কথা। নবাবী আমলে এই গ্রাম আটকে গিয়েছিল বিলাসের ফাঁসে। চরম মুন্সীয়ানা করে গেছে গ্রামবাসীরা। চিহ্নস্বরূপ আজও মঠ-মসজিদ দেখা যায় প্রচুর। মঠে শ্মশানেশ্বর শিব ও মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেই নবাবী আমল থেকে। মা কালী ছিলেন এ অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা। কতো দূর দূর গ্রাম থেকে লোক আসতো পূজো দিতে ধন্না দিয়ে

অভিষ্টসিদ্ধির জন্তে! দেখেছি মুসলমান ভাইয়েরাও হাত জোর করে মানত করে যেতো। কিছুদিন বাদে রোগমুক্তির পর জোড়া জোড়া পাঁটা নিয়ে আসতো দিকে দিকে আনন্দধ্বনি ছড়াতে ছড়াতে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এমনি কালী পূজো আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, কিন্তু মা কালীও কেন বিরূপ হলেন আমাদের ওপর? কেন ভিটে ছেড়ে নির্বাসিত হলাম, অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে হলো কোন্ পাপে! ছোটবেলায় এই মঠবাড়িই ছিল আমাদের আড্ডাখানা। কত দৌরাত্ম্যই না করেছি আম-কাঁটালের সময়। গভীররাত্রে খেজুরের রস চুরি করে জলভর্তি কলসীটি টাঙিয়ে রাখতাম ভালোমানুষের মতো!

বিজয়া দশমীর দিন কি মাতামাতিই না করতাম এই মঠের ঘাটে। ঢাক-ঢোলের বোলের সংগে চার ধূপতির আরতি দেখে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত হৈহুল্লোড় করে কাটাতাম। দুর্গাপূজো উপলক্ষ করে কোন বছর ছুটিতে বাড়ি যেতে না পারলে অস্থির হয়ে পড়তাম আগে। এখনো বছরে বছরে যথারীতি পূজো আসে, কিন্তু আমি বাড়ি যেতে পাই না। এ দুঃখের তুলনা দেবো কিসের সংগে? অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে চোখ দুটি পূর্ব সুখস্মৃতির কথা ভেবে। আজো সে মঠ আছে, তাকে নিশানা করে লোকেরা হয়তো চলাফেরাও করে, ভক্তিনম্রভাবে মা কালীকে প্রণামও হয়তো করে কেউ কেউ, কিন্তু সেদিনের সেই সুখী উজ্জল আবহাওয়া কি আর আছে মুন্সীবাড়িতে? একতা, সংঘবদ্ধতাকে নির্বাসন দিয়ে মানুষ আজ যে ভুল করলো তার উপলব্ধি কবে হবে কে জানে!

মঠের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আজ। বহু স্মরণিকা ভিড় করে আসছে—এই মঠই ছিল এ অঞ্চলে অগ্নিযুগের প্রেরণা কেন্দ্র। অনুশীলন পার্টির প্রধান অন্যতম কার্যালয়। পুলিশের অত্যাচার এ কেন্দ্রে ঘূর্ণিবায়ুর মতো নিষ্ঠুর গতিতে বয়ে গেছে এক সময়। সে বর্বতার কথা মনে করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গ্রামের দেশকর্মী ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে কতোরকম মর্মান্তিক অত্যাচারই না করেছে অমানুষ অশিক্ষিত মূঢ় সেদিনকার ইংরেজভৃত্যরা। তাদের ভয়ে তরুণ যুবকদের গ্রামে থাকাই হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। সেই সময় থেকেই নীরব ফল্গুর মতো কাজ হতো মঠে—মা কালী তার সাক্ষী। সেদিন বিদেশী শক্তির

বিপক্ষে মায়ের খড়্গ উঠেছিল ঝল্‌সে, মায়ের আশীর্বাণী পেয়েছে সব ভক্ত ছেলের দল। কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধের দিনে মা রইলেন নীরবে দাঁড়িয়ে, অথচ তাঁর আশীর্বাদের প্রয়োজন তখনি ছিল বেশি!

মনে পড়ছে এ গ্রামের কৃতী নারীপুরুষের কথা। এখানকার কেউ হয়েছে নাম করা অধ্যাপক, কেউ আই, সি.এস. কেউ স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ইয়োরোপ গেছেন। এই গাঁয়েরই একটি মেয়ে প্রেমচাদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সর্বপ্রথম। তবুও বলবো এঁরা গ্রামের মাটি থেকে বহুদিন থেকেই উৎপাটিত—প্রাণের যোগ তাঁদের নেই গ্রামের সংগে। তাঁরা মহীরূহ, সামান্যক্ষণের জন্যে বসা যায় তাঁদের ছায়ায়, কিন্তু আড্ডা জমাতে হলে যেতে হয় জেলেপাড়ার মহানন্দের বাড়ি, কিংবা প্রসন্ন মুদির দোকানে, না হয় বিশ্বম্ভর পালের হাঁড়ি গড়বার চাকের ধারে! তাদের সুখদুঃখই সারা গ্রামের সুখদুঃখ। তাদের প্রাণচাঞ্চল্য, তাদের আন্তরিকতা আজো নির্জন জীবনে রোমাঞ্চ জাগায়। মনে পড়ছে, সেবার অনাবৃষ্টি সম্বন্ধে আলাপ করতে করতে আমি বলেছিলাম যে, এবছর শীত যেমন দেরীতে এসেছে, বর্ষাও আসবে তেমনি দেরী করে। আমার কথা শুনে কালী ভুঁইমালী কারণস্বরূপ বলেছিল "পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় যায়" সেদিন সত্যিই লজ্জা পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, কতোকাল আগের গাণিতিক গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত খনার বচনকে যারা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অনুসরণ করছে তাদের ওপর পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়েছিলাম আমি! বাংলার লোকসংস্কৃতি তো এদের ভেতরেই ক্ষীণ হয়ে বেঁচে আছে আজ পর্যন্ত।

যে গ্রামে প্রতি মাসেই উৎসব থাকতো লেগে, সেখানে আজ মানুষ খুঁজে বের করতে হয় শুনলাম। বাড়িঘর হয়তো দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘন জংগল গজিয়েছে উঠোনে, আগাছা জন্মেছে দেয়ালে দেয়ালে। সেই তেঁতুলগাছটাও কি আছে? ঝাঁকড়া ঐ গাছের নীচে বসতো আমাদের আড্ডা। মনে পড়লে হু হু করে প্রাণ, আপনাআপনিই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রু। নির্বিঘ্ন জীবন কি আর আমরা ফিরে পাবো না, সেইদিনের মতো কি আর আমরা বরুণ পূজোতে মেতে উঠতে পারবো না ছেলে-বুড়ো মিলে? চৈত্র মাসে জলের জন্যে প্রার্থনা জানাতাম বরুণদেবের

কাছে। চৈত্রের খর রোদ্রের অবসানের জন্যে জলকাদা মেখে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতাম দল বেঁধে। মেঘের দেবতাকে খুশি করবার মন্ত্র আওড়াতাম—

'দেওয়ার মালো মেঘারাণী
খাড়া ধুইয়া ফালা পানি ॥
মেঘের উপর পুন্নিমার চান।
ঝপ্ ঝপাইয়া বিস্‌টি লাম ॥'

সেদিনের এই মন্ত্র ছিল যেন অব্যর্থ। পাগলা হাতির মাতন নিয়ে ছুটে আসতো মেঘ বৃষ্টি ঝড়। জীবন হতো শান্তিময়, নির্বিঘ্ন। আজকের মানুষের তাপিত প্রাণ কি ঠাণ্ডা হতে পারে না এই মন্ত্রে? আমাদের জীবনে কি নেমে আসতে পারে না আবার সেই আকাংখিত শান্তিবারি? শান্তিময়, স্বচ্ছল দিন কি চিরতরে ছেড়ে গেল আমাদের? আজ বর্ষা নামলে বেলে মাছ ধরার কোন উৎসাহই পাই না আর, অথচ একদিন রাতদুপুরে ছুটেছি ছিপ হাতে মৎস্য শিকারে! পদ্মা প্রমত্তা নদীর বুকে ডিঙি ভাসিয়ে গেছি মঠবাড়ির বড়ো খালে। খালে খালে জেগেছে জীবনের ছোঁয়াচ, মাঠে মাঠে বাধাহীন জলধারা যাচ্ছে ছুটে, সে ছবি আজো আমায় উতলা করছে! শ্মশানে প্রাণ বসন্ত দেখা দিক আবার, আবার ছুটিয়ে নিয়ে যাক আনন্দ নিজের গ্রামে, শান্তিবারি ঝরে পড়ুক প্রতিটি মানুষের মাথায়। ভয় থেকে অভয়ের মধ্যে নতুন করে জন্মলাভ করুক দেশবাসী। জড়তা থেকে নবীন জীবনে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করো ঈশ্বর! আর শুধু দিন যাপনের প্রাণ-ধারণের গ্লানি সহ্য হয় না—নিশিদিন রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাংকিত কালি জীবনের গায়ে কালি লেপন করছে, জীবন খণ্ড খণ্ড হচ্ছে দণ্ডে পলে ভাগ হয়ে! রবীন্দ্রনাথের মতো আজ আমি শুধু প্রার্থনা করি—

'শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।'

ময়মনসিংহ জেলা

নেত্রকোণা

বর্ষণের আর বিরাম নেই। গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে শুনি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, টিনের ছাদের ওপর ঝম্ ঝম্ জল ঝরছে। রাত সাড়ে আটটায় পথঘাট নিশুতি, কারো সাড়া শব্দ নেই। হ্যারিকেনের আলোয় খাটের কোণায় মা বসে উলের প্যাটার্ণ তুলছেন। বাড়ির পেছন দিয়ে অন্ধকার বৃষ্টিভরা রাতে সাড়ে আটটার ট্রেণ শিষ দিয়ে গেল। পাশেই কোর্ট ষ্টেশনে এক টুকরো কোলাহল জেগে আবার মিলিয়ে গেল। সেই বারিবর্ষণের কিন্তু তবু বিরতি নেই!

গারো পাহাড়ের তলায় আমার পাহাড়তলীর শহর, মগ্‌রা নদীর পাকে পাকে জড়ানো। সারা বছরে আট মাস তার বর্ষার সাথে মিতালি। যখন মগ্‌রায় ঢল নামে, মানুষের হাঁস ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি ভেসে আসে, দু একটা ছাগল গরুও আসে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ে, জলের ওপর ফুট্‌কি ওঠে। কালীবাড়ির ঘাটে জল তোলপাড় করে ঝাপাই সাঁতরাই। বাংলার উত্তর-পূর্বতম প্রান্তে লাল সুরকির পথে যেখানে দাঁড়ালে গারো পাহাড়ের নীলাঞ্জন রেখা সবুজ হয়ে দেখা দেয় সেইখানে পাখ-পাখালি আর ফলন্ত ফসলের দেশে আমার ছোট্ট মহকুমা শহর, নেত্রকোণা। মেঠো পথ ভেংগে পাহাড়ী আনারস, কমলানেবু, আর চাল নিয়ে যে গাঁয়ের মানুষেরা আসে শনি-মংগলের হাটে তারা বলে, কালিগঞ্জের শহর। নদীর ঘাটে পাটের বোঝা খালি করে দিয়ে রাত্রে নৌকোর মাঝিরা ভাটির দেশের গান গায়। অন্ধকারে জোনাকির তারার মতো ওদের কেরোসিনের পিদীম জ্বলে—ওরা বলে "কুপি।" নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওদের

'ব্যাপারী নাও'এর কাজ-কারবার কতো দেখেছি। ওরা আরো ভাটির দেশের গল্প শোনাতো, যেখানে আরো জল, আরো ধান আর 'উড়া-হাঁস'। রাত্রে সেই জলের মধ্যে 'জিনের বাতি' জ্বলে, তখন পীরের নাম স্মরণ করতে হয়, পাঁচ আনার সিন্নি মানতে হয়। না হলে ঐ জিনের 'ভুলা বাতি' ঘুরিয়ে মারে, চোখে দিশা লাগে। আমাদের এই দেশে বর্ষার প্রকোপটা কিছু যখন কমে, আকাশের বর্ষণ যখন থামে, আর মাঠে-ঘাটে যখন জল কলকল্ করে ছোটে তখন পাহাড় ডিঙিয়ে দূর দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস আকাশে ছায়া ফেলে আসে। গাঁয়ের মানুষ বলে, উড়া হাঁস।

তাই যদিও আমাদের ঐ শহরে তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে-ইস্কুল আছে, আদালত কাছারী আর দু-দুটো ছোট রেল ষ্টেশন আছে—যদিও মিটার গজ লাইনে দিনে দুবার আসা-যাওয়ার ট্রেণে মাছ আর পাট চালান যায়, তবু নেত্রকোণা শহর হয়ে উঠতে পারেনি।

চেষ্টার অন্ত ছিল না। কে, কে, সেনের মতো জবরদস্ত আই-সি-এস অনেক মহৎ উন্নয়ন আন্দোলন করলেন, কিন্তু নেত্রকোণার মানুষের গেঁয়োমি কাটলো না। মহকুমা হাকিম বৈদ্যনাথন যেদিন শহরের রাস্তায় প্রথম প্রচণ্ড লাল ধুলো উড়িয়ে মোটর চালালেন সেদিন বড়োদের আর বিরক্তির সীমা ছিল না। শহরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেদিন উকীল মহলে ঘোরতর দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছিল। অতঃপর এমনতর দুর্বিপাক আর শহরের ধার ঘেঁষতে পারেনি।

এখানকার মানুষের নিত্যদিন চর্চায় দশটা-পাঁচটার বন্ধন ছিল নগণ্য—তার ভারবাহী ছিল অসহায় ছাত্রকুল আর আমমোক্তার-মুহুরি-উকীল বাহিনী। আদালত আর ফৌজদারী এজলাসে দিন ছিল আপিসী ঢং-এ বাঁধা। আর কোন আপিস কাছারীর স্থান তখন নেত্রকোণায় ছিল না। যুদ্ধ-দেবতার সন্তান হিসেবে সাপ্লাই আর কণ্ট্রোল এবং আরো এবম্বিধ আপিস যখন পক্ষ বিস্তার করলো, সে অনেক পরের কথা। সেই নগণ্য সংখ্যকের বাইরে আমরা ছিলাম ভোর বেলা ফেন-ভাত-খাওয়া মানুষ, দ্বিপ্রহরের ভোজন পর্ব সমাধা করতে দেড়টার ট্রেণ এসে পড়তো, সুরু হতো সায়াহ্নের প্রারম্ভ কাল। আহার্যের প্রাচুর্যে যেমন অনটন

ছিল না, সময়ের বিস্তৃতিকে সুখদ আড্ডায় রসিয়ে তোলায়ও তেমনি কৃপণতার প্রয়োজন হয়নি। ছোট বেলায় ইস্কুল যাতায়াতের পথে দেখতাম তেরিবাজারের তেমাথায় অভয়দার চায়ের দোকানে বয়স্ক মহলের ভীড়। সাদা পিরীনে সোনালী পানীয় চা-এর সংগে আমাদের তখনও আলাপ হয়নি। সেখানে কখনো কখনো বৃষ্টি পড়তে আশ্রয় নিয়েছি, দেখতাম নুয়ে পড়া ঘরের আবছায়া কোণে এক দিকে কেৎলী ধূমায়মান, অন্যদিকে অভয়দার প্রশস্ত তক্তপোষে গুটি-সুটি বসে বারো-ইয়ারী আলাপে মত্ত বয়োজ্যেষ্ঠ দল। তাঁদের আলোচনার অর্থ বুঝতাম না। কিন্তু তখনই, নেত্রকোণার ছেলে আমরা, বুঝতে শিখেছি যে,এ-রসের তুলনা নেই। যে কহে আর যে শোনে সবাই পুণ্যবান। এঁরা কেউ অভয়দার কাঁথা টেনে, কেউ সিগারেট ধরিয়ে বসেছেন বর্ষার প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায়, নিম্নস্বর গুজব-আলাপনে। ঘর গুলজার। এই অভয়দার চায়ের দোকানের সামনে ছিল আমগাছ একটি, তাতে কদাপি ফল ধরেছে। আমের নামে না হোক্, আমতলা ছিল অন্য কারণে শহরের সকল জীবনের কেন্দ্রস্থল। এই অভয়দার ঘরের ভেতরে শীতের রাত্রি আর বর্ষায়, গ্রীষ্মে ও শরতে সম্মুখবর্তী আমতলায় বিশ্ব-রাজনীতি বিষয়ে ও ঘরোয়া-নীতি নিয়ে নানাতর আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী বয়সে আমরা আমতলা আর অভয়দার দোকানের উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। কিন্তু তারও পূর্বে আড্ডার অমৃত সুখ আমরা উপভোগ করেছি। কালীবাড়ির দোমাথার কাছে আমাদের বাড়ির পশ্চিমে রাস্তার পাশেই কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ছিল সুখলালের বাঁশের মাচা। আমরা বলতাম,—সুখলালের চাংগাড়ী। সেইখানে নিত্য সকালে আমাদেরও আসর জমতো, প্রথম প্রথম সুখলাল তাড়া করতো। অবশেষে সেখানে আমাদের অধিকার পাকা হলো। সামনের দোকানে পোদ্দার মশাই হাতুড়ি ঠুকতেন, তাঁর ঘর নদীর ঢালু পাড়ে কাত হয়ে পড়েছে। তাঁর ছেলে শ্রীমান রামু ছিল আমাদেরই সাঁকরেদ। কী যে কথার ভাণ্ডার ছিল জানিনে, কিন্তু ছুটির দিনে আমাদেরও সেই বেলা একটা। সেখানে খেলার মাঠের দল পাকানো, কাঁচা আম ও লিচু চুরির জল্পনা, সুধীর মজুমদারের গোঁফ, এমনকি যুগান্তরের দাদাদের সেই সব রোমাঞ্চকর আগ্নেয় অভিযানের বিষয়ও ছিল আলোচ্য বস্তুর তালিকায়। রাজ-

নীতি ক্ষেত্রে তখনই আমাদের মতো দশ বারো বৎসরের অবোধদের প্রবেশাধিকার মিলেছে। সুধীর মজুমদার মশাই হিজলী না কোন্ বক্সার জেল থেকে সাত আট বৎসরের সাধনায় বিরাট এবং সামরিক ধরণের একটা গোঁফ নিয়ে ফিরেছেন। তঁ'র নেতৃত্বের আর বাধা রইলো না। পাড়া জুড়ে সাড়া পড়লো। সাজ, সাজ, সাজ। তখন পর্যন্ত শ্বেতাংগ দর্শনের সৌভাগ্য প্রায় কারুরই হয়নি। কিন্তু হলে কি হবে, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র হঠাৎ কোথা থেকে একবার এসে পড়লেন, শহরে সে কি হৈ হৈ কাণ্ড! তখন জানা গেল শ্বেতাংগ নামক একদল রক্তপায়ী পশু সত্যই দেশে আছে। আমার কাকু এবং পাড়ার গণেশদা বিপ্লবীদের দু একটা সত্যি কাহিনী আমাদের শোনাতে সুরু করেছেন। কোথাও কোন অপরাধ করলে কিংবা লুকিয়ে পান খেলে অথবা তাস খেললে তাঁদের কাছে বকুনী ও উপদেশের সীমা থাকতো না। বাড়ির অভিভাবকেরাও তখন ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে পাড়ার দাদা তথা রাজনীতির দাদাদের কাছেই নালিশ জানাতেন। সব মিলে আমাদের ছোট শহরের তিনটি জিনিষ ঐ বয়সের প্রধান হয়ে উঠলো—আড্ডা, পাড়া ও রাজনীতি। পাড়ার দাদারা ছিলেন বাড়ির এবং রাজনীতি ক্ষেত্রের অভিভাবক। কিছুদিন পরে আরো আটদশজন দাদা কারাবন্ধন ঘুচিয়ে বেড়িয়ে এলেন—দেখতে দেখতে আমতলার আড্ডা গরম হয়ে উঠলো! আমাদের ইস্কুল যাওয়ার পথের পাশে তেরিবাজার ও মেছোয়াবাজারের মাঝামাঝি জায়গায় একটা কংগ্রেসের কার্যালয়ও জেঁকে উঠলো। কালীবাড়ির নাটমন্দিরে মেয়েদের একটা সভা ডেকে কি সব প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। সে সময়ে লাল সুরকির পথের পাশে একদিকে ছিল নদী, অন্যদিকে এক সারি বাড়ি, তার পেছনে ধানক্ষেত। আমাদের শহরটা একপ্রস্থ বাড়ি ছাড়িয়ে আর ঘনত্বে বাড়লো না, কেবলি বিস্তৃত হয়ে চলেছিল। এই বাড়িগুলোর পেছনদিকে ছিল আর একটা শানপাতা ছোট পথ, ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে। সে পথটা মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে অন্তঃপুরে গতায়তের যোগসূত্র। ধীরে ধীরে সে পথ ছেড়ে মহিলারা ক্রমশ বেরোলেন সামনের সদর রাস্তায়।

এতোকাল দেখেছি মেয়ে ইস্কুলের 'ঝি' এসে বেলা নয়টায় একবার রাস্তা দিয়ে হাঁক পেড়ে যেতো। তারপর খালি পা, ভেজা চুল, গাছকোমড়-শাড়ি একপাল

মেয়ে তাড়িয়ে সেই 'ঝি' তার ছাতা ও ছেঁড়া চটি টানতে টানতে মোক্তারপাড়ার দিকে পথ করতো। সেখানে দুইমানুষ উঁচু টিনের বেষ্টনী তুলে মেয়ে-ইস্কুল শুদ্ধ। আর তারই উল্টোদিকে দত্ত হাই-এর দিলদরিয়া খোলা মাঠে আমাদের দিনভর হৈ হৈ। বছরে একটি দিন সন্ধ্যেবেলায় সেই মেয়ে-ইস্কুলের টিনের দরজা খুলতো, ছেলেমেয়েতে মিলে সেদিন হতো রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব। দাদাদের কাছে শুনতাম, শান্তি নিকেতনের বাইরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব প্রথম হয়েছিল আমাদের এই পাণ্ডববর্জিত দেশে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে সব দিন সরে গেল। এখন ঝি ছাড়াই মেয়েরা চলেন, দু একটা বিদগ্ধ রাজনীতি আলোচনায় ও ওঁদের অঞ্চলের ছায়াপাত ঘটে। দিন কাটছিল বেশ। শহর জুড়ে রাজনীতি ছাড়া কথা নেই, দেখতে দেখতে আরো চায়ের দোকান বসলো তেরিবাজারের পাড়ায়। নদীর ঢালু পাড়ের ওপর তাদের ঝোলান বারান্দা, বর্ষায় জল এসে নীচে খেলা করে। যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের জন্যে বয়ঃক্রমে নির্দিষ্ট হলো চায়ের ঘর—তারও মধ্যে কংগ্রেস, আর-সি-পি-আই ও কম্যুনিষ্টদের চা-পান সভা পৃথক হলো। আমতলা থেকে সুরু করে নদীর ধারে ধারে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়লো রাজনৈতিক দলের আলাপন গৃহ। মাঝখানে অভয়দা আর মানিকের ঘরে চায়ের আড্ডা সর্বজনের। সকল দলের লোক সেখানে আসে। চেঁচিয়ে পাড়া গরম করে তারপর ধীরে সুস্থে নিজের নিজের চা-ঘাঁটির বিবরে গিয়ে ঢোকে। এই সব চায়ের দোকানে একটা কাল্পনিক বিদগ্ধতার ভাব ছিল প্রখর। বড়ো বড়ো লিখিয়েদের নাম শোনা যেতো প্রায়শই। তার মধ্যে বিদগ্ধতায় অগ্রণী তরুণ সভাগুলো, সেখানে যোশী-এম-এন-রায়দের উক্তি নিয়ে তর্কাপোষ ফাটে। ভাবী সংগ্রামের নীতি ও পথ এবং জার্মাণ জাতির রণবল ও ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ আলোচনায় কখনো কখনো হাতাহাতিরও যোগাড় হতো কসমোপলিটান ঘর অভয়দা ও মাণিকের দোকানে। তবে তার মধ্যে হঠাৎ হাল্কা হাওয়ার মতো সলিলদার হাসির কথা ছুটতো, বিমলদার রবীন্দ্রগীতির ভাণ্ডারও ছিল অফুরান। ঠাণ্ডা হতে সময় লাগতো না। এই ছোট শহরে যেমন আট বছরের ছেলেও দল করে, তেমনি কেউ আবার দলাদলিতে নেই। সমস্ত কিছুরই ওপরে আড্ডা আর হো হো করে দিন কাটিয়ে দেবার এমন একটা নেশা ছিল

যে, কারুরই নিষ্ঠা সহকারে ঝগড়া করার সময় মিলতো না। কম্যুনিষ্ট পার্টির যিনি প্রধান দাদা ছিলেন, তাঁর সংগে সংগে কংগ্রেসের ছেলেরাও ঝুলে থাকতো। কোন একটা অন্যায় আচরণের জন্যে আর-এস-পির ছেলেকে ডেকে ধমকে দিতেন কংগ্রেসের মুখ্য নেতা। আড্ডার ঘড়ি চলেছে সকাল আটটা থেকে বেলা একটা, তারপর কয়েক ঘণ্টার বিরতি দিয়ে আবার রাত সাড়ে আটটা অবধি। তারও পরে রাত্রির খাওয়া সেরে, বাছাই করা কয়েকটি দলনির্বিশেষে গোষ্ঠী আছে, তাদের আসর জমে নদীর পারে ঘাটলায় ঘাটলায়। কালীবাড়ির ঘাটে আমাদের আসন ছিল নির্দিষ্ট করা। শচীবাবুর বাড়িতে সান্ধ্যআসর জমতো সাহিত্য ও সংগীতে। সে বাড়ির মেয়েরা ছিলেন রুচিস্নাতা। কলেজ ছুটির অবসরে তাঁদের হতো দুষ্প্রাপ্য আবির্ভাব, কিন্তু তবু সুখলভ্য। অনেকদিন আমার পড়ার ঘরটিতে নির্বাচিতদের শুভাগমনে সন্ধ্যা জমে উঠতো, বারিবর্ষণ তাকে আরো নিবিড় করতো। হয়তো গানের সুর শুনে তেরিবাজারের আড্ডা শেষের দুএকজন গৃহমুখী পথ ছেড়ে আস্তে এসে আসন নিতো। বীরেন্দ্রকিশোরের পৃষ্ঠপোষিত উচ্চাংগের মিউজিক কনফারেন্স ও রবীন্দ্রজয়ন্তী একদিকে, অন্যদিকে রাজনীতি, অফুরন্ত সময় আর আড্ডা —এই গৌরবে গৌরবান্বিত নেত্রকোণা। এখানকার যুবকেরা বিদ্যার্জনের জন্যে যদি বা যায় বাইরে, বিদ্যা বিক্রয়ের জন্যে নয়। লোকে বলে সকালবেলার ফেনভাত আর আড্ডার টান,—যাক জগৎ উচ্ছন্নে! থাকুক শুধু এককলি গান, দুটি রাজনীতির কেতাব আর দুর্লভ অমৃতসুধা এক কাপ চা!

কিন্তু হঠাৎ একদিন ছেলেরা ইস্কুল যাবার পথ থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। দেখতে দেখতে চৌধুরী বাড়ি থেকে সাতপাই পেরিয়ে, উকীলপাড়া মালগুদাম ছাড়িয়ে একদিকে মোক্তারপাড়া অন্যদিকে নউল্যাপাড়া আর বড়ো পুকুরের পারগুলোতে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো আগুনের মতো। মালগুদামের কুলীরা এলো, আই-জি-এন কোম্পানীর মেয়ে পুরুষ পাটের মুটে, ইস্কুলের ছেলেরা বেরিয়ে পড়লো। মেয়েদের ইস্কুলের বেড়া সরে গেল। ঘরের মেয়েরা পেছনের শানপাতা রাস্তা ছেড়ে সদর রাস্তায় এলেন। অগ্নিশিখার মতো একটা চলমান জনতা এসে থামলো থানার বাইরে—ওদের ছাড়তেই হবে। বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন

স্থরু হলো নেত্রকোণা কাঁপিয়ে। কম্যুনিষ্ট দাদারা নামলেন না সংগ্রাম ক্ষেত্রে। তবু যে ঘরের গৃহস্বামীরা গিয়েছেন, সেই ঘরের দায়িত্ব আপনি এসে পড়লো তাঁদের ঘাড়ে। দেখতে দেখতে পাড়া খালি হয়ে গেল। আদালতের সামনের পিকেটিং পাতলা হলো, ১৪৪ ধারা ভংগকারী সব যুবা গেল কারাগারে।

এখন চায়ের দোকান ম্লান।

তারপর আবার নেত্রকোণার দিন এসেছিল। হাজংদের পদধ্বনি ভেসে এসেছিল গারো পাহাড়ের সানুদেশ থেকে। কিন্তু বিয়াল্লিশের পাঁচ বছর পর আবার প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে এলো পাহাড়তলীর শহর নেত্রকোণায়। নেত্রকোণার জীবনরস শুষে নিলো তারই আরাধ্য দেবতা—ব্যভিচারী রাজনীতি।

এখনো মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের স্বপ্ন দেখি, আকাশ আঁধার করা মেঘের ছায়া পড়ে মনে। এখনো ঢল নামে মগরায়। টিনের চালে শেষ রাতে শিশির ঝরে, কাঁঠালপাতা পড়ে টুপ্, টাপ্। এখনও এসব শুনি। অভয়দার দোকান, আমতলা—ধলার পুলের পাড়ে সূর্যাস্ত, শুদারার ঘাটে হাটুরে মানুষের ভীড়। এখনো এসব দেখি। মনের দিগন্তে তারা আছে, দেশের সীমান্তে তারা দূরে।

বিশ্যাফৈর

জননী আর জন্মভূমি—পৃথিবীর শেষপ্রান্তে বসেও মনে পড়ে, মন ভার হয়ে আসে, প্রাণ বলে যাই—যাই, আর একবার সেই ডোবার জলে ধ্যানী মাছরাঙার ঝাঁপ খাওয়া দেখে আসি।

বাংলাদেশের গ্রাম বলতে শুধু রামধনু রঙের আকাশ, বুনো ঘোড়ার মতো বর্বর বর্ষার নদী, মাঠ ভরা সবুজ ধানের ঢেউ বুঝায় না—সে কথা জানার মতো বয়স এখন হয়েছে। অনেক দুঃখ দেখেছি, অনেক কান্না দেখেছি, অনেক মৃত্যু দেখেছি। জানি সেখানে ম্যালেরিয়ার সময় ঠিকমতো কুইনিন মেলে না, সুযোগ বুঝলে মহাজনের গোলায় রাতারাতি চালের বস্তা কাবার হয়ে যায়, ডাকাত পড়লে লোক এগিয়ে আসে না, ভালো একটা ইস্কুল নেই, ঝড়ে ঘরের চালা উড়ে যায়, ঝাঁঝরা টিনের ফাঁক দিয়ে অবিরলধারে বর্ষার জল পড়ে। সবই জানি। মন্বন্তরে আশে-পাশের কতো বাড়ির ভিটে উজাড় হয়ে গেল। ভূতের ভয়েভরা ছেলেবেলা থেকে রোজ রাত্রিতেই ঘুম ভেঙে দুখীরাম দফাদারের বাজখাঁই গলার হাঁক শুনে বুক দুর্ দুর্ করে উঠেছে। হাতে টিম্‌টিম্ লণ্ঠন, সাপের মতো লিক্‌লিকে সড়কি, দুখীরাম হাঁক দিচ্ছে—'বাবু জাগেন ?' আজো যেন হঠাৎ এক এক রাত্রিতে সেই স্বর শুনতে পাই। গাঁজার টানে উর্ধনেত্র হয়ে সন্ধ্যায় গুম্ হয়ে বারান্দায় বসে থাকতো, সময়ে অসময়ে বৌটাকে ধরে বেধড়ক পেটাতো। নিঃস্ব নিরন্ন সেই ইস্পাতের মতো লোকটাকে পঞ্চাশ সালে সেবার খেঁকশেয়ালরা রাতারাতি টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললো। আর আমার মালিবৌ মোক্ষদা—অফুরন্ত রূপকথার মায়াপুরী যে খুলে দিয়েছিল—ভাঙা কুঁড়ের নীচে সেকেলে এক নড়বড়ে খাটের তলায় খিদের জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে তার প্রাণের ভোমরা চুপ করলো। তার গোছাভরা তাগাতাবিজ আর মন্ত্রের শক্তিতে বাঁধাপোষা ভূতের দল বাঁচাতে পারলো না তাকে। কলকাতা থেকে সেবার গ্রামে গেলাম। চিরকাল

যার বুকে পিঠে মানুষ হয়েছি, নিজে না খেয়ে কলাটা মূলোটা রেখে দিতো আমাদের জন্যে সরিয়ে সেই লোক আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে হাত ধরে কেঁদে ফেললো—'খোকন, বড়ো দুঃখ। পারিস তো চার আনার পয়সা আমাকে দিয়ে যা।'—এই সবই তো দেখেছি। তবু যেন আর একবার মন বলে—যাই—যাই—। ঝুমকো লতায় ঢাকা ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ধারে সেই শূন্য উঠোনের তুলসী তলায় গিয়ে দাঁড়াই একবার! জননী আর জন্মভূমি—তার চাইতে আপন করা প্রাণের জিনিষ স্বর্গে গেলেও পাবো না।

সেই দেশ চিরকালের মতো পর হয়ে গেল? মানচিত্রে একটা রেখার একটানে নিজের বাড়ি হয়ে গেল বিদেশ?—ভাবতেও পারি না। আমরা রাজ্য চাইনি, রাজত্ব চাইনি, সরকারী খেতাবের গৌরব চাইনি। শিশুকাল থেকে মুসলমান প্রজার দেওয়া সুখ-দুঃখের টাকায় আমরা মানুষ হয়েছি—কিন্তু মনে মনে লজ্জা পেয়েছি সেজন্যে। প্রাণের তে-পান্তরের খোঁজে মণ্ডল সাহেবের আরবি-ঘোড়ায় চড়ে মাঠের পথে উদ্দাম হয়ে ছুটে বেড়ানোর সুখ এ জীবনে আর কি কখনো হবে?

কতো মুখ মনে পড়ে! কচি, কাঁচা, ছেলে, বুড়ো; কারো গালে দাঁড়ি, কারো শিরে টিকি; পিঠে জাল, কাঁধে লাঙল, মাথায় ঝাঁকা; ছিন্ন লাল শাড়ি, গ্রন্থি দেওয়া আধময়লা থান; কাকা, চাচা, দিদি, বৌ—কতো রকম সম্পর্ক। 'ক্যাশে আইলেন?'—একগাল হাসি। কি এক রকম খুশিতে মনটা লাফ দিয়ে উঠতো নদীর ঘাটে স্টিমার থেকে নেমেই। 'মাল আছে না কত্তা? তাইলে ঘোড়া দেই এট্টা।' 'গরম চমচম্ আছে বাবু, নিয়া যান কিছু। শরীল ভাল আছে তো?'—কে হিন্দু, কে মুসলমান? এরা সবাই আমার আপন জন। তারা আছে, তারা থাকবে। পৃথিবীর কোন যুদ্ধ, কোন দাংগা সে কথা ভুলিয়ে দিতে পারবে না। তবু যখন দলে দলে নিরাশ্রয়ের দল চিরকালের ভিটে মাটি ফেলে নিষ্ঠুর প্রবাসের গাঁয়ে প্রাণের মায়ায় ছুটে আসে, অভিমানে মন ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু অভিমান কার ওপর করব? যদি নিশ্চিন্ত মনে সে কথা জানতুম!

নিজের জন্মভূমি, নিজের গ্রাম যে এতো আমাদের প্রিয়, এত গরীয়সী সে কি

শুধু অবুঝ মনের ভাবালুতা? সে কি শুধু দশের মুখের শোনা কথা? পৃথিবীর সবচেয়ে হতশ্রী পল্লীতে জন্মের জীর্ণ কুটিরটি নিজের চোখে যে তাজমহলের চেয়েও সুন্দর লাগে—তার মধ্যে ফাঁকি নেই। সেই বাড়িতে একদিন আমি চোখ মেলে অবাক-বিশ্বে প্রথম তাকিয়েছিলুম। বাতাবিলেবু ফুলের ঘ্রাণ চিনতে চিনতে গুণগুণ করে মায়ের মুখে সেই বাড়িতে আমার রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান শোনা। মালিবৌ-এর হাত ধরে শংকিত মনে সেই গ্রামের রাস্তা বেয়ে প্রথম পাঠশালায় যাওয়া। রহস্যেভরা কলকাতা শহরের প্রথম চিঠি পাওয়া সেই বিন্যাফৈর গ্রামের ডাকপিওন আতোয়ার ভাই র হাত থেকে। নদীর পাড়িতে দাঁড়িয়ে ওপারে ধূ ধূ চরের দিকে তাকিয়ে বিরাট বিশ্বের অস্ফুট স্বপ্ন দেখা। এসব কি ভোলা যায়? দু চোখ ভরে, মন ভরে, হৃদয় ভরে, আমার সেই আপন গ্রাম আমাকে অকৃপণ ভাবে কতোই যে দিয়েছে। এই সুয়োরাণীর দেশ কলকাতা শহরের এতো সুখ গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না। ধড়ফড় করে এক সময়ে মন বলে ওঠে—যাই—যাই আমাদের সেই দুয়োরাণী দুঃখিনী মায়ের কোলটিতে।

কলকাতা শহর থেকে আড়াইশো মাইল দূরে। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীর শাখানদী ঘুরে ঘুরে ঘুরে এঁকে গেছে। সে বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। নদীতো আরো কতো দেখলাম, কিন্তু সেরকমটি আর দেখলাম না। ফাল্গুন, চৈত্রে মরুভূমির মতো ধূ ধূ করছে বালির চড়া, রোদ্দুরে তাকিয়ে থাকলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। ওপারে বালির ডাঙা, মুসলমান চাষীদের বাস। কী দুর্দান্ত কষ্ট সহ্য করতে পারে কালো কোলো বলিষ্ঠ সেই চাষীর দল। তাদের মধ্যে বেঁটে খাটো সর্দার গোছের একটা লোক—'শাহেনসা' নাম ধারণ করে দোর্দণ্ড রাজত্ব চালাচ্ছিল সেই তখনকার ইংরেজ রাজত্বের কালে। প্রকাণ্ড একটা আস্তো চরের মালিক ছিল সে। রাস্তায় যখন চলতো তখন তার সামনে পিছনে থাকতো পঁচিশ ত্রিশটি দেহরক্ষী সর্দার, কোমরে গামছা জড়ানো, মাথায় পাগড়ি, কাঁধে লাঠি। ফি বছর দুচারটি করে বিয়ে করতো এবং বিয়ে করেই সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীর মেয়েদের সে রাইফেল ধরতে শেখাতো। তাদের তৈরী করে নিতো নিজের মনের মতো করে। কোন পুলিশ, কোন আদালতের সে তোয়াক্কা

রাখে না। দশটি বছর ছায়ার মতো পিছনে ঘুরেও তার সন্ধান পায়নি সরকারের চরেরা। এই সেদিন শুনলাম পুলিশের শক্ত বেড়াজালে এই বিরাট রাঘব-বোয়ালটি আটকা পড়েছে এত্তোকাল পরে—রাইফেল-ধারী দুজন নতুন বিয়ে-করা স্ত্রীর সংগে একত্রে। এরা ভয়ংকর, এরা ভীষণ। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ থাকতো সাতত্রাটের লোক। তবু সেই স্মৃতি ভালো লাগে!

স্টিমারঘাট থেকে আঁকাবাঁকা পথ—বিধবার সিঁথির মতো ম্লান ধূসর। তার পরে খেলার মাঠ, তার পরে টিনের আটচালায় গ্রামের ইস্কুল, বাঁধানো ঘাট পুকুর, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, আবার সড়ক, সরু কাঠের পুল, সরষে ক্ষেতের ধার দিয়ে ঢুকে আমার গ্রামের গাছের ছায়া। আঃ—গ্রীষ্মের বৃষ্টির মতো ঝর্ ঝর্ করে সেই ছায়ার শান্তি যেন গলায় গায়ে মাথায় ঝরে ঝরে পড়ে। আর কতো পাখি! শহরের লোক চেনে শুধু কাক আর চড়াই। কারো কারো খাঁচায় থাকে শিকল-বাঁধা কোকিল, বিরস স্বরে বারো মাসই ডাকে। আর শহরে পাখি আছে আলিপুরের পশুশালায়। কিন্তু পাখি দেখতে, পাখি চিনতে কে বা যায় সেখানে? ওদিকে গ্রামে যখন মনমরা শীতের শেষে একদিন হঠাৎ ঝক্‌ঝকে গলায় কোকিল ডেকে ওঠে—আঃ, শত সহস্র প্রাত্যহিকতার দুঃখে ভরা পৃথিবী যেন চীৎকার করে ওঠে আনন্দে! গ্রীষ্মের রাতে নির্লজ্জ 'বৌ-কথা-কও' 'বৌ-কথা-কও' শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। সাত সকালেই দোয়েল চুপচুপি বসে গলা সেধে নিয়ে ফুড়ুৎ করে দিনের কাজে বেরিয়ে পড়ে। ঘুঘু তখন কলমের ডালে বসে রোদকে সাধে—'সুজ্জি ঠাকুর ওঠো-ওঠো-ওঠো।'

পূববাংলার কোনো গৌরবই নেই আজ। কিন্তু কোমলে কঠোরে বিচিত্রতায় ভরা তার যে আপনকার রূপটি এই এ-যুগেও আমরা দেখেছি আর কোথাও তার তুলনা নেই। যদি সম্ভব হতো, এখনো যদি সম্ভব হয়, আবার কি তাহলে সেই নিভৃত পল্লীতে ফিরে গিয়ে দিন কাটবে, মন টিঁকবে? স্বীকার করি—টিঁকবে না! আমরা শিক্ষিত, আমরা শহরের নেশার স্বাদ পেয়েছি। আমাদের জাত গেছে, তাই আমরা আন্তর্জাতিক। কলের জল আর পাউরুটি না হলে আমাদের মুখে রোচে না। বিজলী তারের আলো না জ্বললে আমাদের জীবন অন্ধকার।

আমাদের জীবন জটিল হয়েছে। আমাদের প্রয়োজনের সীমা বেড়েছে। তাছাড়া শহর আমাদের জীবিকা দেয়, শহরের ইস্কুলে আমাদের ছেলেরা পড়ে। পারবো না, চিরকালের মতো আবার সেই গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়েছে আমাদের জীবনে।

কিন্তু তাতে কি? সে যে আমার নিজের বাড়ি, নিজের ঘর! তারা যে আমার নিজের লোক! জীবিকার ধাঁধাঁয়, জীবনের জটিল পাকে যতোই আমরা ঘুরি না কেন, এক সময় তো ইচ্ছে করে ফিরে যাই মিটমিটে প্রদীপ জ্বালানো আপন বাড়ির ঘরটিতে! সেই আমার স্বপ্নে ভরা ছেলেবেলার দেশ। বোমায়, আগুনে, কামানে, বারুদে, যুদ্ধে, দাংগায় পৃথিবীর অর্ধেক যদি ছারখারও হয়, তবু সেখানে থাকবে চুল এলানো বাঁশবনের লুটোপুটি হাওয়া, কোজাগরী পূর্ণিমার মধুর রাত। টিনের আটচালায় সর্ সর্ করে পাতা ঝরবে। হিজলের ফুল ভাসবে পচা ডোবার জলে। সেই রবিবারে হাট বসবে। পাঠশালার বুড়ো মৌলবী সাহেব ওপারের চরের থেকে বেগুন-মূলো বেচতে আসবেন এ পারের গ্রামের বাজারে। কৃষ্ণের-জীব বেতো ঘোড়ার পেটে-পিঠে তিনমণ বোঝা দিয়ে গঞ্জের হাটে যাবে গাঁয়ের ব্যাপারীরা। বর্ষায় ক্ষেত ডুববে, ঝড়ে ভাঙা গাছের ডালে পথ বন্ধ হবে। কেউ তাকিয়ে দেখবে না, তবু সময় এলেই পুকুরের ধারে পলাশের ডাল লাল হয়ে উঠবে। বাবুই পাখিরা দোল খাবে নিপুণ ঠোঁটে বোনা তাদের তালের পাতার দোলনায়। কিন্তু—তারা কোথায়? যারা একদিন এ পাড়া ও পাড়ায় সাতপুরুষের ভিটে আঁকড়ে পড়ে ছিল? সেই দলাদলি, নিন্দা, ঈর্ষা, মন্দ আর অফুরন্ত ভালোতে ভরা তারা কোথায়?

সময় অস্থির, জীবন অস্থির। যারা গেছে তাদের আর এ জীবনে খুঁজে পাওয়ার সময় হবে না।

জননী আর জন্মভূমি! মন বলে যাই—আর একবার যাই।

কমলপুর

আমি একজন সাধারণ মানুষ আপনাদের সাধারণতন্ত্রের পুরোপুরি নাগরিকও নই। কারণ, নাগরিক-গৌরবের অধিকারী হবার পূর্ণ যোগ্যতা নেই বলেই হয়তো। চিনবেন না আমাকে, অন্তত চেনবার মতো সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন-বোধও নেই হয়তো আপনার। কিন্তু আপনি আমাকে দেখেছেন, শুধু আমাকে নয়, আমার মতো হাজারো হাজারো গৃহহীন উদ্বাস্তু ছন্নছাড়াদের, কলকাতায় ও তার আশে-পাশের শরণার্থী শিবিরে কিংবা ভাঙা বস্তির অন্ধকুটীরে; না দেখলেও কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন তাদের খবর।

কলকতার সংগে নাড়ীর যোগ নেই আমার, আছে প্রয়োজনের। বিপর্যয়ের পশরা মাথায় বহন করে যেদিন এসেছিলাম কলকতায়, তখন এই মহানগরী নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে আমায় ঠেলে বের করে দিতে চেয়েছিল তার আঙিনা থেকে। দাবী তো আমার বেশি কিছু ছিলনা! আট নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িটাও আমি চাইনি, কিংবা পারমিটের জন্যে আবেদন-নিবেদনও করিনি রাজ্য-সচিবদের কাছে। চেয়েছিলাম একটু মাথা গুঁজবার জায়গা আর সাধারণ সুস্থ নাগরিকের মতো খেয়ে-পড়ে থাকবার অধিকার। কলকতার ধনভাণ্ডার দিন দিন স্ফীতকায় হয়ে উঠছে ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজারের হর্ম্যাভ্যন্তরে। সে ভাণ্ডারের অংশীদার হতে তো চাইনি আমি। আমি চেয়েছিলাম নেহাৎ জীবনধারণের মতো আয়, কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে। নিষ্ঠুর নগর-লক্ষ্মী রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে আমায় বার বার। তবুও নিরাশ হইনি আমি। জীবিকার জন্যে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কলকাতাকে। সে আমাকে হারাতে পারেনি। তাই আজো বেঁচে আছি আপনাদের শোনাবো বলে আমার ফেলে-আসা জীবনের ইতিহাস, যা জড়িত হয়ে আছে আমার সাতপুরুষের ভিটা ছেড়ে-আসা গ্রামের সংগে।

মেঘনার কোল-ঘেঁষা পূর্ব-বাংলায় একটি গ্রাম। পৃথিবীতে প্রথম যে আকাশের নীল আর সূর্যের আলো এসে লেগেছিল আমার চোখে সেটি সেই গ্রামের। স্বপ্নের মতো লাগতো গ্রামের প্রতিটি রাস্তা, প্রতি মাঠ, প্রতিটি পুকুরের চারধারের প্রকৃতির পরিবেশকে। পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রাম দেখেছি। কিন্তু পূববাংলার গ্রামের মতো সবুজ স্নিগ্ধ মাটির স্পর্শ কোথাও পাইনি। যে গ্রামে জন্মেছিলাম, তার আয়তন ক্ষুদ্র জনবল নগণ্য। হয়তো পাঁচ হাজারের বেশি হবেনা। নগণ্য বল্লাম এই জন্যে যে, পূববাংলার যে কোন গ্রামে দশ হাজার লোকের বসবাস অত্যন্ত স্বাভাবিক। গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে উদ্দাম স্রোত-ধারায় বয়ে চলেছে দুরন্ত মেঘনা। কালো মেঘের ছায়া বুকে নিয়ে ভরা বর্ষায়, সে কি দুর্দাম, দুর্বার তার গতি! একবার মনে আছে ছোট বেলায় পাড়ি দিয়েছিলাম মেঘনা ছোট্ট নৌকো করে। ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা লেগে নৌকো প্রায় তলিয়ে যায়। আমার কিশোর মন সেদিন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেঘনা নদীর মুসলমান মাঝি ঢেউকে ভয় পায় না। দরিয়ার পীরের দোহাই দিয়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়েছিল সে আমাকে নদীর ওপারে। বিদ্রোহী মেঘনার সেদিনের রূপটি মনের শ্লেটে খোদাই করা আছে আজো। সেই মেঘনার স্মৃতি নিয়ে সুবর্ণরেখা, অজয় কিংবা কোপাই নদী দেখলে মনে হয়, এগুলো নদী নয়, নদীর ছায়ারূপ।

যে গ্রামে জন্ম, সেখানে সব সময় থাকতাম না আমি। মাইল ষোল দূরের একটা আধা-শহর বৃহত্তর গ্রামের স্কুলে পড়তাম আমি আমার মা-বাবার সংগে থেকে। ছুটিতে চলে আসতাম বাড়িতে। রেল স্টেশন ছিল একমাইল দূরে। পরে অবশ্যি গ্রামের মধ্যে স্টেশনটি স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল রেলকর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে। স্টেশন থেকে হেঁটে গ্রামমুখো আসবার সময়টা যেন আর কাটতে চাইতো না! কতোক্ষণে সুপুরি গাছের সারির তলা দিয়ে বাঁকা পথটি ধরে বাড়ির উঠোনে এসে হাঁক দেবো ঠাকুরমাকে, সে সেজন্যে মনটা উন্মুখ হয়ে থাকতো। গ্রীষ্মের ছুটিটাকে আমরা বলতাম আম-কাঁঠালের ছুটি। কাঁচা আমের গন্ধে তখন গ্রামের আকাশ ভরপুর। কিছুদিন পরেই রঙ্‌ ধরতে শুরু করবে গাছগুলোতে। ঘু-ঘু ডাকা এক একটা দুপুর। কতো দুরন্ত মধ্যাহ্ন কাটিয়েছি

কাঁচামিঠে আমগাছের ওপরে, সেগুলো আজ স্মৃতিমাত্র। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা সামনের ধান-ক্ষেতের উদার বিস্তারকে মনে হতো রাত্রি বেলা ঠাকুরমার কাছে শোনা রূপকথার সেই তেপান্তরের মাঠের মতো। কতোদিন যে আশা করেছি, দেখা হয়ে যাবে নীলঘোড়ায়-চরা রাজপুত্রের সংগে!

স্নান করতে যেতাম দক্ষিনের বিলে কিংবা কোন কোন দিন পঞ্চবটির ঘাটে। ঘাটটিতে পাঁচটি বটগাছ ছিল বলেই নামকরণের এতো ঘটা। গ্রীষ্মের শেষে বিল যেতো শুকিয়ে, তবু সেই কাদাভরা বিলের জলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। শালুক আর পদ্মলতার অরণ্য ছিল বিলটিতে। সাঁতার কাটতে গিয়ে অনেকবার লতায় জড়িয়ে যেতো পা। তবু আমাদের দুরন্তপনার শেষ ছিলনা। গ্রামটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও এর মধ্যেই নানা পল্লীতে ভাগ করা ছিল তার অধিবাসীদের বাসস্থান। পূবদিকে দিল আচার্য-পাড়া, দক্ষিনে ছিল জেলে পাড়া, উত্তরে তাঁতীদের বাসস্থান, তারই পাশে ছিল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বাড়ি, পশ্চিমে ছিল মুসলমান চাষীদের পাড়া। প্রতি সন্ধ্যায় এক একটা পাড়ার একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তো। জেলেদের ঘরে জন্মেছিল বৃন্দাবন। আমরা তাঁকে দাদা বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন কবিয়াল। তারাশংকর বাবুর 'কবি' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সেই কবির জীবনীটি মনে করে দেখুন। এ কবিকে আমি চোখে দেখেছি। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছিল আমার কিশোর মন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব।

দোল-উৎসবে, ঝুলন-যাত্রায় আমরা বহুবার বিন্দাবনের কণ্ঠে কবিগান শুনেছি। বাংলার লুপ্তপ্রায় কবি-সংস্কৃতির শেষ পর্যায়টুকু আমরা শুনেছিলাম তাঁর গানে। তিনি আজ নেই। তাঁর গানের স্মৃতি বেঁচে আছে। দুর্গা পুজোর উৎসবের স্মৃতি আজো অমলিন। বারোয়ারী পুজোয় চাঁপার ডালে ভীড় করতো এসে দোয়েল। দুর্গা পুজোর সে কি উদ্যম আর উদ্যোগ! বর্ষ-পরিক্রমা করে আশ্বিনের এই দিনগুলোর জন্যে উৎসব-বিলাসী গ্রামের ধনী-নির্ধন অধিবাসীরা প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকতো। শরতের সোনালী আঁচল ছড়িয়ে পড়তো আকাশের গায়! পেঁজা তুলোর মতো নির্জলা মেঘের দল উধাও হয়ে যেতো

মেঘনার তুতীরের আকাশে। নদীর চরে একরাশ সাদা কাশবনের ভেতর যেন হারিয়ে যেতো মন। রাস্তার দুধারে অযত্ন বর্ধিত কেয়া আর যুঁইফুলের ঝোপে মন-পাগল করা গন্ধ ছড়িয়ে থাকতো। শিবতলার মন্দিরের গা বেয়ে যে মাধবীলতার মালঞ্চ নুয়ে পড়েছিল মাটিতে তার সৌরভ পথ-চলা হাটুরে লোকদের মনকেও দিতো ভরিয়ে। গ্রামের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রথা প্রচলিত পূর্ববাংলার সবখানেই। সেই উৎসবের আনন্দ শুধু মাত্র হিন্দুদের ছিল না, আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীদেরও ভাগ নিতে দেখেছি তাতে সমানভাবে। দুর্গাপুজো কিংবা লক্ষ্মীপুজোর সময়ে মুসলমান ভাইবোনদের জন্যে খাবার আলাদা করে রাখতো গৃহকর্ত্রীরা। আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের ক্ষেত-জমিগুলো ভাগে চাষ করতো মুসলমান কৃষকেরা। তাদের বলা হতো বর্গাদার। কয়েকজন বর্গাদার কৃষকের নাম আজো মনে আছে আমার। সুন্দরআলি, রহিমউদ্দিন, সুকুর, মামুদ। এরা সবাই আসতো আমাদের বাড়িতে। পরম সম্প্রীতি আর প্রতিবেশিত্বের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওদের সংগে। আমার ঠাকুরমা এদের ভালোবাসতেন ছেলের মতো। কোনদিন ভাবিনি এমনি করে তাদের ছেড়ে চলে আসতে হবে অভাবনীয় ভয় আর আতংক নিয়ে।

গ্রামের বাজার ছিল এক মাইল দূরে। মেঘনার তীরে সেই বাজারটি পূর্ব-বাংলার অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়স্থল ও বন্দর। স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় সেখানে স্কুল ও কলেজ দুই-ই স্থাপিত হয়েছে। আজ জানি না সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তর-সাধক কারা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী-অভিযানের আশংকা ছিল পূর্ববাংলার প্রান্ত দিয়ে। চট্টগ্রামে প্রতিরোধের আয়োজন করেছিল সাউথ ইষ্ট্ এশিয়া কমাণ্ডের সৈন্যদল। রণসম্ভার ও সৈন্য বাহিনী চলাচলের জন্যে আমাদের গ্রামের স্টেশনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বিশেষ করে মেঘনার ওপরে যে সেতুটি আছে তা রক্ষা করবার জন্যে বিমান বিধ্বংসী কামানও সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল সেখানে। সেই রণসজ্জার পাশে গ্রামটির নিরাভরণ শান্তশ্রী কী অপূর্বই

না লাগতো! নির্মেঘ আকাশে তখন সন্ধানী বিমানের আনাগোনা থর থর করে কাঁপিয়ে দিয়ে যেতো গ্রামের মাটিকে, তার ভাংগা শিবমন্দির আর পঞ্চবটির ঘাটকে।

যুদ্ধের সমাপ্তিতে সে কাঁপনের অবসান ঘটলো। আবার বারোয়ারীতলায় দুর্গাপূজোর উৎসবে বসলো যাত্রার আসর। স্তব্ধ-কুতূহলী শ্রোতাদের চোখে মুখে তখন নিমাই সন্ন্যাসের করুণতার ছায়া এসে নেমেছে। ছল্ ছল্ করছে সহস্র জোড়া চক্ষু। তাকিয়ে দেখলাম, কোণে বসা রহিমউদ্দিনের চোখেও জল। নিমাই সেদিন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কাঁদিয়ে দিয়েছিল।

এই ছিল গ্রামের স্বরূপ। এ গ্রামকে ভালোবেসেছি। তার সমস্ত ত্রুটি, বিচ্যুতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার নিয়েই ভালোবেসেছি। নিরক্ষর কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি যেমন ছিল সেখানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কম ছিল না। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি হয়েই বাস করছিল সে গ্রামে। কে জানতো অকস্মাৎ কালবৈশাখীর ঝড় এমনি করে আলোকে নিভিয়ে দিয়ে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কালিমা ছড়িয়ে দেবে সারা আকাশময়। সেই অন্ধকার আকাশের নীচে দুঃস্বপ্নের মতো পড়ে আছে আমার ছেড়ে আসা গ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ প্রান্তে মেঘনা নদীর তীরবর্তী সোনার কমলপুর। তার এক মাইল দূরে ভৈরব বাজার আর ষোল মাইল দূরে আধা-শহর বাজিতপুর। হায়রে জন্ম-দুঃখিনী দেশ, শিশু-ভোলানো প্রবোধ দিয়ে সেদিন তোমাকে ছেড়ে চলে এলাম কলকাতার ফুটপাথকে আশ্রয় করে! কে জানে তোমার আকাশে এখনো চাঁদ আর তারা হাসছে কিনা, কে জানে মেঘনার দোলনে কাঁপছে কিনা তোমার ঝুম্‌কোলতার দুল আর দোলন-চাঁপার কণ্ঠহার?

স্টেশন থেকে বাড়ি আসবার পথে কতোজন কুশল প্রশ্ন শুধাতো। আর আজ আমি হারিয়ে গেছি কলকাতার জনারণ্যে, হারিয়ে গেছি সুরেন ব্যানার্জি রোডের আস্তানায়। এখানে আমায় কেউ চেনে না, কেউ শুধোয় না—'হে বন্ধু, আছো তো ভালো?' আমি তো এখানকার অধিবাসী নই, আমি যে শরণার্থী উদ্বাস্তু। কে আর জিজ্ঞেস করবে কুশল বার্তা?

খালিয়াজুরি

গ্রাম-হৃদয়া বাংলাদেশ। এ দেশের সংগে জড়িয়ে আছে আমার মতো লক্ষ জনের আশৈশবের স্মৃতি। এর প্রতিটি ধূলিকণা, এর আকাশের রঙ্-ফেরা, এর নদী-কল্লোলের পরিচিত সুর একান্ত করে ভালোবেসেছি, ভালোবেসে ধন্য হয়েছি। কতোদিন মনে হয়েছে এ দেশের মাটি শুধু মাটি নয়, মায়ের মতোই এ মাটি স্নেহ-স্নিগ্ধ।

এ মাটির স্নেহ দাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত আমার পিতৃপুরুষ, হয়তো এ মাটিকেই আপন করে নিতো আমাদের অনাগত উত্তর-পুরুষেরাও। কিন্তু আজ সে আশা স্বপ্ন বলেই মনে হয়। আমার জননী, আমার জন্মভূমি থেকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন। আমি আজ প্রবাসী। কিন্তু দূরান্তরে থেকেও তো সে মাটির স্মৃতিকে 'বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে' বিদায় করে দিতে পারছি না। গভীর রাত্রে যেমন করে 'নিশি ডাকে' বলে লোক-প্রসিদ্ধি আছে, তেমনি করে এই বিভূঁই বিদেশে দেশের মাটি আমাকে নিশির ডাকের মতোই প্রতিদিন আকুল সুরে ডেকে বলছে: ওরে আয়, আয়, আয়।

গ্রামটি নেহাতই ছোট। আকারে আয়তনে ছোট হলেও শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, যশে-গৌরবে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পূর্ব-ময়মনসিংহের এই গ্রামটি কিন্তু কোনক্রমেই নগণ্য নয়।

কবে যে এখানে বাসস্থান গড়ে উঠেছিল তার কোন সঠিক স্মৃতি বা ইতিবৃত্ত নেই। পণ্ডিতেরাও এর সাল, তারিখ নিয়ে কোনদিন তর্ক করেন না। যেটুকু শ্রুতি আছে তাও ক্রমে লোপ পেতে বসেছে। কারণ বহু পুরুষ অতিক্রম করে এসে তার প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য কমে আসছে। কিংবদন্তি মতে মোগল রাজত্বের শেষের দিকে দক্ষিণ রাঢ় থেকে দুই ভাই পশুপতি ঠাকুর ও গণপতি ঠাকুর

নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্যে মুসলমানদের সংগে রণে-ভংগ দিয়ে জলপথে পলায়ন করে এসেছিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করে প্রথমে খালিয়াজুরি গ্রামে তাঁরা বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই স্থানটি জনবিরল এবং বর্ষায় একটি ছোট দ্বীপের আকার ধারণ করে বলেই হয়তো তাঁরা এ স্থানটিকে নিরাপদ বলে মনে করেছিলেন। হয়তো বা বাসস্থানের পক্ষে যথেষ্ট মনে না হওয়ায় কিছুকাল মধ্যেই গণপতি ঠাকুর নতুন বাস্তুর সন্ধানে নির্গত হয়ে পাশের গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন। আর পশুপতি খালিয়া জুরিতেই থেকে গেলেন।

এই বাসস্থান নির্বাচনের মূলে নিরাপত্তার প্রশ্নটাও যেমন ছিল, তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের আবেদনও যে ছিল, একথা অনুমান করা যেতে পারে। একদিকে কলস্বনা নদী বেত্রবতী,—চলতি কথায় যাকে বলে 'বেতাই'—অপরদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি, মাঝখান দিয়ে সুপরিসর নদীতট রেখা—বাসস্থানের যোগ্য স্থানই বটে। নদীকে পেছন দিকে ফেলে বাড়ি নির্মিত হলো—সম্মুখের অঞ্চল জুড়ে আয়োজন হলো আবাদের। তারই শেষ প্রান্ত থেকে বিস্তীর্ণ বিলের অপর তীরে সূর্যোদয় এক লোভনীয় প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টি করে। নদীর পশ্চিম তীরটি অপেক্ষাকৃত ঢালু এবং বনজংগলময়। কিছু দূরে ছিল কয়েক ঘর হদির বাস। হদিরা এখন আর নেই, কবে কোন্ অতীতে যে তাদের বাসস্থান শূন্য হয়ে গেছে, তার ইতিহাসও কেউ বলতে পারে না। তবে ক্রমে এই গণপতি ঠাকুরের বংশধরেরাই নদীর পশ্চিমতীরেও বসবাস আরম্ভ করেছিল এবং বিরাট জনপদ গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে শুধু আদি বাড়িটাই পূর্বতীরে থেকে যায়, আর সবাই পশ্চিমতীরেই পল্লী গড়ে তুলে। এর মাইল দুই দূরেই 'রোয়াইল বাড়ি'র ভগ্নাবশেষ আজো বিদ্যমান। বিরাট রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ—চতুর্দিকের পরিখা আজো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বহু ভগ্ন ও ভূগর্ভনিমজ্জিত অট্টালিকা আজো পূর্ব পরিচয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সিংহদ্বারের দুপাশে দুটি বিরাট দীঘি। এ ছাড়াও অন্দরমহলের সংলগ্ন তিনটি পুকুর এবং দুতিনটি স্ফটিকস্তম্ভও দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় অর্ধ মাইল পরিবৃত স্থান ইষ্টক-সমাকীর্ণ। কোন কোন ইটের গায়ে ফুল-লতা-পাতা খোদিত। কোন কোন ইট আবার চিনামাটির মতো

এক প্রকার জিনিষ দিয়ে তৈরী এবং তাতেও অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন বর্তমান।

কিংবদন্তি মতে বিশ্বকর্মা স্বয়ং ছদ্মবেশে এই বাড়িটি গড়ে তুলছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাওয়ায় লাফ দিয়ে প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে নীচে নেমে আসেন। সেই সময়েই নাকি বাড়িটি ভূতলে প্রবেশ করে। যে স্থানটিতে বিশ্বকর্মা পড়েছিলেন বলে প্রবাদ, সেস্থানটি একটি ছোটখাটো জলাভূমিতে পরিণত হয়ে আছে এবং চলতি কথায় তাকে বলা হয় 'কোর'।

অতীতের কথা থাক্। সে দিনকাল তো অনেক আগেই গিয়েছে। কোন এক ভূমিকম্পের পর থেকেই নাকি বেতাই নদীরও অন্তিমদশা দেখা দিয়েছে। যে ব্রহ্মপুত্র থেকে বেতাই নদীর উৎপত্তি, এখানে তার মতোই এই নদীটিও আজ একটি মরা নদী।

পাকিস্তানের বিপাকে পড়ে মুমূর্ষু গ্রামটিরও আজ অন্তিম অবস্থা। তবু তার কথা ভুলতে পারছি না। এই গ্রামখানিই যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। বিষয়-সম্পত্তির প্রলোভন বা তার ক্ষতির বেদনায় নয়—যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি, যে মধুর পরিবেশের মধ্যে আমার বিকাশ হয়েছে, তার মাধুর্যময় স্মৃতিটুকুই সে মাটির দিকে মনকে টেনে নেয়। বেতাইকে স্মরণ করে বলতে ইচ্ছে হয়, 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে' কিংবা গ্রামখানিকে স্মরণ করে 'মোদের পিতৃ-পিতামহের চরণধূলি কোথায় রে' বলতে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। মরা নদীর তেমন কোন আকর্ষণ নেই—বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই সে তার স্থির জলরাশি নিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। বৈশাখ মাসে অনেকটা তো শুকিয়েই যায়। তবে বর্ষায় আবার যৌবন-জোয়ার দেখা দেয়—দেখা দেয় নিস্তরংগ জলরাশিতে স্রোতের প্রবল বেগ। কূল ছাপিয়ে জল বয়ে যায় ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে। কচি ধানের পাতাগুলো যখন সোনালী রোদ্দুরে বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলে যায় তখন কতোদিন আপন মনে আবৃত্তি করেছি—'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস্ কাহার দেশে'।

নদীর তীরে হাট, তার পিছনে একটি পুকুর, তার উল্টো দিক থেকেই গ্রামের আরম্ভ। একটি বটগাছ কোন্ অতীতকাল থেকে যে পার-ঘাটায় হাট-যাত্রীদের বিশ্রামের আয়োজন করে বসে আছে, তা কেউ বলতে পারে না। এই বটবৃক্ষের মূলেই বর্ষাকালে ব্যাপারীদের নৌকো এসে লাগে। গ্রামে সাড়া পড়ে যায় চাঞ্চল্যের, মরসুম পড়ে যায় পাট-ধান-মশলা ইত্যাদি বেচা-কেনার। দূরদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনের নৌকোও এসে লাগে। ছোট ছেলের দল তামাসা দেখতে জড়ো হয়—যুবকের দল নিজেরা নৌকো চালিয়ে বেরিয়ে পড়ে আনন্দে। ছোটবেলায় কতোদিন যে নিজেরাও এমনি করে নৌকো নিয়ে মাতামাতি করেছি তার স্মৃতি মন থেকে এখনো মুছে যায় নি।

দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবেই পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এই গ্রামে। তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতির ভাবের আদান-প্রদান ছিল। খেলা-ধুলোয়, ষাঁড়ের লড়াইয়ে, গানে-বাজনায় সকলে একসংগে আনন্দ করেছে—কোনদিন ধর্মের গোঁড়ামি কাউকে পেয়ে বসেনি। একবার গ্রামে দাংগার সময় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে ভ্রাতৃবিরোধ রোধ করেছিল! সে কথা আজ বারবার মনে পড়ছে।

স্মৃতির প্রেক্ষাপটে অতীত আজ মুখর হয়ে উঠছে। অনেক ভুলে-যাওয়া পরিচিত মানুষকে ফিরে পাচ্ছি। মনে পড়ছে সহরালী মাতব্বরের কথা—এই দীর্ঘাবয়ব, লম্বা এবং পাকা চুল-দাড়ি লোকটির চেহারায় যেমনি একটা সৌষ্ঠব ছিল, তেমনি ছিল ব্যক্তিত্বের ছাপ। তার অমায়িক প্রকৃতি, তার বিনম্র ব্যবহার, তার সুমিষ্ট সদালাপ ভুলে যাবার নয়। মনে পড়ে মনোহর ব্যাপারীর কথা। লাঠিখেলায় সে ছিল ওস্তাদ এবং সাহসও ছিল প্রচুর। সর্বদাই একটি দীর্ঘ লাঠি হাতে নিয়ে চলা-ফেরা করতো এই লোকটি এবং যৌবনের দুঃসাহসিক কাহিনী অভিনব ভংগী সহকারে শুনিয়ে আসর মশগুল করে তুলতো। তারপর মনে পড়ে আলম মুন্সীর কথা। মুন্সী হিসেবে এ অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত তার একটা প্রভাব গড়ে উঠেছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা গড়ে উঠেছিল তার চরিত্রমাধুর্যে। আজ এরা কেউ আর জীবিত নেই। এদের উত্তরাধিকারীরাও সে সব সদ্‌গুণাবলীর

উত্তরাধিকার পায়নি কেউ। তা যদি পেতো তবে এতো সহজে গ্রামের এতো পরিবর্তন হতে পারতো না। মুন্সীর ভাইপো মুন্সী হয়েছে বটে, কিন্তু এই জামু মুন্সী তার চাচার ঠিক বিপরীত। তাকে লোকে সমীহ করে শ্রদ্ধায় নয়, অন্তরের টানেও নয়—অনেকটা শনির সিন্নি দেওয়া গোছের ব্যাপার। জামু মুন্সীই এ অঞ্চলে লীগের পাণ্ডা, ইসলামের ধ্বজাবাহক এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানীর উৎস। সে কি যেমন তেমন মুন্সী? গোটা পাঁচ ছয় নিকে সে করেছে এবং তার চাচীকেও সে বাদ দেয়নি।

অবিনাশদারও সেদিন আর নেই। তিনি লাঠি হাতে নিলে একাই ছিলেন একশ। এতো বড় শক্তিশালী পুরুষ এ অঞ্চলে আর ছিল না—এখন বৃদ্ধ স্থবির। আর সেই প্রসন্ন চক্রবর্তীর কথা। হাস্য-পরিহাসের জন্যে তিনি সকলের ছিলেন 'ঠাকুরদা'। তাঁর বিরাট দাড়ি দেখে আমরা তাকে ডাকতাম 'পশম ঠাকুরদা' বলে। তারপর মনে পড়ে উল্লাস পণ্ডিতের কথা। এই উল্লাস জাতিতে রজক দাস—লেখাপড়ার কোন ধারই সে ধারে নি, নামটি পর্যন্ত সে লিখতে জানে না। তবুও সে পণ্ডিত। লোকটির উপস্থিত বুদ্ধি ও হাস্যরস পরিবেশনের শক্তি অসাধারণ। যে কোন স্থানে সে আসর জমিয়ে তুলতে পারে। তাকে ছাড়া কোন গানের আসর জমে না। একদিন জিজ্ঞেস করলাম—'কি রে উল্লাস, তুই লেখাপড়া জানিস না তো পণ্ডিত হলি কি করে?' সে সংগে সংগে উত্তর দিল—'বাবু! আমি কি লেখাপড়ার পণ্ডিত? আমি কথার পণ্ডিত, হাসি তামাসার পণ্ডিত।'

প্রায় রোজ রাত্রেই বাউল গানের আসর বসতো আমাদেরই বাড়িতে। এতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগ দিতো। বংগ-বিভাগের কিছুকাল পরেও চলেছিল এই আসর। গ্রাম্য-জীবনের সেই বিমল আনন্দময় মুহূর্তগুলো আজ দুঃখের সংগে মনে পড়ে। মনে পড়ে সকাল-বিকেলের গল্পের আসরে তারাসুন্দরদার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা, হুঁকো হাতে বিরাট গোঁফে চাড়া দিয়ে দ্বিজেন ডাক্তারের গল্প বলার অভিনব ভংগী। তাস-পাশা-দাবার আসর—খেলাধূলোর বৈকালিক আনন্দোৎসব, সে সব কি আর মন থেকে মুছে যেতে পারে? আর সেই সংগে মনে পড়ে ছিপ হাতে করে দল বেঁধে বড়শিতে মাছ ধরার অভিযানের

কথা। ছোটবেলায় আমরাও গিয়েছি বহুদিন। একালেও ছেলেরা যেতো সেই বেতাই নদীতে, গাঁয়ের এপুকুর সেপুকুরে বা 'বগাউড়া' বিলে কিংবা জোঁকারহাওরে। এই বগাউড়া বিলের সংগে রায় বংশের একটি কিংবদন্তি জড়িত। বাড়ির ঠিক পিছনের সীমানা থেকেই এ বিল আরম্ভ হয়েছে বলা চলে। অতীতে এই বংশের লোকেরা নাকি অতিকায় ছিলেন—এতো বিরাট বলিষ্ঠ চেহারা এ অঞ্চলে নাকি আর ছিল না। কয়েক পুরুষ পূর্বে মুকুন্দ রায়ের সুপ্রশস্ত বক্ষপটের মাপে একখানা 'পদ্মপুরাণ' পুস্তকের মলাট তৈরী করা হয়েছিল। প্রায় পৌনে একহাত লম্বা এই মলাটখানি এখনো তাঁর বিরাট চেহারার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। মধ্যাহ্নভোজনের পর রায়েদের ঢেঁকুরের শব্দে বিশ্রামরত বগগুলো নাকি বিল থেকে যেতো উড়ে এবং তাই থেকেই নাকি এর নাম হয়েছে বগাউড়া (বগা-বক) বিল। আর জোঁকার হাওর—বৈশিষ্ট্যে এ বিল বোধহয় বাংলাদেশে অদ্বিতীয়। এবিলে অসংখ্য জোঁক সর্বদা কিলবিল করে বেড়ায়—বর্ষায় নতুন জল যখন আসে তখন সেখানে পা দিলে এক মিনিটেই জলের নীচের সমস্ত অংশটি জোঁকে ভরে যায়। এই জোঁকের জন্যেই বোধহয় এরূপ নামকরণ হয়ে থাকবে এ জলাশয়ের। কিন্তু আসল বৈশিষ্ট্য এর মাটিতে। এতো এঁঠেল মাটি অন্য কোন স্থানে পাওয়া দুষ্কর। বর্ষায় এ মাটি পায়ে এমনভাবে জড়িয়ে যাবে যে, সহজে ধুয়ে তোলা যায় না। গ্রীষ্মে পাথরের মতো শক্ত কোদালী দিয়ে কাটা যায় না। 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি' কথাটা যদি মাটির বেলায় প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এই জোঁকার হাওর সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা চলে! গ্রীষ্মকালে সমস্ত বিলটি ফেটে চৌচির হয়ে হয়ে যায়। তখন এর মাটি কাটার কুলীও পাওয়া যায় না! কুলীরা বলে জীবনে তারা এরূপ মাটি দেখেনি। ফাটলের ভেতর কোদাল চালিয়ে পাথরের টুকরোর মতো এক একটি টুকরো বার করতে হয়। এ সবই এখনো তেমনি আছে, নেই কেবল সেই পারস্পরিক সম্প্রীতি আর তার অভাবেই গ্রামের অবস্থা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। মানুষের মনের প্রাংগণেও আজ জোঁকার হাওরের ফাটল।

বারঘর

বহু দুঃখের মধ্যেও স্মৃতিঘেরা অতীতকে মনে পড়ে। বিগতদিনের সুখ, আনন্দ, উৎসব আজ লাঞ্ছিত জীবনেও কেন মাথা ফুঁড়ে বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে জানি না। কলকাতা মহানগরীর প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে কেন যেন কেবলই আমার গ্রামের চাষীদের ছোট ছোট শান্তিনীড় খড়ের ঘরের ছবিই ভেসে উঠছে বার বার! সেই খাল, কে কবে কেটেছিল জানি না, কিন্তু বর্ষার নতুন জলে খালের প্রাণে যে জোয়ার জাগতো আজো তা স্পষ্ট মনে রয়েছে। নতুন বর্ষার জল নিকাশের খাল দিয়ে যে দেশের মধ্যে এমন রাজনৈতিক কুমীর এসে মানুষকে ঘরছাড়া করবে তা আগে কে ভাবতে পেরেছে! স্বস্তিতে ভরা আমাদের জীবনের দিনগুলোকে এমনভাবে এলোমেলো করে দিয়ে কোন্ মহাপ্রভু কতোটুকু বাজী জিতলেন তার হিসেব আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষরা পাবো না। তবে আমাদের রক্তে জয়তিলক কেটে আজ অনেকেই স্ফীত হয়ে উঠেছে তা চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু গরীব হিন্দু বা মুসলমান কতোটুকু লাভবান হয়েছেন এই হানাহানিতে?

আমাদের গ্রামের নাম 'বারঘর'। এ নামের উৎপত্তি হলো কোথা থেকে তার স্পষ্ট কোন ইতিহাস না থাকলেও যতোদূর জানা যায় পূর্বকালে বারজন প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিতের বাসস্থান ছিল এই গ্রামটিতে। মুক্তাগাছা, গৌরীপুর. রামগোপালপুর, কালীপুর প্রভৃতি ময়মনসিংহ জেলার নামকরা জমিদারদের টোলের পণ্ডিত ছিলেন এই বারজন ব্রাহ্মণ। তাঁদের পাণ্ডিত্য নেত্রকোণা মহকুমার এই গ্রামের সম্মান বৃদ্ধি করেছে নানাদিক থেকে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকলেই তাই আমাদের গ্রামটিকে সম্মান এবং সমীহ করে চলতো। এই বারজন ব্রাহ্মণকে কেন্দ্র করেই 'বারঘর' গ্রামের সূচনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন অন্যসব গ্রামকে কবলিত করেছে,

তখনো এই গ্রাম সযত্নে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে এড়িয়ে চলে আসছিল, কিন্তু কালের কুটিলগতিতে সবই একদিন ভেসে গেল। টোল ছেড়ে ছেলেরা স্কুল-কলেজে ঢুকতে লাগলো। ছোটবেলায় দেখেছি কতো দূর দূর থেকে লোক আসতো আমাদের গ্রামে বিধান বা ব্যবস্থা নেবার জন্যে—কেউ শ্রাদ্ধের, কেউ বিয়ের আর কেউ বা প্রায়শ্চিত্তের।

'বারবর' প্রাইমারী স্কুল, 'কাশতলা মাইনর স্কুল' এ অঞ্চলে এ দুটি বিদ্যায়তন বহু প্রাচীন। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি এখানে পড়েনি এমন বড়ো কাউকে পাওয়া যাবে না। প্রায় সকলের বাপ-ঠাকুরদাই এই স্কুল দুটির ছাত্র ছিলেন। দূর গ্রাম থেকে খালি গায়ে খালি পায়ে হেঁটে ছেলেরা আসতো বিদ্যার্জন করতে। শিক্ষক ছিলেন মাত্র দুজন। বেড়াছাড়া, চালা দেওয়া ঘরের মাঝখানে বসতেন মাষ্টার মশাই আর তাঁকে বেষ্টন করে বসতো ছাত্রবৃন্দ। স্কুলের চারপাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাদা হয়ে ফুটে রয়েছে গন্ধহীন কতো শ্বেতকড়ি ফুল। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় স্কুলকে কুঞ্জবন বলে ভুল হলেও কোন দোষ দেখিনা! ভাবতেও বুক ফেটে যায় আজ যে, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা গ্রামটির কি কদর্যরূপই না হয়েছে। সেই নীরব কুঞ্জ আজ জংগলা-জীর্ণ, গ্রামবাসী দেশছাড়া, নির্জন নিভৃত গ্রামে সকালসন্ধ্যে আজ কেবলি শেয়াল ডাকছে। সাপের ভয়ও নাকি খুব বেড়ে গেছে শুনেছি। কালসাপের ছোবলে লখিন্দরের মতো আমরাও মৃত্যুপথযাত্রী,—এ ছোবল থেকে মুক্তি দেবার মতো শক্ত জবরদস্ত রোজার সন্ধান পাইনি। লখিন্দর শেষে প্রাণ পেয়েছিলেন, সম্পত্তি পেয়েছিলেন বলে জানি, কিন্তু আমরাও কি পাবো সে সব কোনদিন? আশার ছলনায় ভুলে থেকে মনকে স্তোক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কোথায়? তবে প্রতিটি নাগরিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার দেশের রাজনীতির জংগলে গজিয়ে ওঠা বিষধর সর্পগুলো আর যেন আমাদের কামড়াতে না পারে। বিষে বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছি! বিষক্ষয়ের পন্থা কোথায় সত্যি কি, তা আমাদের অজানা থেকে যাবে সারা জীবন? ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের মূর্খতাকে ক্ষমা করবে কি করে জানি না।

জলে ছল্‌ছল্‌ চোখ দুটির সামনে কেবলি ভেসে উঠছে গ্রাম্য স্কুলের শান্ত মধুর চিত্র। আমগাছের ছায়ায় জটলা করছে ছেলের দল, কেউ বা ঢিল দিয়ে কচি আম পাড়তেই ব্যস্ত, হঠাৎ সোরগোল উঠলো—'হেড মাষ্টার আসছেন রে।' মুহূর্তে সমস্ত লোভ সংবরণ করে ছেলেরা দৌড় মারলো যে যেদিকে পারে! হেড মাষ্টার মশাইকে বড়ো ভয় করতো ছেলেরা তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে—ইংরেজীতে তাঁর জ্ঞানও ছিল অসাধারণ। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারতেন তিনি। শুধু বরদাবাবুই নন, এ স্কুলের কথা উঠলেই মনে পড়ে গংগাচরণবাবু, উমেশবাবু প্রভৃতির সহৃদয়তার কথা। পাশের গ্রাম বারহাট্টায় উচ্চ ইংরেজী স্কুল হবার সংগে সংগেই আমাদের গ্রামের স্কুলের আকর্ষণ কমে আসে। কোন রকমে আরো কিছুদিন চলার পর এতোদিনের ঐতিহ্যময় স্কুলটি শূন্যে মিলিয়ে গেল। আজ আর কোন প্রয়োজনই নেই কারো ওসব স্কুলের—বিদ্যের বোঝা বয়ে বেড়াতে পাকিস্তানের মোল্লাতন্ত্রীরা নারাজ! বিদ্যে-বুদ্ধির কদর বুঝলে কি কেউ কারো গলায় ছুরি বসাতে পারে অক্লেশে অকুতোভয়ে? গুণ্ডা রাজনীতির বিপদ অনেক রকম আজ হয়তো সংস্কৃতিশীল লোকেরা তা হৃদয়ংগম করছে।

বারহাট্টা স্কুলের নামের সংগে আরো দুটি নাম জড়িয়ে রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন তার প্রতিষ্ঠাতা ৺মোহিনী গুণ আর শশী বাগচি। বহু শক্তিক্ষয় করে অর্থ ব্যয় করে স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা। কতোবার কতো দুর্যোগ এসে স্কুলটিকে বিপন্ন করে তুলেও উঠিয়ে দিতে পারেনি, জানি না আজ স্কুলের প্রাণশক্তি আর কতোটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। একদিনের ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়ে। রাত্রে হঠাৎ শত্রুপক্ষীয় কেউ স্কুলের খড়ো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়—সে দৃশ্য ভাবলে আজকে এতোদূরে থেকেও রোমাঞ্চ লাগে। শিক্ষা সংস্কৃতির মুখাগ্নি করেই তো দেশব্যাপী সূত্রপাত হয় বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের! আপন সংস্কৃতিকে হত্যা করে পূর্ব বাংলা আজ ছিন্নমস্তা! সুকুমার বৃত্তির এই নির্বাসন কেমন করে কার উস্কানীতে সম্ভবপর হলো তা জেনেও আমরা মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হইনি সেই অশুভ শক্তিকে।

বিদ্যালয় ভবনে ঐ অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি কর্তৃপক্ষকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি,—জিদ এবং উদ্যম আরো যেন বেড়ে গিয়েছিল এরপর থেকে। আমাদের গ্রামে শিক্ষার প্রচলন দেরীতে সুরু হলেও তার অগ্রগতি হয়েছিল খুব দ্রুত। সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেননি প্রথমে, কিন্তু হঠাৎ অমূল্যদা, সুধীর কাকা প্রভৃতির চেষ্টায় মেয়েদের স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হলো। তখন গ্রামে সে কি প্রাণস্পন্দন! ছোট ছোট বঞ্চিত মেয়েদের মুখে সে কি অফুরন্ত হাসি! মহকুমা হাকিম স্বয়ং এসে স্কুল উদ্বোধন করলেন। আরো এসেছিলেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। গ্রামের মেয়েরা শিক্ষা ও প্রেরণা পেলে কত ভালো কাজ করতে পারে তার ছবি সেদিনের সভায় অনেকেই শুনিয়েছিলেন। গ্রামের ছেলেরা এবং চাষীরা সমস্ত গ্রামটিকে ঝকঝকে তকতকে করে ভদ্রমণ্ডলীর প্রশংসার্জনে সক্ষম হয়েছিল। আজ আর সে স্কুলে ছাত্রী নেই, তবুও পূর্ব সুখস্মৃতি মুছে যায়নি মন থেকে।

বিপিনের রামায়ণ গান আর হেমুর ঢপ যাত্রার কথা আমাদের গ্রামের প্রত্যেকটি লোকেরই মনে থাকার কথা। এদের অনুষ্ঠান সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল গ্রামে। সমস্ত ময়মনসিংহ জেলায় বিপিনের মতো গাইয়ে ছিল না বললেই হয়। সেই সত্তর বছরের বুড়ো কি করে হনুমানের ভূমিকায় অতো জোরে লাফ দিতো তা আজো ভেবে পাই না! একাই সব ভূমিকা অভিনয় তার করায় ছিল বিশেষত্ব—একবার হনুমান হয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে আকাশ লক্ষ্য করে লাফ দেয়, পরক্ষণেই প্রভু রাম হয়ে তীরধনুক নিয়ে করে সমুদ্রশাসন, আবার পরমুহূর্তেই মিত্র বিভীষণ সেজে গান শোনায় বিপিন। তার গান লোকদের একাধারে হাসাতো এবং কাঁদাতো। পাতাল অধিপতি দুষ্ট মহীরাবণ নানা ছদ্মবেশে প্রতারণা করতে আসছে হনুমানকে, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হনুমানের কাছে বারবার মহীরাবণ হচ্ছে পরাজিত। অবশেষে বিভীষণের রূপ ধরে সে দুর্গে ঢুকে রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করে পালায় পাতালে। হনুমান প্রকৃত বিভীষণের গলা ল্যাজে বেঁধে চীৎকার করে বলে—'ওরে পাপিষ্ঠ রাক্ষস, তুই মোর প্রভুরে করেছিস হরণ! মারি তোর দূরিব প্রাণের জালা!' আবার পরক্ষণেই বিলাপবিধুর সুর শোনা যায়—'ওরে ভক্ত

হনুমান, এরই জন্যে কি দাদার সাথে করেছি কলহ।' এসব অভিনয় দেখে এমন কোন শ্রোতা থাকতো না যারা শুকনো চোখে বসে থাকতে পারতো। বিশ্বাসঘাতক মহীরাবণ আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, বিপিনের মতো গলাধাক্কা দিয়ে আজ তাদের কে সরিয়ে দেবে? কে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে সমস্ত মানুষকে সাবধান করে দেবে বিপিনের মতো? সিনেমা থিয়েটারের চেয়েও আকর্ষণীয় সেই গ্রাম্যযাত্রা আর কি কোন দিন শোনা ভাগ্যে জুটবে—যেতে পারবো কোনদিন ছেড়ে আসা গ্রামে, বিপিনের আসরে!

মনে পড়ে যোগেন্দ্রকে—পাগল ভবঘুরে হলেও আজ তাকেই বেশি করে মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও ঘুরে বেড়াতো চাষীপল্লীর প্রতিটি ঘরে। তাদের সুখদুঃখের খবর নিতো, তামাক খেতো, গল্প করতো প্রাণভরে। এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে বেচারীকে মাতব্বররা গ্রামছাড়া করেছিলেন একঘরে করে।

আর একটা ঘটনা ভাবলে এখনো হাসি চাপতে পারা যায় না।

যোগেন্দ্রের পাশের বাড়িতে থাকতো প্রসন্ন। একদিন প্রসন্ন চুপিচুপি যোগেন্দ্রের খিড়কি বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটছে, টের পেয়ে যোগেন্দ্র বাধা দিতে গেল, ফলে সুরু হলো হাতাহাতি। রাগ সামলাতে না পেরে প্রসন্ন হাতের কুড়োলের হাতলি দিয়ে আঘাত করলো যোগেন্দ্রের মাথায়, যোগেন্দ্রও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও বসিয়ে দিলো প্রসন্নের পায়ে এক লাঠি। মামলা হলো প্রসন্নের অভিযোগে। নেত্রকোণায় তখন মুন্সেফ ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার। হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে আসামী জবাব দেয়—'হুজুর, ব্যাপারটা এই যে, শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবু আমার দাদা হন। দাদা হিসেবে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করতে পারেন সে কথা একশবার স্বীকার করবো। তাই দাদা যখন ভাইয়ের মাথায় অমানুষিকভাবে আশীর্বাদ করলেন তখন বাধ্য হয়েই আমাকেও দাদার শ্রীচরণে প্রণাম জানাতে হলো। তবে সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রণামটা আগে হওয়াই উচিত ছিল!' মনে পড়ে সেদিন সমস্ত কোর্ট ঝলমলিয়ে উঠেছিল হাসির গমকে।

আমাদের গ্রামটি ছিল হিন্দুপ্রধান। দূরে মুসলমানপাড়া থেকে তারা আসতো ধান কিনতে, কিংবা দেনাপাওনার ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু যার সংগে আন্তরিকতা ছিল

সারা গ্রামের সে হচ্ছে দাস্থ ফকির। মুসলমান হয়েও হিন্দুর আচার-ব্যবহারে সে শ্রদ্ধাশীল। তন্ত্রমন্ত্র, ভূত তাড়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে তার হাত ছিলো পাকা। তেলপড়া, জলপড়া দিতে নিত্যই তাকে আসতে হতো আমাদের গ্রামে। তার দেওয়া মাদুলি আজো আমার শরীরে শোভাবর্ধন করছে! ফকিরের অবাধ যাতায়াত ছিল সব বাড়িতেই। 'ছেলে কেমন আছে গো' বলে ঢুকতো সে বাড়ির মধ্যে—তারপর চলতো তাকতুকের মহড়া! বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দিয়েই সে রোগ তাড়াতো, দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তার কাণ্ডকারখানা আজকেও বিস্ময় জাগায়। জিন্ গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে সে আমাদের বাড়িমুখো এগুতেই তাকে সেবার প্রশ্ন করেছিলাম—'এ বছরটা কেমন যাবেরে দাস্থ ফকির?' অসংকোচে গম্ভীর হয়ে সে জবাব দিয়েছিল—'খুব দুর্বছর। তুফান হবে, কলেরা-বসন্তে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। মহামারী লাগবে দেখো কি রকম জোর।' অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। সেবারই গাঁ উজাড় হয়ে গেল—বাংলাদেশে মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে এসে মৃত্যুবন্যায় ভেসে গেল! তখন ভাবিনি এমন ভাবে দেশ ভাগ হয়ে দাস্থ ফকিরের কথা সত্যি প্রমাণিত হবে।

গ্রামের সব চেয়ে আনন্দের দিন ছিল দুটি—একটি শ্রাবণী সংক্রান্তি, অপরটি চৈত্র সংক্রান্তি। সাপের ভয়ে পূর্ব বাংলার গ্রামবাসীরা সর্বদাই ভীত। প্রতি বছর সাপের কামড়ে মারা যায় বহু লোক। তাই মা মনসাকে তুষ্ট করার জন্যেই প্রতি বাড়িতে ব্যবস্থা হয় মনসা পুজোর। সামর্থ্যানুযায়ী পুজোর আয়োজন। হাঁস, পাঁঠা, আর কবুতর বলি থেকে কুমড়ো পর্যন্ত বলি দেওয়া হতো। অতি প্রত্যূষেই ছেলেরা বিছানা ছেড়ে জমা হতো খালের ধারে। সূর্যকিরণে খালের জলের ঢেউ চিক্‌চিক্ করছে, দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট নৌকো। ছেলে বুড়ো খালের জলে ডুব দেয়, ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে উঠে বসে। হাত চালিয়ে শাপলা ফুল তুলে নৌকো নেয় ভরে। ফিরে এসে সব বাড়িতে বাড়িতে সে ফুল ভাগ করে দেয় তারা। পুজোর ফুলের জন্যে ভাবতে হয় না কাউকেই। যে বাড়িতে পুজো নেই তারাও ফুলের ভাগ থেকে বাদ পড়ে না। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে আরম্ভ হয় মনসা পুজো। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। ছেলেরা মহা উৎসাহে বাজনার মহড়া দেয়, কাউকে ডাকার

প্রয়োজন নেই, মান-সম্মানের কোন বালাই নেই, সকলেই আসে স্বেচ্ছায়। ছেলেদের হাতে দেওয়া হয় নাড়ু। এরই মধ্যে মিশে রয়েছে আন্তরিকতার সুর। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষেও সেই একই মিলনের সুর বেজে উঠতো পল্লীজীবনে কিন্তু আজ আর সে সুর নেই, বেসুরো জীবন অনির্দিষ্টের পথে এগিয়ে চলেছে।

অদূরে কংস নদীর কূলে কূলে কতো প্রান্তর, কতো অরণ্য—মাঝে মাঝে এক একটি পল্লী-প্রতিমা। নদীর তীরে নিত্য আসে তরুণ রাখালেরা গরু-মোষ চরাতে। পাশে অরণ্য, ধূঁ ধূঁ প্রান্তর—ভয় লাগে তাদের মনে। অজ্ঞাত প্রিয়-বান্ধবীর গাওয়া গান সুর ধরে গাইতো তারা—

'মইষ রাখ মইষাল বন্ধুরে কংস নদীর কূলে,
(অরে) অরণ মইষে খাইব তোরে বাইন্ধা নিব মোরে।'

নির্জনতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যেতো রাখালের সেই গানে, ভয়-ডর সব দূর হয়ে যেতো মন থেকে। বন্ধুর জন্যে কী আকুলতাই না ফুটে উঠতো সে গানে সে সুরে! আজ আমরা যারা দেশছাড়া হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি তাদের জন্যে কোন প্রতিবেশী বন্ধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে জানতে পারলে এ দুঃখের মধ্যেও কতো শান্তি পাওয়া যেতো!

কতো কথা, কতো ব্যথা আজকে মনকে ভারাক্রান্ত করছে—সমস্ত আন্তরিকতা, সহৃদয়তার এমন সলিল- সমাধি হবে কে জানতো! শ্রীদাম ধোপীর অকালমৃত্যু বা অনিলদার আকস্মিক জীবনাবসান সমস্ত গ্রামের চোখে জল এনেছিলো একদিন, আর আজ সমস্ত বাঙালী জাতির অপমৃত্যুতেও কারো ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে মন অবশ হয়ে আসছে।

কালীহাতী

প্রভাতের আরক্ত তপন পূব আকাশে উঁকি দেন—ধরণীর মুখের উপর হতে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়ে যায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন মহানগরীর বুকে জাগরণের সাড়া পড়ে। সুরু হয় কর্মক্লান্ত জীবনের পথে দিবসের পথচলা। ছন্নছাড়া অভিশপ্ত মানুষের দল ভীড় করে রাস্তার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় অন্তহীন তমিস্রার মাঝে সমুখের উদীয়মান পথরেখা।

কোলাহল-মুখরিত নগরীর বুকে আমারও আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সুরু হয় লক্ষ্যহীন পদক্ষেপ। প্রভাতের নবারুণ আমার অভিশপ্ত জীবনে আনে না কোন নতুন আশার আলো, শোনায় না কোন উদ্দীপনার অগ্নিমন্ত্র। সে যে পথভ্রষ্ট জীবন-পথে ছন্দহীন পথচলা। কর্মহীন বেকার জীবনে মনের খোরাক নিঃশেষ হয়ে আসে—জীবনীশক্তিও শেষ হতে চায় বুঝি! সীমাহীন দুঃখের মধ্যেও মনের কোণে ঝংকার তোলে শুধু অতীতের গর্ভে বিলীয়মান দিনগুলোর মধুময় স্মৃতি। পশ্চাতের অতিক্রান্ত পথের বুকে ছোট বড়ো পদচিহ্নগুলো আমার মিশে আছে সুদূর অতীতের পাতায় পাতায়—ফেলে বুকের পরে। তারা টানে—আমায় নিরন্তরই টানে।

লোকে বলে—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নই আমি। কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়সী পল্লীজননীর স্নেহের আস্বাদ পেয়েছি —খুব বেশি করেই পেয়েছি। তাই তাকে ভুলতে পারি না—কল্পনাও করতে পারি না ভুলে যাবার। ভাবতে গিয়ে হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে—পল্লীমায়ের কোল হতে বিচ্যুত হয়ে যাবার কথায়। বেদনাবিধুর হৃদয়ের বেলায় বেলায় 'আছাড়ি বিছাড়ি' পড়ে শত সহস্র বিক্ষুব্ধ তরংগরাশি।

লক্ষ লক্ষ গ্রামে গাঁথা এই বংগভূমি। এরই শতকরা নিরানব্বুইটা গ্রামের মতো অতি সাধারণ—অতি নগণ্য আমার পল্লীজননী। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ী

আসন করে নেবার মতো মূলধন নেই তার—পারেনি কোন মহামানবের জন্ম দিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে। তবু তাকে ভালোবাসি—শত দোষ ত্রুটি, শত দীনতা সত্বেও প্রাণের চাইতে ভালোবাসি আমার পল্লী-জননীকে। এর আম্রবীথি ঘেরা ঝিঁঝিঁ-ডাকা ধূলিধূসর পথের প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমার পরিচিত, আমার অতীত স্মৃতি রয়েছে বিজড়িত হয়ে পথিপার্শ্বস্থ প্রত্যেকটি বৃক্ষের পত্রপল্লবে। তাই আমার পল্লী-মায়ের কথা স্মরণ করে শতযোজন দূরে বসেও আমার হৃদয় হয়ে ওঠে এক অপূর্ব মধুর রসে আপ্লুত।

গ্রামের দুদিক বেষ্টন করে রেখেছে সমকোণীভাবে ক্ষীণকায়া একটি ছোট নদী। নদী বলা চলে না ঠিক,—একটা বড়ো খাল বললেই যথেষ্ট। তবু আমরা একে বলে এসেছি নদী। ফটিকজানি। চৈত্র মাসে জল শুকিয়ে যায়—হাঁটু জলের বেশি থাকে না। নদীর নামকরণ নিয়ে মাথা ঘামাইনি, ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের অভাবে অনুযোগও করিনি কোনদিন। বর্ষার দিনে দুকূলপ্লাবী স্রোতস্বিনীর কর্দমাক্ত জলের বুকেই ঝাঁপিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গা ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে উঠেছি গিয়ে শ্মশানঘাটে, কালীবাড়িতে, কোনদিন বা খেয়াঘাটে।

উত্তরপাড়ার সেনেদের বাঁধানো ঘাটে দুপুর বেলায় ভিড় জমতো পাড়ার মেয়েদের। সত্তর বছরের বুড়ি ঠাকুমা থেকে সুরু করে পাঁচ বছরের নাতিনাতনী খেঁদি, পটলা, খুকি পর্যন্ত। স্নান করতে করতে চল্‌তো কতো হাসি, কতো গল্প, কতো রঙ্ তামাসা। মায়েরা বাচ্চাদের ধরে ধরে জোর করে সাবান মাখাতে বসতো—আর সেই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সমবেত কান্নায় ঘাটের আকাশ বাতাস উঠতো মুখরিত হয়ে। তারই মধ্যে যতো রাজ্যের চলতো গল্প। 'অ দিদি, কি রান্না হলো আজ?' 'কি যে করি ভাই, ছোট খুকিটার কদিন থেকে জ্বর হচ্ছে। ছাড়ছে না কিছুতেই।' 'ও মা! তাই নাকি! পোড়ামুখো কি আবার ষাট বছরে বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি?' এমনি আরো কতো শত কথা।

বর্ষায় স্ফীত ফটিকজানি দুকূল ভাসিয়ে দিতো মাঝে মাঝে। মনে পড়ে কী অপরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করতো জ্যোৎস্নাস্নাত তটিনীর অতুলনীয় রূপ-মাধুরী।

অপূর্ব মোহাবেশের বিস্তার করতো ফটিকজানির সেই শৈশবরূপমাধুর্য। কতো চাঁদিনী রাতে ডিঙি ভাসিয়ে দিয়েছি আমরা ফটিকজানির সেই শান্ত সমাহিত বুকের 'পরে! বাঁশির সুরে ভরে দিয়েছি নিশীথের আকাশ বাতাস। জ্যোৎস্নাবিধৌত পল্লীর অপরূপ রূপের তুলনা নেই কোথাও। রূপকথায় শোনা স্বপনপুরীর রূপমাধুর্যও হার মানে তার কাছে। গাঁয়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন ছিলাম ডানপিটে। কতো নিশুতিরাতে দলবেঁধে আমরা মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে অভিযান করেছি খ্যাতনামা সাতবিলের দিকে। কতো কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল এই বিলের নামে! অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, অশরীরী কতো আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায় সাতবিলের বুকের ওপর দিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী কতো মৎস্যশিকারীর মুখে শুনেছি এ সব কাহিনী— অবাক হয়ে গিয়েছি রাম নামের অত্যাশ্চর্য মহিমায়—তখন বিশ্বাস করেছি তাদের সে সমস্ত অতিরঞ্জিত কল্পিত ভয়-কাহিনী। মনে পড়ে রামকান্ত মাঝির কথা। আমাদের প্রজা ছিল সে। আমাদের বাড়ির পাশেই বাড়ি। কতো রাত্রি জেগে যে রামকান্তদার কাছে বসে এই সমস্ত মৎস্যলোভী অশরীরীদের গল্প শুনেছি তার হিসেব নেই। জাল বুনতে বুনতে গল্প বলতো রামকান্তদা। তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা নাকি সে সব। আমার শিশুমনের ওপর সে কাহিনীগুলো বিস্তার করতো এক অপূর্ব মায়াজাল। তারপর বড়ো হয়ে কতোদিন অভিযান করেছি অপদেবতা অধ্যুষিত সাতবিলে—যোগী-মারা দহের স্থির শুভ্র জলরাশির ওপর দিয়ে। কিন্তু কোনদিনই সৌভাগ্য হলো না সেই অশরীরী আত্মাদের দর্শন লাভের; কোন অবগুণ্ঠনবতী রমণী কোনদিন আমার কাছে এসে আনুনাসিক সুরে প্রার্থনা করলো না মাছ। মধুর সে সমস্ত দিন গুলোর স্মৃতি কি করে ভুলবো?

গ্রামের প্রধান অংশ মুন্সীপাড়া। বনেদী জমিদার এ পাড়ার প্রধানরা। বাড়িগুলো এদের পড়ে আছে আজ পরিত্যক্ত মরুভূমির মতো। আগাছার ঝোপ-ঝাড়ে ভরে আছে গ্রামের রাস্তাঘাট। দিনের বেলায়ই ভয় হয় পথ চলতে। এমনটি কিন্তু ছিল না কোনদিন।

মুন্সীদের উদ্যানের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েই পৌঁছতে হয়

ভাংগা-পুলের বুকে। সাহাপাড়ার মধ্যে অবস্থিত সে পুলটি। সংকীর্ণ একটি খালের মধ্য দিয়ে গাঙের জলরাশি এসে আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে ঐ পুলের তলদেশে। শত শত আবার্তের সৃষ্টি করে বয়ে যায় বাঁশঝাড়ে রচিত তোরণের মধ্য দিয়ে কর্মকার পাড়ার দিকে। অপরাহ্নের পরন্ত রোদে গাঁয়ের ছেলেদের আড্ডা বসতো পুলের ওপর—গল্পে, উচ্চ হাসিতে, হৈ-চৈ-তে কেটে যেতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পৃথিবীর বুকে নেমে আসতো ক্রমে রাত্রির যবনিকা।

কামারপাড়ার বাঁশঝাড়ে ঢাকা গতিপথে গিয়ে খালটি মোড় ফিরেছে পদ্মিনী বুড়ির বাড়ির কাছে। ফিরে বইতে স্থরু করেছে সাতুটিয়ার পুলের দিকে। মনে পড়ে পদ্মিনী বুড়ির কথা। কতো দিন স্কুল পালিয়ে হানা দিয়েছি বুড়ির কাশীর কুল-গাছে—কাঁচা-মিঠে আম গাছে। কাংস্য কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে দৌড়ে এসেছে বুড়ি—ভগবানের কাছে আবেদন করেছে আমাদের চৌদ্দপুরুষের কায়েমী নরকবাসের জন্যে। পঞ্চাশ সালে গলে পঁচে মারা গেল পদ্মিনী বুড়ি অশেষ কষ্ট পেয়ে।

মনে পড়ে আজ হেমন্তের অপরাহ্নে পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরুতাম—সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের মধ্য দিয়ে কোনদিন মেঘখালির পুলের উদ্দেশ্যে, কোনদিন বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে অনির্দিশের পানে। দুধারে প্রসারিত ছিল শ্যামল বংগজননীর এক নয়নাভিরাম রূপ। মেঘশূন্য নীলাকাশের বুকে লাগতো বিদায়ী অরুণের রক্ত-রাঙা-অনুলেপন, ঘাটে-মাঠে-বাটে লাগতো অস্ত রাগের ছোঁয়া। হারিয়ে গেছে সে দিনগুলো হারিয়ে গেছে চিরতরে। বন্ধুরাই বা কে কোথায় হারিয়ে গেল জীবনস্রোতের কুটিল আবর্তে কে বলবে?

গ্রামের একটা প্রধান অংশ কালীবাড়ি। নদীর পাড়ের এই কালীমন্দিরটির কথা শুনে এসেছি ছোটবেলা থেকেই। জাগ্রতা কালীমাতা। কতো অলৌকিক কাহিনীর জনশ্রুতি প্রচলিত এই কালী প্রতিমা সম্বন্ধে। নিশুতি রাতে লাল পেড়ে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে নাকি দেখা যেতো কাকে এই কালীবাড়ির বাঁধান চত্বরে, কিন্তু চরম দুর্দিনে পাষাণী মা পাষাণীই রয়ে গেল!

বেশি দিনের কথা নয়। বছর খানেক আগেও হরিসংকীর্তনে, যাত্রাগানে

এই মন্দির প্রাংগণ উঠ্‌তো মুখরিত হয়ে। তাতে কুণ্ঠিত হয়নি মুসলমান জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে। কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা রাধার দুঃখে তারাও হিন্দু শ্রোতাদের মতো সমানভাবে ফেলেছে সমবেদনার অশ্রুরাশি। তখন তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি এই আত্মঘাতী মনোবৃত্তি। পদ্মপুরাণের গানে, কথকতার আসরে, রামায়ণ গানে, ত্রৈলোক্য ঠাকুরের মেলায় এরাও নিয়েছে মুগ্ধ শ্রোতার অংশ। সমান ভাবেই পদ্মপুরাণের গানে তারাও ধুয়া ধরেছে—'বেউলা বলে লখিন্দর, পূর্বকথা স্মরণ কর।' সানন্দেই তারা গ্রহণ করেছে ত্রৈলোক্য ঠাকুরের প্রসাদীগঞ্জিকার অংশ, উচ্চ কণ্ঠে গান ধরেছে ভক্তবৃন্দের সংগে—'ত্রৈলোক্যের মেলারে ভাই যে করিবে হেলা। হস্ত যাবে, পদ যাবে, চোখে বেরুবে ঢেলা।' হস্তপদ যাওয়ার ভয়েই হোক বা হিন্দু ভাইদের সংগে সম্প্রীতির ফলেই হোক ত্রৈলোক্য ঠাকুরকে অবহেলা করেনি তারা। কল্পনাও করেনি কখনো তারা হিন্দুদের প্রতিমা ধ্বংসের কথা। সেদিনগুলোর কথা আজ মনে হয় বুঝি বা স্বপ্ন। কৈশোরের লীলা নিকেতন পল্লী মায়ের বুকে যাদের সাহচর্যে সুরু হয়েছিল আমার জীবনের প্রথম পথচলা—তারা সবাই হারিয়ে গেছে আজ। দুর্যোগময়ী রজনীর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পথমাঝে তারা ছিটকে দূরে গড়িয়ে পড়েছে শত যোজনের ব্যবধানে। কেউবা তাদের পথ খুঁজে পেয়েছে—কেউ বা পথ খুঁজে মরছে এখনো।

মহেশদাকে মনে পড়ে। এক মুখ দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন বেঁটে কালো লোকটি। সদাহাস্যময় মুখ। গ্রামের সব কাজে অগ্রণী। আমাদের সর্বজনীন 'দাদা'—সকলেরই শ্রদ্ধেয়। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায় পৌছেছে, দেহের বাঁধন অটুট। কালীবাড়ির বার্ষিক উৎসবে চাঁদা তোলার ব্যাপারে—রাতজেগে পাহারা দেওয়ার জন্যে সখের রক্ষী দলে পেতাম মহেশদাকে আমরা সর্বাগ্রে। খুবই উৎসাহ ছিল বৃদ্ধের। পাহারা দেবার সময় হাঁক দেওয়ার ব্যাপারে জুড়ি ছিল না তাঁর। লাঠিটা সোজা করে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিতেন মহেশদা—'বস্তিওয়ালা জা—গ—রে।' আমরা বলে উঠ্‌তাম সব—'হে—ই—ও।' এখনো আছেন মহেশদা। তবে নিশুতি রাতে গ্রামের বুকে তার খড়মের শব্দ এখনো ধ্বনিত হয় কিনা তা বলতে পারি না।

মনে পড়ে কালবৈশাখীর চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব-মুখরিত দিনগুলোর কথা। রাত জেগে বাবার চোখ এড়িয়ে দেখতে যেতাম গাজনের মেলা। গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ সঙ্ সেজে করতো কতো উৎকট আনন্দের পরিবেশন। অনেক সময় শ্লীলতার সীমা যেতো ছাড়িয়ে। তবু কী আনন্দই না পেতাম সেই গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে! জিহ্বা ফুটো করে লোহার শিক ঢুকিয়ে উৎসব প্রাংগণে নৃত্য করতো সেইসব পুজারীর দল। সারারাত জেগে শ্মশানে গিয়ে দেখতাম কালী হাজরার 'রাতের ভোগে'র উৎসব। ভোর বেলায় জাগরণ ক্লিষ্ট দেহে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়তাম বিছানায়। অবাক হয়ে যেতাম 'কেতু সন্ন্যাসী'র দেহে দেবতার আবির্ভাবের উত্তেজনায়। কী মধুর, কী আনন্দময় মনে হতো সে কালটা!

বিজয়া দশমীর কথা ভুলবো কি করে? ফটিকজানির বুকে আশে পাশের সমস্ত গ্রাম থেকে এসে জড়ো হতো প্রতিমা। খেয়াঘাট থেকে স্বরু করে এ পারের জেলে-পাড়ার ঘাট পর্যন্ত ভরে যেতো নৌকোয়-নৌকোয়। তিলধারণের ঠাঁই থাকতো না সারা নদীতে। নৌকোর ওপরে চলতো নাচ-গান, লাঠি খেলা, সংকীর্তন—আমোদ উৎসবের হৈ-হুল্লোড়। গাংগের বুক মথিত হয়ে উঠ্তো বাইচ খেলার নৌকোর তাণ্ডব নর্তনে। সেই বাইচ খেলায় বেশির ভাগ অংশই গ্রহণ করতো মুসলমানরা। কারণ সেদিন তো আর দেখা দেয়নি আকাশ জোড়া ভেদ-বৈষম্য!

আশপাশের গ্রামের প্রায় সমস্ত নিরীহ মুসলমান কৃষকদের সংগেই ছিল আমাদের অকৃত্রিম হৃদ্যতা। তারি ভাইএর কথা মনে পড়ে। অশীতিপর বৃদ্ধ তারি ভাইএর সংগে যখনই দেখা হতো পথের মাঝে জিজ্ঞেস করতাম—'কেমন আছ তারি ভাই?' ভালো করে চোখে দেখতো না সে। শব্দ লক্ষ্য করে কাছে এসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে ঠাহর করে নিয়ে বলে উঠতো—'কে ভাই? অ, নাতিঠাকুর! এই এক রহম আছি। তা তুমি কুঠাই যাবার লাগছ নাতিঠাকুর?' তারপর সেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই চলতো এ গল্প, সে গল্প, তার ছেলেদের দুর্ব্যবহারের কথা। তারপর ঠক্ ঠক্ করে আবার চলতো সে গন্তব্য স্থলের দিকে। এখনো বেঁচে আছে তারি ভাই। গাঁয়ের বুকে এখনো বোধহয় তার লাঠি ঠক্ ঠক্ শব্দে ঘুরে বেড়ায়।

আর একজনের কথা মনে পড়ে। ফজু ঢুলি—গ্রামের চৌকিদার। রাস্তায়

যখনই দেখা হতো তার সংগে, আভূমি নত হয়ে বলে উঠতো ‘সেলাম, কর্তা সেলাম।’ হেসে জিজ্ঞেস করতাম—‘ভাল আছ?’ সে আবার সেলাম করে বলে উঠতো—‘আজ্ঞে, খোদায় রাখছে ভালই।’ মনে পড়ে কতো রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতো তার পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে—‘কর্তা, জাগেন?’ তারা তো আজো আছে। আজো বোধহয় ফজু চৌকিদার তার টিম্ টিমে লণ্ঠনটি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় নিশুতি রাত্রে পল্লীর রাস্তায় রাস্তায়—নিশীথের নিস্তব্ধতা ভেদ করে তার কাংস্য কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—‘বস্তিওয়ালা জা—গ—রে।’ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া এক শিশু হয়তো চীৎকার করে কেঁদে ওঠে কোন বাড়িতে। উৎকট চীৎকারে বিরক্ত হয়ে একটা নিশাচর পাখি হয়তো উড়ে যায় এগাছ থেকে ওগাছে ডানার ঝটপটানিতে অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ জানিয়ে।

এমনি আরো কতো শত পরিচিত মুখ মনের দুয়ারে উঁকি মারে। এরা যে ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের সংগে গভীরভাবে জড়িত।

এই আমার পল্লীজননী ময়মনসিংহ জেলার টাংগাইল মহকুমার কালীহাতী গ্রাম। আমার পিতৃপিতামহের ভস্মাবশেষ মিশে রয়েছে ধূলিধূসর এ গাঁয়েরই মাটির সংগে। সপ্তপুরুষ আমার এরই বুকের ওপর হয়েছে লালিত পালিত।

তাই তো এখনো ভালোবাসি, শত মাইল দূরে বসেও স্মরণ করি আমার সেই গ্রামকে, আমার সেই পল্লী-জননীকে। পেছনে ফেলে আসা সেই ধূলিধূসরিত আম্রবীথি-ঘেরা ছায়াসুশীতল বনপথকে কি করে ভুলব? সে পথের বুকে আমার পিতৃপিতামহের চরণধূলি মিশে আছে অণুতে অণুতে। সমুখের পথে পাইনা কোন আলোর হাতছানি, তাই তো পেছনের অতিক্রান্ত পথ আমায় ডাকে—কেবলই ডাকে। অমোঘ আকর্ষণ সেই আহ্বানের। অথচ আমার দ্বরুদ্ধ সেখানে, তাই সাড়াও দিতে পারি না সে আহ্বানে। স্বর্গাদপি গরীয়সী পল্লীমায়ের আকুল আহ্বান প্রতিহত হয়ে ফিরে ব্যবধানের প্রাচীর গাত্রে—ফিরে যায় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে। ভুলতে পারি না তাঁকে—ভুলতে পারবোও না কোনদিন! মনে পড়ে নিরন্তরই—‘সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া।’

সাঁকরাইল

সূর্যাস্তের পানে তাকিয়ে সূর্যোদয়ের কথা ভাবা ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা আজ? জীবন থেকে সূর্যালোক চলে গিয়ে সমস্ত কিছুকে অন্ধকার ব্যর্থতার মধ্যে ঢেকে দিয়েছে। তবু আমরা আলোর পূজারী। আলোকের ঝরণা ধারায় জীবনকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী। জীবন মধুর হোক, আলোকময় হোক, আনন্দময় হোক এ কে না চায়! মহামরণকে মহাজীবনে পরিণত করার মন্ত্র আপাতত আমরা ভুলে গেলেও হতাশ হবো না। জীবন যৌবন দিয়ে পূর্বসূরীদের মহামিলনের গান আমরা গেয়ে যাবো। জানি না আত্মবিস্মৃত মানুষ কবে মিলনের গান গ্রহণ করতে পারবে আবার!

আমার গ্রামের কথা মনে পড়লেই কবি গোবিন্দদাসের ঘর ছাড়ার কথা মনে পড়ে। তাঁর গৃহত্যাগের কবিতা আমাদের জীবনকেও যথাযথ রূপ দিয়েছে যেন:

'কোথা বাড়ি, কোথা ঘর কি শুধাও ভাই,
যে দেশে আমার বাড়ি আমি সে দেশের পর—'

সত্যি, আমার যে দেশে বাড়ি, আমি সে দেশের অনাত্মীয় আজকে। ঘর আছে, গ্রাম আছে, সম্পত্তি আছে অথচ আজ আমি উদ্বাস্তু। বাস্তুত্যাগীর দুঃখ হৃদয়বান না হলে উপলব্ধি করা সহজ নয়। দুস্তর দুঃখের সমুদ্র মন্থন করে আজ যে বিষ উঠেছে দেশময়, আমরা তা পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছি! অমৃতের পুত্রদের আর সুখ নেই—সুখ, স্বস্তি, শান্তি, প্রেম-ভালবাসা দেশত্যাগী হয়েছে আমাদের সংগে সংগেই! চারদিকে কুটিলচক্রান্তের কলুষিত ছবি,—সেই পূর্বদিনের সুখীস্বচ্ছল মানুষের এবং গ্রামের চিত্র কোথায় অন্তর্হিত হলো? মানুষ সুসভ্য হয়েছে শুনতে পাই, কিন্তু এই কি সভ্যতার রূপ? এই জন্যেই কি এতো সাধনার প্রয়োজন ঘটেছিল? কোথায় গেল সে প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, নির্লোভ

নিষ্ঠুরতার প্রতীক ? কে হরণ করলো আমাদের সদ্‌গুণগুলো ? এই কি সভ্যতার সংকট থেকে আমরা কবে পরিত্রাণ পাবো ?

জানি এসব সাময়িক বর্বরতা আমাদের জীবনযাত্রার পথে ছলনা নিয়ে এসে ক্ষণিকের জন্যে আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা সে মোহের জালে ধরা দিলাম কেন ? মানুষের আদি নারী-পুরুষ 'আদম-ইভের সংকট' কি আবার দেখা দিলো বিংশশতাব্দীর শেষার্ধে ? আবার কি শয়তান কুটিল সাপের ছোবলে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলো ? কেন এই মতিভ্রম, কেন এই পদস্খলন, কেন এইভাবে মানুষ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করছে পরের ধার করা পরামর্শ শুনে ?

আমাদের গৈরিকধূসর বৈরাগ্যমন তো কখনো আক্রমণাত্মক ছিল না ? লোভের হাতধরা হয়ে কখনো তো সে কোন নিরীহের প্রাণহরণ করে নি ! সামান্য তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়েই দিন যাপন করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা, তবুও প্রতিবেশী রাজার রাজত্বের দিকে লোভার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি—তবে সে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হলো কেন আমাদের ? কোন্ পাপে মানুষ আজ হানাহানিতে মত্ত—ভ্রাতৃরক্তে তার কেন এতো তৃপ্তি ? মানুষ মানুষকে আজ বাঘের চেয়েও বেশি ভয় করছে দেখে হতাশ হয়ে পড়ছি ! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো বলে গেছেন—, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' গুরুদেব যে মানুষের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন সে মানুষ আজ কোথায় ?

বহুদিন মাকে হারিয়েছি কিন্তু আজ হারালাম জননী জন্মভূমিকে। আমার জন্মভূমি আজ আর আমার নয়। তবু তাঁর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জড়িয়ে রয়েছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। মনের ভেতর একটি ছবিই সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে—সে ছবি আমার তীর্থভূমির, আমার ছেড়ে আসা গ্রাম সাঁকরাইলের। ময়মনসিংহ জেলার টাংগাইল মহকুমার সাঁকরাইল গ্রামকে আমি কোনদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো না। তার সুখদুঃখ যে আমার সুখ দুঃখের সংগে একাকার হয়ে গেছে ! আমি তার কথা ভুলতে চাইলেও সে আমাকে ভুলবে না—নির্জনস্বাক্ষর উজ্জল

হয়ে মনকে সততই প্রশ্নজালে জর্জরিত করবে! শহর থেকে দূরে নির্জন গ্রামখানির এতো মোহিনীশক্তি একথা আগে কে জানতো?

রাত্রের অসতর্ক মন যখন কল্পনার ডানা বিস্তার করে, তখনই মনে পড়ে যায় আমার গ্রামখানির কথা। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে হায় হায় করে ওঠে মন তার কথা চিন্তা করে! ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলেও ছেলেরা মাকে ভাগ করতে পারে জানতাম না, আজ দেখছি সব কিছুই সম্ভব মানুষের স্বার্থের কাছে! মাকেও আজ মূর্খ আমরা ভাগের মা করে ছেড়েছি!

যেখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকতো সে গ্রাম আজ খাঁখাঁ করছে মানুষের অভাবে। জংগলে ভর্তি হয়ে গেছে উঠোন, লক্ষী আজ গ্রাম ছাড়া! শুনেছি দিনদুপুরেই শেয়াল ডাকে আমাদের বাড়ির মধ্যে—নির্ভীক তাদের পদক্ষেপ, বিস্তৃত তাদের বিচরণভূমি। যে-বনে সিংহকে মানায় সেখানে শৃগাল রাজা হয়ে বসেছে! মনে পড়ছে অতীত আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো তিনপুরুষের চকমিলানো দালান, পুজোমণ্ডপ, দিগন্তপ্রসারী আম কাঁঠালের বাগান,—শান্তির নীড় হাতছানি দিয়ে ডাকলেও সেখানে যাবার উপায় নেই আজ। দুঃখ হয় নিজবাসভূমিতে আজ আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি ভেবে! আশার দীপগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে চোখের সামনে! হাসি পায় ভেবে যে, এই আমরাই বিজয়সিংহের বংশধর—আমরাই হেলায় লংকা জয় করেছিলাম! একটা পাগলামিকে যাদের রোধ করার ক্ষমতা নেই তারা দেশজয়ের গর্ব করে কি করে?

মন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে অতীত-বর্তমানের হিসেব-নিকেশে, কিন্তু কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসেব করতে মন আর রাজী নয়। সে চায় শান্তি, সে চায় আশ্রয়, সে চায় আশে পাশে দরদী মানুষ। কোথায় গেল সে সব মানুষ যারা পরার্থে জীবন বিসর্জনেও পরাঙ্মুখ ছিল না। নিজের স্বার্থ যাদের কাছে বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল অন্যের নিরুপদ্রব জীবন। শ্বাপদসংকুল জনপদে তাই আমরা পদে পদে বিপর্যস্ত, প্রাণ বাঁচলেও মান বাঁচানো চলছেনা আর!

সিরাজগঞ্জের ঘাটে নেমে যমুনা নদী পাড়ি দিতে হতো ফেরীতে, তারপর নৌকোযোগে যেতে হতো আমাদের গ্রামে। নদীর বুকে সূর্যোদয়ের জীবন্ত ছবি

আজ অন্ধকারেও স্পষ্ট মনে পড়ে। রাঙাবরণ তরুণ তপন আশা নিয়ে আকাশের গায়ে যখন দেখা দিতো তখন আমার মাথা আপনি তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। নদীর জলে পেয়েছি জীবনকে আর যৌবনকে পেয়েছি সূর্যের মধ্যে,—জীবনযৌবন সেদিন আমাকে অশ্বমেধের বেপরোয়া ঘোড়ার গতি জুগিয়েছে—অশান্তমন লাগামহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে যত্রতত্র। আজো তো সবই আছে, কিন্তু সে গতি শ্লথ হলো কেন? ছ্যাকরাগাড়ির মতো ক্লান্তপায়ে কতোদূর এগিয়ে যেতে পারবো? তরুণ সূর্যের আলোতে সেদিন মাঝি-মাল্লারাও মনের খুশিতে গান ধরতো দাঁড় বাইতে বাইতে। সে ভাটিয়ালি গান দেহতত্ত্বের রসে সঞ্জীবিত ছিল। গানের তালে তালে ছোট ছোট ঢেউ কেটে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা মনে করলে নিজেকে আর সামলাতে পারি না।

সিরাজগঞ্জের হোটেলে ইলিশমাছের ঝোল-ভাত সেদিন যা খেয়েছি তার স্বাদ যেন আজো মুখে অমৃতের মতো রয়েছে লেগে। হোটেলওয়ালাদের দুষ্টুমির কথা মনে পড়লে হাসি পায়। যাত্রীরা খেতে বসলেই তারা স্টিমার ছেড়ে যাচ্ছে বলে ভয় দেখাতো, ফলে কম খরচে তাদের হতো বেশি লাভ! মনে পড়ছে সেবার এক যাত্রীকে ঐধরণের ধাপ্পা দিতে গিয়ে হোটেলওয়ালাই ভীষণ জব্দ হয়ে যায়! সে শেষ পর্যন্ত হোটেল ফাঁক করে তবে হোটেল ছাড়ে! কতো খুঁটিনাটি কথাই মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আজ।

দেশে পৌঁছে ছোট ভাইবোনেদের সংগে পুকুরে মাতামতি করার দৃশ্যটি পর্যন্ত আজ ভুলে থাকবার উপায় নেই। চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত জল থেকে উঠতাম না—কাদাঘোলা জলে পানকৌড়ির মতো ডুব দিয়ে চোর-পুলিশ খেলতাম জলের মধ্যে। সে দিনগুলোই ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। আমাদের জীবন থেকে সে দিনগুলো কোথায় গেল? শান্তিবারি কার অভিশাপে অনলবহ্নিতে রূপান্তরিত হলো?

পূজোর ছুটিতে বাড়ি যাবার তোড়জোড় চলতো মাস দুয়েক আগে থেকেই। প্রতিজনের নতুন জামা কাপড় জুতো কিনে বাড়ি যাবার কথা মনে পড়লে আজো রোমাঞ্চ লাগে শরীরে। রাস্তায়-ট্রেনে, স্টিমারের পথ-কষ্ট এবং ক্লান্তি নিমেষেই

কেটে যেতো ঠাকুমা, মা, জ্যেঠিমা, পিসিমা এবং ছোট ভাইবোনদের মধ্যে গিয়ে হাজির হলে। মাকে ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারতাম না বেশিদিন, মাও পারতেন না। বাড়ির স্নেহবঞ্চিত হয়ে সেদিনকার কষ্ট সীমা অতিক্রম করতো, কিন্তু আজ? মাকে ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে সরে এসে, দেশত্যাগী উদ্বাস্তু হয়ে পথেঘাটে আজ রাত্রি কাটাই। কোথায় গেল কষ্টবোধ, কোথায় গেল সেই সুখের জীবন? সে দিন যা পারিনি আজ তো বেশ মুখ বুজেই সে সব সহ্য করছি। যাদের দুবেলা খাবার কষ্ট হবার কথা নয় তাদেরই উপবাসী থাকতে হচ্ছে আজ নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসে। আজ অনাহারে অর্ধাহারে টুকরো কাপড়ের স্তূপ ঘাড়ে ফেলে দুয়োরে দুয়োরে ফিরি করতে হচ্ছে অন্নের আশায়। রাস্তার কলের তপ্ত জলে উদরভর্তি করে ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে যেতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এই অসহ্য পরিহাসের শেষ কোথায় জানি না,—ভবিষ্যতে আরো কি কষ্টের কবলে পড়বো তার খোঁজও রাখি না! মংগল কাব্যে পড়েছি দেবতার কোপে পড়ে মানুষের নাস্তানাবুদ হওয়ার কাহিনী—আমাদের এই কাহিনীও সেই মনগড়া কাহিনীর সমগোত্রীয় নয় কি? মংগল কাব্যের কাহিনীশেষে দুঃখীরা ফিরে পেয়েছে সমস্ত হৃত সম্পত্তি ক্রুদ্ধ দেবতাদের তুষ্টিসাধন করে। আমাদের ভবিষ্যৎ কি তার সংগে মিলবে না? কষ্ট করে বেঁচে থাকার পরেও কি সুখের মুখ দেখবো না কোন দিন?

দুঃখের মধ্যেও সুখের স্মৃতি এসে পড়ে মাঝে মাঝে। আমারও মনে পড়ছে আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজোর কথা। প্রতিমা সাজানো, প্রতিমার রঙ্ দেওয়া, প্রতিমার আঁচলে জড়ি-চুমকী লাগানোর কাজে নাইবার-খাবার সময় থাকতো না আমার! মহাব্যস্ততা এবং হৈ-চৈএর মধ্যে কাটতো দিনগুলো। লক্ষ্য করেছিলাম প্রতিমার রঙ্ লাগানোর সময় গ্রামের হিন্দু-মুসলমানেরা আসতো আগ্রহভরে হাত ধরাধরি করে। মুসলমান বলে আমার গ্রামবাসীরা দূরে সরে থাকতো না কখনো। রঙ্ দেওয়ার ব্যাপারে তারাও মাঝে মাঝে পরামর্শ দিতো পটুয়াদের! ঈশ্বর আল্লা যে এক সেকথা সেদিন তারা বুঝলেও আজ আর বুঝতে পারছে না! কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল সাধারণ মানুষ ধরতে পারলো না, কিন্তু যখন বুঝতে পারলো তখন

সর্বনাশসাধন হয়ে গেছে। তখন মনের অপমৃত্যু ঘটেছে, বনস্পতিঘন বৃহদারণ্যে দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ করে!

অনেকের বাড়িতে বেলবরণ হতো পুজোর একমাস আগে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে হতো ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যে বেলায়। বাজন-দাররা এসে হৈ-চৈ করে ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁশির বাজনায় মাতিয়ে তুলতো চারদিক,—বাজনার সংগে চলতো নাচ। হৈ হুল্লোড়ে কাণের পর্দা ফাটবার উপক্রম হতো। আমরা সবাই ছুটে এসে বাজনার তালে তালে কোমর দুলিয়ে আরম্ভ করে দিতাম খেয়াল নৃত্য,—সে দিনকার নাচ যে প্রলয় নৃত্যের বেশে জীবনে দেখা দেবে তা কে ভেবেছিলো? নাচের মুদ্রা ঠিক হতো কি না জানি না, তবে সে উদ্দাম নাচ যে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল সে কথা হলপ করেই বলতে পারি। গুরুজনরা পূজোমণ্ডপে সমবেত হতেন। কতো রকম বাজী যে পোড়ানো হতো তার সীমা সংখ্যা ছিল না। এই রকম ধুম-ধারেক্কার মধ্যে মা দুর্গা উঠতেন বেদীতে।

পরদিন সপ্তমী পুজোর প্রত্যুষেই সানাই-এর সুর দিতো ঘুম ভাঙিয়ে, চোখ মেলে দেখতাম খুশির প্রস্রবণ। চারদিকে প্রাণের মেলা,—আনন্দের ঢেউ। সেই ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়তাম শিউলিফুল আহরণে। ফুল কুড়োনোর মধ্যেও ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা—কার সঞ্চয় কতো বেশি তার হিসেব নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে সময় সময় যে হুটোপুটির পর্যায়ে পৌছুতো না তাই বা বলি কি করে! কে পদ্মফুল পেলো, কে পেলো না, কার ডালায় রকমারি ফুল কতো বেশি তা দেখে বাবা-মা পয়সা দিতেন পুরস্কার হিসেবে! সে পয়সা সামান্য হোক তবু তা আমাদের শিশুমনের কাছে ছিল অমূল্য।

মহাস্নানের পর মহাসপ্তমী পুজো হতো সুরু। পুরোহিত ঠাকুর চীৎকার করে ডাক দিতেন—'এসো তোমরা সব্বাই অঞ্জলি দেবে এসো।' অঞ্জলি দেওয়ার পর প্রসাদ গ্রহণের পালা। সেদিন দশপ্রহরণধারিণী, সিদ্ধিদাতা গণেশজননী, শত্রুবিজয়িনী মা দুর্গার কাছে ভক্তিভরেই অঞ্জলি দিয়েছি, প্রণাম করে শত্রু দলনের মন্ত্র চেয়ে নিয়েছিলাম ভক্তিনম্রভাবে, কিন্তু তিনি তো শত্রু কবল থেকে রক্ষা করতে পারলেন না আমাদের! সে দিনের মন্ত্র এবং ভক্তির মধ্যে কি ফাঁক ছিলো? তবে কি

আবার নতুন করে বোধন করতে হবে শ্রীরামচন্দ্রের মতো অকালে? অসুরের দৌরাত্ম্য যে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে দেশে! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কাপুরুষতার পংকে ডুবে যাচ্ছে দেখে ব্যথায় মনটা টন্‌টন্ করছে!

ঠাকুমার প্রসাদ বিতরণের চিত্রটি জলজল করছে আজো। চারদিকে আমরা ঘিরে ধরতাম তাঁকে,—তিনি নির্বিকারচিত্তে প্রসাদ বিলিয়ে যেতেন। মুসলমান ভাইবোনেরাও সেদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো প্রসাদ নেবার জন্যে। সে পূজো ছিল মানবতার পূজো—জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই ভক্তিসহকারে পূজোয় অংশগ্রহণ করতো বলেই সেদিন সার্থক হয়ে উঠেছিলো শক্তিপূজো। রাত্রে আরতির সময় বাজী ফোটানোর ধূম ছিল দেখবার মতো। মা ছিলেন বাজী পোড়ানোর বিপক্ষে, সামান্য শব্দও সহ্য করতে পারতেন না। তাই তাঁকে উদ্‌ব্যস্ত করার দিকেই ছিল সকলের লক্ষ্য! প্রতিটি বাজীর শব্দেই তিনি চমকে উঠতেন। সেদিনকার সেই শব্দ আজ আমাদেরও চমকিত করেছে—সেই বাজীর শব্দই আজ প্রাণঘাতী বোমার শব্দে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন কোথাও সামান্যতম শব্দ হলেই ভীত হয়ে পড়ি মানব-মারণ অস্ত্রের কথা ভেবে! মায়ের চমক আজ বুঝতে পারছি মনে-প্রাণে।

দশমীর দিন ভোর বেলায় বিদায় বাজনা শুনে মনটা হয়ে উঠতো ভারি। বড়ো খারাপ লাগতো সমস্ত দিনটা। ফুলতোলা, অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ খাওয়া, ভাইবোনদের সংগে ছুটোপাটি করার দিন শেষ হয়ে গেল ভেবে অস্থির হয়ে উঠতো মন। প্রতিমা বিসর্জন দেখে বাড়ি আসতে আর পা উঠতো না। গুরুজনদের প্রণাম সেরে নারকেল নাড়ু, মোয়া খেয়ে বাসায় যখন ফিরতাম তখন বেশ রাত। শূণ্য মণ্ডপের সামনে আসতেই মনটা হু হু করে উঠতো—যেখানে প্রাণচাপল্য ছিল কিছুক্ষণ আগেও তখন সেখানে বিরাজ করছে প্রশান্তি। উঃ সে সব কথা মনে করতেই আজকের শোচনীয় অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে প্রাণের সুখে বসবাস করেছি, আনন্দের কোলে বড় হয়েছি আজ সেখানে মৃত্যু-শীতল স্তব্ধতা। জীবনে বিজয়া দেখা দিয়েছে যেন। বছরের পর বছর পূজো আসে, কিন্তু দেশে যাবার কোন পথ আর নেই।

মনে পড়ে বিজয়ার দিন দুর্গা মায়ের কানে কানে আবার আসতে অনুরোধ জানাতাম আগামী বৎসর, কিন্তু আমাদের বিসর্জনের সময় কোন প্রতিবেশী তো আবার ফেরবার অনুরোধ জানায় নি আমাদের! এতোদিনের স্নেহভালোবাসার বন্ধন এক নিমিষেই ছিঁড়ে গেল কেন? মানুষ মানুষের সংগ চায় না এমন অশুভ কল্পনা তো আগে কোনদিন করতে পারিনি আমরা! বাংলা মায়ের তরুণদল আজ দেশে দেশে শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের একত্রিত হবার দিন এসেছে, কিন্তু কোথায় তারুণ্য? আজ যে আমরা দেশে দেশান্তরে সতী দেহের মতো ছিন্ন হয়ে ছিটিয়ে পড়েছি, এর থেকে কোন্ পীঠস্থানের জন্ম হবে ভবিষ্যতে? কী লজ্জার ইতিহাসই না গড়ে তুলবো আমরা! সংকটের ইতিবৃত্ত সমগ্র জাতিকে আবার মনুষ্যপদবাচ্য করে তুলুক এই শুভকামনাই করি।

আজ আর পুজোয় কোন আন্তরিক টানই অনুভব করি না। ভোর বেলা ঘুমিয়ে আছি। কাছেই কোন বাড়িতে রেডিও খুলে দিয়েছে, ঘুমের মধ্যেই কানে বাজছে দেশের পূজোর বাজনা। চণ্ডীপাঠ হচ্ছে, সুর করে স্তোত্র পড়ছেন বিরূপাক্ষ। হঠাৎ শুনিমা চীৎকার করে বলছেন—'ওরে ওঠ, আজ যে মহালয়া!'

ফুল তোলার কথা মনে পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বুঝতে পারি এ বাজনা রেডিওর, এ বাজনা যন্ত্রের! আমার গ্রামের পূজোর পাঠ শেষ হয়ে গেছে—হতাশায় আবার শুয়ে পড়ি। রেডিও তখনো চেচাচ্ছে—যা দেবী সর্বভূতেষু······

সত্যি কি দেবী আবার সর্বভূতে বিরাজিতা হবেন? সকলের দুর্মতি ঘুচিয়ে দিয়ে আবার মানুষকে তিনি সুখী স্বচ্ছল করবেন না? সেদিনেরই প্রতীক্ষা করছি। আজ বেশি করে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী মনে পড়ছে। তিনি বলছেন, নিজের ওপর, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিও না। পুণ্যের জয় হবেই, আর যা পাপ তাকে হাজার চেষ্টাতেও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাই হোক, পাপের মৃত্যু হোক, নিষ্পাপ মানুষ আবার প্রাণ ফিরে পাক।

নাগের গাভী

"আজ আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাহার বহুপ্রসারিত বাহু পাশে বাঁধিয়াছেন। একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন এই পূর্ব-পশ্চিম; হৃদ্পিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে; জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। বাংলা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন। রাখীবন্ধনের পুণ্যমন্ত্র রচনা করে বাংলার কবি বাঙালীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে। কিন্তু রাখীবন্ধনের ফাঁস আজ আল্গা হয়ে গেছে, মানুষকে মানবতাবোধ আর সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। আজ মানুষের কেন এতো অধঃপতন? মহাপুরুষদের বাণীর মূল্য কেন আমাদের হৃদয় জয়ে অক্ষম হচ্ছে? আমরা একপ্রাণ, একমন হয়ে এক বাংলার অধিবাসী হতে কি আর পারবো না? 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান!'—এ বাণী কি কথার কথা হয়েই থাকবে?

বাংলার মাটি আর বাংলার জল তো আমাদের এক করে রাখতে পারলো না! একই ব্রহ্মপুত্র, একই জাহ্নবী আমাদের দৃঢ় আলিংগণে বাঁধলেও আমরা তো মানুষকে সহ্য করতে পারলাম না, কোল দিতে পারলাম না ভাইকে স্বার্থসিদ্ধির কলুষ চক্রান্তে? বাপ-পিতামহের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হলো কাদের ভয়ে? কাদের হাত থেকে মানসম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কলোনী আর ক্যাম্পে ঘুরে মরছি মা-বোনেদের হাত ধরে? কবে জাগবে এই যাযাবরদের ভেতর থেকে সে মহান্ জ্যোতি

যার আভায় আলোকিত হয়ে উঠবে দিক্‌দিগন্ত, কবে আবার আমরা ফিরে পাবো নিজেদের দেশ-বাড়ি-ঘর।

আমিও এসেছি গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হয়ে। যারা পড়ে রয়েছে পেছনে তাদের জন্যে প্রাণ কাঁদে। কতো লোক সম্ভ্রম বাঁচাতে পারেনি সামান্য গাড়ি ভাড়ার পয়সার অভাবে। আজ নির্জনে প্রায়ই মনে হয়, গাড়ি ভাড়ার পয়সা থাকলে তারাওতো আসতো! বিয়োগ ব্যথায় মন টন্‌টন্‌ করে ওঠে সেই সব নিরুপায় মানুষের কথা ভেবে। কিন্তু গাড়ি ভাড়া সংগ্রহ করে আমরাইবা কী করতে পেরেছি? এ কি বাঁচা? দ্বারে দ্বারে, প্রদেশে প্রদেশে পরিব্রাজক বৃত্তি গ্রহণ করে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে,—সংকটের মধ্যে পড়ে চোখের সামনে নিয়ত ভেসে উঠছে শান্তিঘেরা পল্লী কুটিরের মায়াময় ছবিখানি। গ্রাম আমাদের ছোট্ট হোক, কিন্তু তার স্নেহ নিবিড় সুশীতল নীড়ের তুলনা নেই। পশুর মতো মানুষকে যে স্বার্থান্ধ নরপিশাচরা গৃহহীন করলো সভ্যতম বিংশশতকে তাদের চেনা গেলো না, তাদের বিচার হলো না—তারা গা ঢাকা দিয়েই মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলে বিখ্যাত হলো! নীচেরতলার মানুষই শুধু মরলো, ওপরতলায় সব মহামানব! হিন্দু-মুসলমান যেখানে চিরদিন প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করেছে তাদের মনকুসুমে কেন কীট প্রবেশ করলো অকারণে?

বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আমরাই একত্রিত হয়ে লড়েছিলাম, আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তিই বণিকের রাজদণ্ডকে বিপন্ন করে তুলেছে একদিন, অথচ আজ? ভ্রাতৃহত্যার নেশায় আমরা হীনবীর্য! ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে শুধু হতাশ দৃষ্টিতেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি! আবার কি রাখীবন্ধন উৎসবে আমরা মেতে উঠতে পারবো না কোনদিন? রাষ্ট্রীয়জীবনে পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব আসেই, তাকে জীইয়ে রেখেছে কোন্ জাতি কতোদিন? আমরাই বা কেন সেই লজ্জাকর দিনের স্মৃতির জের অক্ষয় করে রাখবো জীবনব্যাপী? কেন আমরা বলতে পারবো না, 'যা করেছি ভুল করেছি।' একই জননীর স্তন্যসুধা কেন দুটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হবে বুঝতে পারি না।

আমরা তো কোনদিন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম না,—মাথার

ঘাম পায়ে ফেলে দিনান্তের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যেবেলায় একত্রে জুটে সুখ-দুঃখের গল্প করেই কালাতিপাত করেছি, তবে কেন আজ পারবো না সেই নিরুপদ্রব জীবন ফিরিয়ে আনতে? কেন পারবো না আপনজনের কাছে যেয়ে দাঁড়াতে? পারবো, সেদিন বেশি দূরে নয়। আজকের অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। আবার বাংলায় সূর্যের হাসি ফুটবে—বাংলার গ্লানি দূর হবে, বাঙ্গালী আবার যোগ্যস্থান পাবে বিশ্বের দরবারে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায়—

'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥'

মনে পড়ছে আমার ছোট গ্রামটির কথা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে নাগেরগাতী আমার জন্ম-গ্রাম, তার বুকেই কেটেছে আমার শৈশব আমার যৌবন। সে জননী আজ আমায় বিদায় দিয়েছেন তাঁর কোল থেকে। পূর্ববাংলার সব গ্রামই প্রায় একই রকম। নদী-নালা দিয়ে ঘেরা, গাছপালায় সবুজ, ফুলে-ফলে সাজানো ছবির মতো। এককালে সাপের উপদ্রব ছিল বলে আমাদের গ্রামের নাম হয়েছিল নাগেরগাতী। সাপের সংগে যুদ্ধ করে আমরা বেঁচে ছিলাম, প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষের সংগে মনোমালিন্য হওয়ার ফলে কপালে জুটলো নির্বাসন! কে বেশি হিংস্র? সাপ না মানুষ?

আমাদের পূর্বপুরুষ দু শ বছরেরও আগে মোগলদের সময়ে এখানে এসে নাকি বসতি স্থাপন করেন! বারো জাতের গ্রাম এটা। কামার, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, কুমোর ইত্যাদি কোন জাতেরই অভাব নেই। সবার ওপরে মানুষ সত্য, তার ওপরে আর কিছু নেই এই ছিল আমাদের আদর্শ। কুল-প্রধান ব্রাহ্মণদের লেখায় পড়ায় স্থান ছিল অতি উচ্চে। তা হলেও গ্রামের সকলেরই সংগে ছিল তাঁদের প্রাণের যোগ। গ্রামের ভেতর ছোট বাজার—একটু দূরেই প্রধান হাট, ধান-চালের আড়ত। এখানকার সম্পদ ধান, চাল, পাট ও সর্ষে। দেশে এতো শস্যসম্পদ থাকতেও আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে থাকতে হচ্ছে ভেবে দুঃখই হয়। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' বলে যে প্রবাদ আছে তার সত্যতা

কি আমাদের ওপর দিয়ে পরীক্ষিত না হলেই চলছিল না? রাজনীতির ভূত আমাদের ঘাড় থেকে কবে নামবে?

আসামের গাড়োপাহাড়ের পাদদেশে আমার গ্রামখানি যেন সৌন্দর্যের মূর্তিমতী প্রতীক—আজ জনাকীর্ণ শহরে বসে সেই ছবির কথা ভেবে চোখে জল আসছে আমার। সামনে দিয়ে পাহাড়িয়া নদী কুলুকুলু শব্দে বয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত অনাবিল গতিতে। এই নদীটিই এ দেশের প্রাণ, এ দেশের সম্পদ। গাড়োপাহাড় থেকে হিন্দুস্থান হয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে বিজয়িনীর মতো চলেছে সে। স্থানে স্থানে কূল ভেঙে শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে জলদান করতে করতে। অগভীর এই নদীর পূর্ণযৌবন আসে বর্ষাকালে। তখন তার ভয়ংকর রুদ্ররোষ চারদিক প্লাবিত করে দেশকে করে তোলে উর্বরা,—মাঠে মাঠে চলে ফসল ফলাবার ভূমিকা। শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার মূর্তির মোহিনীরূপ আমরা দেখি হেমন্তে। ছোট-বড়ো নৌকো দেশ-দেশান্তর থেকে জিনিষপত্র নিয়ে আসে, নিয়ে যায়—এইভাবেই দেশের সংগে বিদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সে সম্পর্ক আজ শিথিল। দেশের জিনিষ সব দেশেই পড়ে আছে। পাকিস্তানের ধান-পাট হিন্দুস্থানের কোন বাজারে নেই, হিন্দুস্থানের সর্ষের তেল, কয়লা, চিনি পাকিস্তানকে চলছে এড়িয়ে! এই লুকোচুরি খেলার শেষ কোথায়? কবে আমরা ফিরে পাবো অবাধ বাণিজ্যের সুখকর আবহাওয়া? সেই শুভদিন আসুক এই উপমহা দেশে!

বর্ষা শেষে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই চলে ধান কাটার আয়োজন। কামারের বাড়ি থেকে কাস্তেতে শাণ দিয়ে সবাই চলে যায় ফসল কাটতে—বিস্তীর্ণ মাঠের সোনা এনে ঘরে তোলা হয় তখন। গরীব অনাথিনীরা ধানের শিষ কুড়োতে যায়। বিদেশীরা আসে কতো তৈজসপত্র নিয়ে—আমাদের দেশে যা পাওয়া যায় না তার বিনিময়ে নিয়ে যায় ধান সওদা করে। ধান দিয়ে মেয়েরা কেনে কাঁচের চুরি, গিল্টি সোনার হার, চুল বাঁধার রঙীন ফিতে! বছরের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারই কেনাকাটা হয় ঐ সময়।

আরম্ভ হয় চারিদিকে ধান-চিঁড়ে কোটার আনন্দ-প্রস্রবণ। ভোর হতে না হতেই মেয়েরা শয্যাত্যাগ করে ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটছে; শব্দ হচ্ছে তালে তালে,

নতুন ধানের ভুরভুর গন্ধ গ্রামকে তুলেছে মাতিয়ে। কতোদিন ঢেঁকির শব্দে ঘুম গেছে ভেঙে, আজো মাঝে মাঝে আচমকা জেগে উঠি আধোস্বপ্নের অস্পষ্ট শব্দ শুনে! সে সব আনন্দোচ্ছল দিন আবার জীবনে ফিরে আসবে এমন সম্ভাবনা কি নেই? আজো ভোরেই উঠতে হয়, কিন্তু সে ওঠা আর এ ওঠার মধ্যে পার্থক্য অনেক। আজকে উঠতে হয় চাকরি অন্বেষণের জন্যে—দোরে দোরে উমেদারির জন্যে অমানুষিক শ্রমকে অভিশপ্ত জীবনে গ্রহণ করতে! যে সময়টা দেশে ব্যয় করতাম ফুল সঞ্চয়ের পেছনে সে সময়টা আজ যাচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তিতে! তবুও আমরা বেঁচে আছি, আমরা তবু বেঁচে থাকবো। আমরা আবার খুঁজে আনবো সেই ফেলে আসা দিনগুলোকে। প্রাতবেশীর মুখে হাসি না দেখে মরবো কোন্ আনন্দ নিয়ে?

আমাদের গ্রামবাসীদের চেহারায় কোনদিন মালিন্য দেখিনি। সুন্দর অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে চাষীরা প্রত্যূষে চলে যেতো মাঠে। আর মেয়েরা প্রস্তুত করতো খাবার—গৃহস্থালী কাজের মধ্যে ঝরে পড়তো তাদের গৃহিণীপণার লালিত্য। জীবনে কি আবার ফিরে আসবে না সে সব দিন—আবার কি সে সব মানুষরা গান গাইতে গাইতে কাঁধে লাঙল নিয়ে যাবে না মাঠে? গৃহিণীরা তৈরী করবে না পিঠে-পুলি, করবে না গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি কাজ? জানিনা আজ কেন এতো করে মনে পড়ছে ছেড়ে আসা গ্রামকে, নগরজীবনে গ্রামের কথা এতো মাথা তুলে কেন দাঁড়াচ্ছে বারবার মনের আয়নায়?

যে সব রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজজীবন গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে গেছে। সবার সংগেই ছিল আমাদের আত্মীয়তা। কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকতো না, দাদা, মামা, চাচা যোগ না করলে সামাজিকজীবনে হতো ক্ষমাহীন অপরাধ। আজ কোথায় সে সব সম্পর্ক তলিয়ে গেল ঘূর্ণির মধ্যে, কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে স্নেহের-শ্রদ্ধার সম্বন্ধ হারিয়ে তাচ্ছিল্যের মালা গলায় পরে জীবন বাঁচাচ্ছে কে জানে! শিশুরা মরছে দুধের অভাবে, মায়ের বুক থেকে আজ আর সুধাধারা ক্ষরিত হচ্ছে না—দেশজননী এবং মাজননী রক্ষা করতে পারছেন না তাঁদের সন্তানদের। এর চেয়ে দুর্দিন আর কি হতে পারে? কোন্ দেশের ইতিহাসে রয়েছে এমনি আমানুষিক বর্বরতার

দৃষ্টান্ত? কবে মহামিলনের মন্ত্র কার্যকরী হবে তা না জানলেও এমন দুর্দিন মানুষের জীবনে বেশিদিন স্থায়ী হবেনা তা জানি।

শারদীয়া পূজোয় গ্রামের আনন্দ হতো বল্গাহীন, ইতর-ভদ্র সবাই মেতে উঠতো আনন্দময়ীর আগমনে। কী অপূর্ব মহামিলনের উৎসব! মনের সকল সংকীর্ণতা-মুক্ত হয়ে সবাই যেন উদার মহান্ হয়ে উঠতো। দেখেছি সে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার আসল চেহারা, দেখেছি সেদিনকার লোকখাওয়ানোর অনাবিল আনন্দ। পূজো-আরতির ধূম, ছেলেমেয়েদের নাচ, ঢাক-ঢোল-বাঁশির বাজনায় ফেটে পড়তো সন্তান-গৌরবিণী আমার গ্রাম-জননী। পূজোর চারদিন উৎসব ছেড়ে কেউ কোথাও নড়তো না, ভাব-বিভোরতায় মাতোয়ারা হয়ে থাকতো সবাই। বিজয়ার দৃশ্য আজো ভাসছে চোখে। আমাদের নদীর ঘাটেই নানা গ্রামের নানা প্রতিমার নৌকো গানবাজনা করতে করতে এক যায়গায় এসে জড়ো হতো। মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠতো: বন্দে মাতরম্! ভারতমাতার সেইদিনকার বন্দনার প্রতিদানেই কি আমাদের আজকের এই সর্বহারা রূপ? এ কি মায়ের আশীর্বাদ, না জ্বলন্ত অভিশাপ? এ যে অভাবনীয়। সন্তান অন্যায় করলেও মা কি পারেন এমনি কঠোর হতে? হয়তো শক্তি পুজোয় ফাঁকি ছিল আমাদের, যতোখানি ভক্তি অর্ঘের প্রয়োজন ছিল তা আমরা দিইনি, তাই জাতীয় যুপ কাষ্ঠে বলি হয়ে গেলো দেশ। অখণ্ড ভারত হলো দ্বিখণ্ডিত,—খণ্ডিত ভারতবাসী পড়লো ছড়িয়ে ভিক্ষুকের বেশে। দেশের সংগে সংগে হতভাগ্য মানুষও হলো বলি। রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার পরও কি মা বলবেন: ম্যয় ভূখাঁ হুঁ?

ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগের আস্বাদ নিবিড় করে পাওয়া যায়। আমরা আধ্যাত্মিক ভারতের অমৃতের পুত্র। তাই সুখ ত্যাগ করে আজ আমরা তামস-তপস্যায় রত। এ তপস্যায় রত হয়েছে হিন্দু, এ তপস্যায় রত হয়েছে মুসলমান। শবসাধনায় শোধিত হয়ে দেশমাতৃকা জ্যোতির্ময়ীরূপে আবির্ভূতা হোন এ প্রার্থনা কার নয়? ভুক্তভোগী মানুষ মানুষের স্বপক্ষে; তারা শান্তি চায়, শুধু শান্তি চায়, আবার সুখী-স্বচ্ছল হয়ে বাঁচার মত বাঁচতে চায়। সব মানুষের এক প্রার্থনা হলে মা বেশিদিন কিছুতেই থাকতে পারবে না সন্তানদের পৃথক করে রেখে।

মনে পড়ছে বেশি করে চৈত্র সংক্রান্তির কথা। এই দিনটির কথা কোন দিন ভোলা সম্ভব নয় নাগেরগাতীর ছেলে-বুড়োদের। ধনী-দরিদ্র, চাষী-জমিদার সবাই তাদের গৃহপালিত গরু-ঘোড়াকে নদীর জলে স্নান করিয়ে এনে নানা রঙে বিচিত্রিত করে দিতো তাদের সর্বশরীর। ধূপ-ধোঁয়া দিয়ে কামনা করা হতো তাদের মংগল। চাষীরা দিনে অনাহারে থেকে নতুন কাপড় পরে নতুন আনন্দে বর্ষশেষের এই দিনটিকে জানাতো প্রানের ভক্তি-শ্রদ্ধা। তাদের একমাত্র সম্বল বাঁচবার আশা-ভরসা, তাদের বলদ-গাভীর দীর্ঘজীবন কামনায় ছোট ছোট চাষী-বালক-বালিকারাও আনন্দে দিশেহারা হয়ে পথে পথে বেড়াতো নৃত্য করে। কিছুদিন আগেও খবর পেয়েছি আর সেদিন নেই,—নিঃশব্দে বছর চলে যায়। লোকজনের অভাবে এখন আর কোন আড়ম্বরেরই সাড়া নেই অতোবড়ো গ্রামে।

চৈত্র সংক্রান্তির বিকেলবেলায় আমাদের গ্রামে হতো ষাঁড়ের লড়াই। কী উৎসাহ কী উদ্দীপনা নিয়েই না এই লড়াই দেখেছি একদিন। দূর দূর গ্রাম থেকে হিন্দু-মুসলমান চাষীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে তাদের ষাঁড়কে নানারঙে সাজিয়ে, ফুলের মালা দিয়ে, শিংএ রঙীন রুমাল বেঁধে জারিগান গাইতে গাইতে এসে জড়ো হতো নির্দিষ্ট মাঠে। তারপর চলতো সেই বহু প্রতীক্ষিত লড়াই। যে দলের ষাঁড় জয়লাভ করতো তারা যুদ্ধ-জয়ের পুরস্কার হিসেবে পেতো জমিদারবাবুদের দেওয়া কতো জিনিষ। এইদিনের লোক সমাগম হতো দেখার মতো—মোড়ল মাতব্বরেরা শান্তি রক্ষা করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতো সেদিন। লাঠির জোরে আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে হতো। সেদিনকার সে দৃশ্য মনে পড়লে আজো গুমরে ওঠে মন। আমরা অনেক আগে থেকেই গাছে গাছে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লড়াই-এর রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। এক বিচিত্র আশা-আকাংখায়, উত্তেজনা-ঔৎসুক্যে ভরপুর হয়ে উঠতো মন।

সেদিন গাছের দৃশ্যও যেতো পালটে,—গাছে গাছে মানুষ ঝুলছে বাদুরের মতো! মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও যে ঘটতো না তা নয়,—ভালো করে দেখবার জন্যে এক এক সময় হুটোপুটিও লেগে যেতো জায়গা দখল নিয়ে! ডাল ভেঙে সেবার যে মর্মান্তিক

দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার কথা ভোলা যায় না। অবশ্য রক্তাক্ত প্রতিবেশীর অসার দেহ দেখে সেদিন যতোটা উতলা হয়েছি, আজ আর তেমন হয় না। মানুষের মৃত্যুতে স্বাভাবিক বেদনবোধের সে অনুভূতি গেল কোথায়? বিকৃত দেহ সম্বন্ধে সেদিন ধারণা স্পষ্ট ছিল না, আজ স্বচ্ছ হয়েছে। চোখের সামনে কতো প্রিয়জনের মৃত্যু যে দেখেছি তা বর্ণনা করে লাভ নেই। ষাঁড়ের লড়াইকে আজ প্রতীক বলেই মনে হচ্ছে আমার,—নিরাপদ দূরত্বে বসে নিশ্চয়ই কোন দর্শক উপভোগ করছে এ দৃশ্য! তারও কি পতন ও মৃত্যু হবে না সমস্ত লাঞ্ছিত অপমানিত মানুষের অভিশাপে?

আজ আমরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তাতে পূর্ববংগ গীতিকার আয়না বিবির খেদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

'যেই রে বিরক্ষের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশেরে।
পত্র ছেত্যা রৌদ্র লাগে দেখ কপালের দোষে রে॥
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায় রে।
গায়ের না বাতাস লাগলে আর ভালা আগুনি ঝিমায় রে॥'

কতোকাল আগেকার কোন্ সে অজ্ঞাত প্রাচীন কবি বাঙ্গালী নর-নারীর চিরন্তন প্রেমকাহিনী রচনা করতে বসে দিব্যদৃষ্টিতে পূর্ববাংলার একালের অধিবাসীদের চরম অসহায়তা উপলব্ধি করেই হয়তো এমনি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছেড়ে আসা গ্রমের ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর মর্মবেদনা। স্বাধীন দেশের বৃক্ষ তলায় শান্তির নীড় বাঁধবো, শংকাহীন মনে নবজীবনের বন্দনা গান গাইবো সে সুযোগ আমাদের কবে হবে?

সাখুয়া

মেঘে মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে, চারদিকে নিবিড় সন্ধ্যার অকালবোধন। ঘন অন্ধকার যেন গলা চেপে ধরেছে! এ মেঘ রাজনৈতিক মেঘ, এর বৃষ্টি আনে অশ্রুজলের বন্যা! একদিন যা ছিল আমার জন্মভূমি আজ নাম হয়েছে তার 'ছেড়ে আসা গ্রাম'। আকাশে কালো মেঘের সারি, পূব থেকে পাড়ি জমিয়েছে পশ্চিমের দিকে। হু হু করে ছুটে চলেছে দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেশ-দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে অসহায় নিঃসহায়ের মতো। এতো মেঘ পূবদিকে ছিল কোথায়? কোথা থেকে জন্ম নিলো সর্বনাশা এই কালো মেঘ? মেঘের ডমরুর গুরু গুরু শব্দে আমরা ভীত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি যে, তার বর্ষণ এতো নির্মম হতে পারে, শোনা ছিল 'যতো গর্জে ততো বর্ষে না'। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে মেঘ যতো গর্জিয়েছে তার চেয়েও বর্ষিয়েছে বেশি! আজ লজ্জায় মরে যাই সেদিনের সেই আত্মগ্লানির কথা ভেবে! কোথায় গেল আমার সেই জন্মভূমি, সোনার প্রতিমা 'সাখুয়া' গ্রাম? জানি না কতো পাপ করেছিলাম গত জন্মে যার জন্যে মায়ের কোলেও স্থান হলো না আজ? আমার সাখুয়া মা আমাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করেছে। আমার গাঁয়ের মাটি আমাকে ধরে রাখতে পারলো না—অথচ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আমাকে বারবার বলেছে 'যেতে নাহি দিব'। উঠোনের মাধবীতলার ফুলগুলো, বাগানের মল্লিকা, যুঁই, বেলফুল আমাকে গন্ধে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল চলে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও। যেদিকে তাকিয়েছি সেই দিকেই অনুভব করেছিলাম স্নেহের পরশ; তবুও আসতে হলো, তবুও ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে মহানগরীর অবাঞ্ছিত নাগরিক সাজতে হলো শত অনিচ্ছাতেও। কেন এমন হলো, কেন আমার ওপর কুপিত হলেন আমার পল্লীমা? কারণ পাই না,—কারণ খুঁজতে ইচ্ছেও করে না। শুধু ইচ্ছে করে

মায়ের রূপ ধ্যান করতে, চোখের সামনে আমার জীবন্ত গ্রামটিকে ধরে রাখতে। আশা আছে মায়ের কোলে আবার স্থান পাবো,—উত্তেজনার ঘোরে মায়ের করুণা হারিয়েছি ক্ষণিকের তরে, এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়। হয়তো তিনি বলেছিলেন—'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে' অসতর্ক ক্ষণে, কিন্তু মায়ের এই কথা শুনে ভুল করলে চলে না,—এমন অলুক্ষণে কথা কোনদিন মা বলতে পারেন না মনেপ্রাণে। কথায়ই তো আছে, কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনো নয়। আমার সাখুয়া মা আবার আমাকে কোলে স্থান দেবেন, আমি আবার গাইতে পারবো—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

পেছন থেকে মগরা নদী যেন আমার গ্রামটিকে সহসা ধরেছে সোহাগ করে চেপে। দুরন্ত ছোট্ট নদী যেন সাখুয়ার আঁচলের তলায় নির্ভয়ে থাকতে চায় দুরন্ত মেয়েটির মতো! তর্‌তর্ করে তাই তার অমন নেচে চলা গতি! মগরা নদী আমাদের জীবনে এনেছিল স্নিগ্ধতা, গ্রামটিকে করেছিল উন্নত নানা দিক থেকে। মগরার স্রোতে আমাদের জীবনস্রোত একাত্মা হয়ে মিশে পেয়েছিলো পরিপূর্ণতার স্বাদ।

আজ কতো স্মৃতি এসে ভিড় করছে মনের কোণে—নির্জনতা পেলেই তারা আমাকে উতলা করে বারবার। ভুলতে পারি না, তার কথা না ভেবে শান্তি পাই না। যাকে প্রাণভরে ভালোবাসি তার স্মৃতিই লাগে মিষ্টি, এটা চিরকালের পরীক্ষিত সত্য। ক্ষীণ স্মৃতি যে পুরানো কতো তথ্যকে উদ্‌ঘাটিত করে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। মনে পড়ছে, শান্তিতে ঘেরা সাখুয়ার ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার কথা। হিন্দু আর মুসলমান পাড়া। সামনেই বিরাট ফসলের জমি। মাঠের পশ্চিম সীমানায় হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি বসতি—সূর্যোদয়ের সংগে সংগে জাগতো সেখানে প্রাণকণিকা, জলজল করতো শিশিরভেজা ধানের শিষগুলো। ভোরবেলা দুর্বাদলের মাথায় টলমল করতো মুক্তোর মতো স্বচ্ছ শিশিরকণা। মানসচক্ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি সেদিনের উধাও হওয়া মনের চেহারাখানি। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়তাম ভিজে ঘাসের স্নিগ্ধ পরশ নেবার লোভে। চারদিক নি.ঝুম, আমি বেপরোয়াভাবে শুধু যেতাম এগিয়ে দূরের গ্রামের দিকে চলার নেশায়।

সূর্য উঠেছে আর আমি উঠিনি এমন কোনদিন হয় নি। একদিন মনে পড়ে, মহাবিপদের মধ্যে পড়েছিলাম আলে আলে চলতে গিয়ে। আমি তখন ছোট, অভ্যাসমতো ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি ঠাকুরদার সংগে। ঠাকুরদা বুড়োমানুষ, পারবেন কেন আমার চাপল্যের সংগে পাল্লা দিতে! ছুটে ছুটে এগিয়ে গেছি অনেক দূর—হঠাৎ একটা দৃশ্যে আমি হয়ে গেলাম হতভম্ব। আলের ওপর আড়া-আড়ি হয়ে শুয়ে আছে মস্ত এক সাপ। ভয়ে আমি গতিহীন,—নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমরা পূর্ববংগের লোক, সাপ আমাদের ভয় দেখাতে পারে না। আমি ছোট বলেই হয়তো ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। ঠাকুরদা আমার নির্দেশিত সাপটি দেখে একগাল হেসে শুধু বলেছিলেন—'বোকা কোথাকার, এখনো সাপ চিনিস না? ওটা সাপ নয় রে, সাপের খোলস, বুঝলি,—আসল সাপ বিশ্রাম করছে গর্তের ভেতর!'

সেদিনের ছোট ছেলেটি আসল-নকলের পার্থক্য ধরতে পারেনি সাপের, আজকেও আমি কি ধরতে পেরেছি মানুষের আসল-নকল রূপ? বারবার প্রশ্ন করেছি, পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছি কিন্তু পদে পদে ব্যর্থ হয়েছি সমাধান খুঁজতে গিয়ে। তাই আজ সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে ঠাকুরদার কথা,—তিনি থাকলে ভাবতে হতো না এতো খুঁটিয়ে! মানুষ চেনা দেখছি সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার! যে মানুষকে বিশ্বাস করেছি, যে মানুষের সংগে আত্মীয়তা করেছি, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়েছি, আজ কোথায় তারা? ছোটবেলায় রূপকথা শুনে কতোদিন আঁধার রাতে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখতে চেয়েছি তেপান্তরের মাঠে রূপকথার রাজপুত্তুরকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার সোয়ারী বেশে, তারায় ভরা আকাশের নিচে ঝিল্লিমুখর প্রান্তরের বুকে কৈশোরের স্বপ্ন ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেছে বারবার, আজকের স্বপ্নেরই মতো।

আঁকা-বাঁকা ক্ষেতের আলে ছোট ছোট পা ফেলে পাঠশালায় যাবার কথা মনে পড়ছে। শিক্ষক ছিলেন দুজন, দুজনই ছিলেন মুসলমান। আজো তাঁরা আছেন কিনা জানি না। তাদের একজনের কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ে। আমার বি-এ পাশের সংবাদ পেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন আমার

শৈশবের সেই 'মাস্ সায়েব'—আন্তরিকতায় পূর্ণ সে চিঠি। আমার কাছে তা অমূল্য সম্পদ, তাই সযত্নে রেখে দিয়েছি বাক্সে। বহু মূল্যবান জিনিষ ছেড়ে আসলেও সে চিঠি হাতছাড়া করিনি। ন্যুব্জ দেহ, ক্ষীণ দৃষ্টি, বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত, শুভ্র লম্বা দাড়ি নেড়ে তিনি আমাদের পড়াতেন। কতো অমূল্য উপদেশ দিতেন গল্পচ্ছলে,—এক দিনের পরিচয়েই জানতে পেরেছিলাম তিনি মানব ধর্মের পূজারী। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে তিনি বার বার বারণ করেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন—'সমস্ত মানুষের শুভবুদ্ধি একদিন জাগবেই'। শিহরণ লেগেছিল শেষ কথাটির ওপর জোর দেওয়াতে। 'মাস্ সায়েবে'র কথায় বিশ্বাস আমি হারাইনি, তার কথাই সত্যি হোক এ প্রার্থনা করি। আশায় বুক বেঁধে রয়েছি সেই সুদিনের নবপ্রভাতের জন্যে। জানি না সে সূর্যোদয়ের বিলম্ব কতো!

ছোটবেলাকার অন্তরংগ বন্ধু ছিল রউফ। একসংগে পড়তাম, স্কুলে যেতাম, খেলাধূলো, স্নানসাঁতার ছিল সবই এক সংগে। আমাদের দুটিকে একত্রে সর্বদা সব জায়গায় দেখা যেতো বলে অনেকে উপহাস করে বলতেন 'মাণিকজোড়'—আর যাঁরা আরো তীব্র রসিকতাপ্রিয় ছিলেন তাঁরা বলতেন 'রাম-রহিম'। আমরা কান দিতাম না সে কথায়, বন্ধুত্বে চিড় খাওয়াতে রাজী ছিলাম না। আমাদের বাড়িও ছিলো পাশাপাশি, বাড়ির মাঝখানে শুধু একটা ধান ক্ষেতের ব্যবধান। তখন তাই মনে হতো যেন কতো দীর্ঘ! কিন্তু আজকের এই দীর্ঘ ব্যবধান তো কারো মনে তেমন করে দোলা দিতে পারছে না? আমি রউফের কথা ভাবছি। রউফও কি ভাবছে আমার কথা পাকিস্তান থেকে আমারই সুরে সুর মিলিয়ে?

একদিনের এক হাস্যকর ব্যাপার মনে পড়ে। রউফ একদিন আবিষ্কার করে ফেলল হঠাৎ যে, আমাদের সংগে ওদের বাড়ির একটা প্রভেদ আছে মুর্গী পোষা নিয়ে। এইজন্যেই হয়তো আমাদের দু বাড়ির ব্যবধানও একটু বেশি! বাড়ি গিয়েই সে সেই রাত্রেই সব কটি মুর্গী চুপি চুপি চালান করে দিয়ে এলো আর এক বাড়িতে। সে মুর্গী অবশ্য ফিরে এসেছিলো রউফদের বাড়িতেই আর তার কীর্তির কথাও

গিয়েছিল রাষ্ট্র হয়ে, কিন্তু বন্ধুর সংগে সমস্ত প্রভেদ ঘুচিয়ে নিকটতম হওয়ার এই যে ছেলেমানুষি বুদ্ধি এবং আন্তরিকতা তার তুলনা কোথায়? এই যে কাছের মানুষ করে নেবার প্রচেষ্টা, আজ সেই সরল মনের নির্বাসন হলো কেন এতোদিন একত্রে থাকার পরেও? মনের গড়ন কেন মানুষের বদলালো রাতারাতি! আজকেও সেইদিনকার মতোই ভাবি সময় সময়, রউফ আর আমার মধ্যে ব্যবধান কোথায়? আমরা দুজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু, আমরা মানুষ। তখন কি ভুলেও ভাবতে পেরেছি যে, রউফের সংগে চিরকালের মতো হবে ছাড়াছাড়ি? যে সাখুয়াকে চোখের আড়াল করা দুঃসাধ্য ছিল তাকেও এমনি ছাড়তে হবে, ভেবেছি কি কোনদিন? কোথায় গেল আমার প্রাণের বন্ধু, কোথায় গেল আমার গ্রাম! আকুল হয়ে ভাবি আর মাথা ঠুকি ভাঙা শান বাঁধানো মেঝেতে—না, এখানে মাটির স্পর্শ নেই। চোখ ধাঁধানো নির্মম কলকাতা পল্লীমায়ের মধুমিষ্টি শান্তির প্রলেপ দিতে পারে না। যান্ত্রিক শহর, অত্যাশ্চর্য তার আকর্ষণী শক্তি মানুষকে অমানুষ করার দিকে। মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু দেখছি এখানে প্রত্যহ! তবু একে কতো আদর, কতো সোহাগ! এই প্রাসাদপুরীর ঐশ্বর্য্যের হিংস্র ঔদ্ধত্যের কাছে মানবতার দোহাই হাস্যকর!

সাখুয়ার মাঠ হিন্দু-মুসলমানের বারোয়ারি সম্পত্তি। ক্ষেত চষা, বীজ বোনা থেকে আরম্ভ করে ফসলকাটার দিন পর্যন্ত বিশাল সেই মাঠের বুকে সম্মিলিত শ্রম চলতো পাশাপাশি পরস্পরের সুখ-স্বপ্নের অংশীদার হয়ে। সবচেয়ে ভালো লাগতো জারি গানের সুরে সুরে ক্ষেতের বুকে অলৌকিক আনন্দের ঢেউ জাগানো। গলা ছেড়ে তামাক খেতে খেতে গান ধরতো তারা সমবেত গলায়—

'ওরে অমর কেউ থাকবি না তো, মরতে হবে সবারে,
তবে সংসারে তোর এতো ভেদ-জ্ঞান কিসেরি তরে ॥'

এ গান যারা গাইতে পারে তাদের আশা-আকাংখা, স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা কতো অকৃত্রিম ছিল সহজেই বোঝা যায়। এই পরিবেশে কোথা থেকে এলো সর্বনাশা এই ভেদজ্ঞান?

সাখুয়ার 'বড়োঘাট' ও সর্বজনীন। এখানেও গাঁয়ের সকলেরই সমান অধিকার।

মনের খুশিতে সবাই স্নান করছে, সাঁতার কাটছে, জল নিচ্ছে বিনা দ্বিধায়। গরমের দিনে ঘাটের কোণে জেলাবোর্ডের রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের ওপর বসতো মজলিস—নিশুতিরাত্রি অবধি চলতো আলোচনা। তর্ক হতো, কিন্তু সহিষ্ণুতার কোন অভাববোধ ঘটেনি কোনদিন। আলোচনায় যোগদান করতো তরুণ সমাজ। সেখানে চলতো দুঃখের কথা, আশা-আকাংখার কথা, গ্রাম্য রাজনীতি থেকে শিক্ষাদীক্ষা এমন কি আজকের সংস্কৃতির গতি-প্রগতির কথাও বাদ যেতো না। আলোচ্য বিষয় আলোচনার আবহাওয়ার ওপর ওঠানামা করতো। বয়স্কদের সব বৈঠক হতো মথুর মাষ্টারের বৈঠকখানায়। ক্রমাগত তামাক পুড়তো সেখানে, তিনটে হুঁকো হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতো বক্তাদের শোষণের ঠেলায়! কল্কে পুড়ে লাল হয়ে উঠতো, ফাটবার উপক্রম! মথুর ঠাকুর ছিলেন ভিনগাঁয়ের স্কুল মাস্টার, জ্ঞান ছিলো গভীর, মানুষ হিসেবে ছিলেন একেবারে ভোলানাথ। লোকের দুঃখে তিনি বিচলিত হতেন বলেই সকলেই আসতো ছুটে পরামর্শ নিতে। পরামর্শ বা সাহায্য দিতে কোনদিন দ্বিধা করতে দেখিনি তাঁকে। গোলমালে পড়লে পাড়ার মাতব্বরেরাও লজ্জা করতেন না তাঁর কাছে আসতে। শুনেছি আজো তিনি দেশ ত্যাগ করেন নি,—আঁকড়ে পড়ে আছেন দেশের বাড়িতে। তিনিও আশা করেন একদিন না একদিন জাতীয় কলংকের অবসান হবেই, আবার উন্মত্ত মানুষ দুর্যোগের রাত্রি কাটিয়ে প্রকৃতিস্থ হবে নূতন জীবন-প্রভাতে। ঘুচে যাবে আজকের সংকট, মুছে যাবে লজ্জার ইতিহাস।

প্রতি রবিবার হাট বসতো মগরা নদীর তীরে। একদিকে জেলাবোর্ডের বড়ো রাস্তা, অন্যদিকে মগরা নদী। একদিকে গরুর গাড়ির ভিড়, অন্যদিকে সারি সারি পাল তোলা নৌকো। কোলাহলমুখর হাট এনে দিতো সপ্তাহান্তে কল্লোলিত প্রাণের আনন্দোচ্ছ্বাসের ঢেউ। প্রতীক্ষা করে থাকতাম রবিবারের জন্যে—লক্ষ্য করেছি সেদিনকার মানুষে মানুষে সম্প্রীতির সম্বন্ধ। ইসমাইল চাচার চালের গোলার পাশেই ছিল রজনীমামার কাপড়ের দোকান। আমরা হাটে গেলে উত্যক্ত করে ব্যস্ত করে তুলতাম ইসমাইল চাচাকে! খরিদ্দারের সংগে কথা বললে আমরা জোর করে তাঁর মুখ ঘুরিয়ে আমাদের সংগে কথা বলতে বাধ্য

করতাম। আমাদের শয়তানী থেকে মুক্তি পাবার জন্মেই হয়তো চাচা বড়ো বড়ো মাছ-লজেঞ্চুস রাখতেন লুকিয়ে,—একটা একটা পেলে তবেই নিষ্কৃতি দিতাম তাঁকে! সেদিনকার এই দুষ্টুমির কথা ভেবে একটু একটু লজ্জা হলেও আনন্দটাই হয় বেশি। আজ রজনীমামা কলকাতার পথে পথে ফিরি করে বেড়ান, অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটে তাঁর।

পুজো-পার্বন, ঈদ-মহরমেই পেতাম মানুষের মনের আসল পরিচয়। বিজয়া দশমী এবং ঈদ আমাদের গ্রামে ছিল মিলনের প্রতীক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রীতিবিনিময়ের সংগে সংগে করতে হতো মিষ্টিমুখ। সেই আনন্দমুখর দিন কি আর ফিরে পাবো না আমরা! সেদিনকার মানুষরা আজ কোথায়?

আজ মনের পর্দায় ভেসে উঠে মহুয়ার গান, গুনাইবিবির পালা, বাউল গান, জারি গান, কবির লড়াই, মনসার ভাসান, গাজির গানের আসরের জনবহুল দৃশ্যের টুকরো টুকরো ছবি। জাতিধর্মনির্বিশেষে নির্বাক শ্রোতারদল গ্রহণ করছে এসব সংগীত রস। ব্রাহ্মণের ছেলে নদের চাঁদ, আর মুসলমানের মেয়ে মহুয়া; মুসলমান গায়ক ও সাধক গাজি আর হিন্দুর মেয়ে চম্পাবতী—অবাক হয়ে দেখেছি নদের চাঁদ আর মহুয়ার দুঃখে, গাজি আর চম্পার ব্যথায় সমভাবে অশ্রু বিসর্জন করেছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীই। সকলেই নাটক বর্ণিত দুঃখকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দুঃখ বলে গ্রহণ করেনি, করেছে সমস্ত মানুষের দুঃখ হিসেবেই। তাই তো সহজেই তারা হতে পারতো সবাকার সুখ-দুঃখের অংশীদার।

পৌষ সংক্রান্তিতে আমাদের হাটে বসতো মেলা। ঘরে ঘরে তখন চলতো নবান্নের উৎসব, সকলের মুখে হাসির ছোঁয়াচ। গ্রামের ওস্তাদ মেঘু সেখ ছিলেন বিখ্যাত কুস্তিগীর, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন আমার জ্যেঠামশায়। জ্যেঠার অকালমৃত্যুতে দেখেছি অমন জোয়ান মেঘু সেখও হয়েছিলেন পাগলের মতো। পুত্রশোক পেয়েছিলেন যেন জ্যেঠামশায়ের মৃত্যুতে। সেইদিন থেকে আর কেউ তাঁকে কুস্তি লড়তে দেখেনি। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিঃসন্তান ওস্তাদ আজো বেঁচে আছেন। আমাদের সংগে দেখা হলে অবিশ্রান্তভাবে তিনি শুধু জ্যেঠামশায়ের

গল্পই বলে যেতেন, আর অশ্রুধারায় তাঁর গণ্ডদেশ যেতো ভিজে। তেমন স্নেহ আজ পর্যন্ত দেখিনি। আজ সেই স্নেহপ্রবণ মন কোথায় গেল মানুষের!

এই প্রসংগে আর একজনের কথা না বললে আমার স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে আমাদের গ্রামের চারণ কবি—কবীর পাগল। জাতিতে সে মুসলমান হলেও কোন ধর্মের ওপরই বিরাগ ছিলো না তার। সমস্ত ধর্মকেই বিশ্বাস করতো কবীর পাগল। সেও আজ বৃদ্ধ। কিছুদিন আগে শুনেছি সে নাকি অন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের এবং জাতির জন্যে একটি ইতিহাসের মালা গেঁথে রেখেছে কবীর গানের সুরের সূত্রদিয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি ধর্মের সমন্বয়ের দিকেই তার ঝোঁক। ভিক্ষের অজুহাতে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়াতো সে। রামায়ন-মহাভারত-কোরাণ-বাইবেলের গল্প শুনেছি তারই মুখে প্রথম। তাকে কেউ বলতো বৈষ্ণব, কেউ বা ভাবতো ফকির। আমার সংগে রউফের একবার ঝগরা হয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়। মনে পড়ে কবীরই করে দিয়েছিল তার মীমাংসা। তার সামনে মনে পড়ে প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম—বন্ধুতে বন্ধুতে, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হতে দেবো না কোনদিন। আমাদের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে সে কেঁদেছিল সেদিন। ছোট্ট ছেলে বলেই সে কান্নার অর্থ বুঝিনি তখন। আজ এক একদিন রাত্রে কার ডাকে ঘুম ভাঙ্‌তেই যায় যেন। ঘুম ভেঙে সকলের আগে মনে পড়ে কবীরের মুখখানি। কবীর নিশ্চয় আমাদের দুঃখ নিয়েও গান রচনা করেছে। আজ সে অন্ধ, কিন্তু মানসচক্ষে তো মানুষের বেদনা দেখতে পাচ্ছে সে। আজো চমকে চমকে উঠি গানের রেশ শুনলে, বাউল-ভাটিয়ালি হলেই কবীর মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে পড়ে যায় তার 'ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়' গানখানি। মনে পড়ে যায় সে-ই বলেছিল মাষ্টার সায়েবের মতো দৃঢ়কণ্ঠে—'ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে আবার মিলন ঘটবেই, পৃথিবী হবে সুন্দর'। আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি কবীর, আমাদের দেশ আবার সকলের হবে, সমস্ত শয়তানের মৃত্যু হবে একদিন। তবে সেদিন তোমায় পাব কিনা জানিনা!

বরিশাল জেলা

বাণারিপাড়া

পরপারের ডাক এলে মানুষকে সবকিছু ছেড়ে এ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয় মহাপ্রস্থানের পথে তা জানি, আর জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝি তার জন্যে শোক করে কোন লাভ নেই, হয়তো তা বৃথা; কেননা আলোর অপরদিকে যেমন আঁধার, জীবনের অপরদিকে তেমনি মরণ—যে চলে যায় তাঁর স্মৃতি শুধু পড়ে থাকে, তাঁর সন্ধান মেলে না আর কোন কালে।

শতাব্দীব্যাপী সাধনায় যে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা, সে স্বাধীনতার যজ্ঞাহুতিতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে বহু বীর, ত্যাগ ও দুঃখ ভোগ করেছে বহু দেশকর্মী, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে অগণিত নরনারী। এই চরম ও পরম বস্তু লাভের জন্যে পার্থিব ক্ষয় ক্ষতিকে মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙ্গালী। ত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত করেছে তারা দেশকে, জননী ও জন্মভূমি তাদের চোখে এক ও অভিন্ন, জন্মদায়িনী ও দেশমাতৃকা 'স্বর্গাৎ অপি গরিয়সী' তাদের কাছে।

পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির জন্যে ধূপের দহনের মত নিপীড়ন সহ্য করেছে যেমন অগনিত দেশবাসী তেমনি দুঃসহ ব্যথার মধ্যে দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে বরণ করে নিয়েছি আমি। স্মরনীয় সেই ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবের দিনে আনন্দে মুখরিত কলকাতা মহানগরীর রাজপথ দিয়ে মাতৃহারার ব্যথা বুকে নিয়ে চলেছিলাম শ্মশান যাত্রায়। শ্মশানে শায়িত সেই করুণাময়ী স্নেহময়ী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো ভেবেছিলাম, এক মাকে হারিয়েছি আর এক মা

হয়তো আমার আছে, যে মায়ের সান্নিধ্যে গিয়ে স্নেহের নীড়ে মাথা গুঁজে ভুলতে পারবো মনের যতো ব্যথা। কিন্তু কোথায় সে সান্ত্বনা? গর্ভধারিনী মাকে হারাবার সংগে সংগে মাতৃভূমি, পিতৃপুরুষের জন্মভূমিকেও হারিয়েছি। দেশমাতৃকা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আমাদের জন্মভূমি চলে গেছে আজ অন্যরাজ্যে, পরশাসনে। শ্মশান চুল্লীর ধুমায়িত পিংগলাগ্নি আমার যে মায়ের দেহকে ছাই করে দিয়েছে, জানি আমি জানি, এ জীবনে তাঁর আর সন্ধান পাব না; কিন্তু রাজনীতির পাকচক্রে শ্মশানের চেয়েও ভয়াবহ আগুণের লেলিহান শিখায় হাজার হাজার নরনারী ও শিশুর জীবন পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, আমাদের ঘরছাড়া, দিশেহারা হতে হবে তা ভাবতে পারিনি কোনদিন। ঝড়ের মধ্যে নীড়হারা রাতের পাখি যেমন করে বিলাপ করে ফেরে বন থেকে বনান্তরে আমরাও তেমনি দেশ-বিভাগের অভিশাপে অজানার স্রোতে ভেসে চলেছি দেশ থেকে দেশান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে; আর দৈনন্দিন জীবনে বহন করে চলেছি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের শত বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা। জানি না কবে হবে এই মহানিশার অবসান!

শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়াসুনিবিড় আমার পল্লীগ্রাম ও সরল অনাড়ম্বর একান্ত পরিজনদের ছেড়ে এসে কোলাহল মুখর মহানগরীর লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে আজ হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে—গতানুগতিক কর্মক্লান্ত একটানা জীবন নিয়ে কোনমতে কষ্টে ক্লিষ্টে বেঁচে আছি। বিস্মৃতপ্রায় কবে কোন্ ছেলে বয়সে কবিতায় পড়েছিলাম, 'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। কিন্তু বয়সের সংগে সংগে সে রঙীন স্বপ্ন আজ চলে গেছে, বাস্তবের অভিজ্ঞতায় আজ বুঝতে পারছি কল্পনা ও বাস্তব এক নয়, আমাদের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ—জীবনযুদ্ধের প্রতি পদক্ষেপে রয়েছে কঠিন দ্বন্দ্ব, প্রবল প্রতিযোগিতা।

কর্মক্লান্ত জীবনের ক্ষণিক অবকাশে মাঝে মাঝে যখন আনমনে মহানগরীর ফুটপাত দিয়ে চলি কিম্বা গংগার ধারে গিয়ে বসি তখন আমার মা আর আমার পল্লীগ্রাম বাণারিপাড়ার স্মৃতি আমার মনে জাগে। এই স্মৃতি আমার সমস্ত অস্তিত্বকে

যেন আচ্ছন্ন করে দেয়। কতো কথাই না মনে পড়ে তখন, আর ভাবতে ভাবতে চোখ জলে ভরে আসে।

বাল্য ও কৈশোরের সামান্য কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম আমার পল্লীগ্রাম বাণারিপাড়ায়। বাবা থাকতেন বিদেশে, তাই বাকী সময়টা তাঁর সংগে ঘুরেছি নানা জায়গায়, পড়াশুনাও করেছি নানা শিক্ষায়তনে। কিন্তু বাল্যকালের সেই পল্লী-জীবনের স্মৃতি আজো অম্লান হয়ে জাগ্রত আছে আমার মানসপটে। পাগলামি স্বভাবের নিশ্চিন্ত দিনগুলোতে যে গ্রামের ধূলোমাটি গায়ে মেখে বাল্যবন্ধুদের সংগে একত্রে খেলা করেছি, পুকুরে স্নান করেছি, স্কুলে গেছি সেই সাতপুরুষের ভিটের মায়া আজো যে ভুলতে পারি নি। পিতৃপিতামহের আশীসপূত তাঁদের যুগযুগান্তরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বাণারিপাড়ার সংগে আমার অন্তরের ও নাড়ীর যোগ, এ গ্রাম আমার বাল্যের মনভোলানো মায়াপুরী, এ গ্রাম যে আমার কাছে তীর্থভূমি—এর প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, তাই কি করে ভুলব, কি করে ভুলতে পারব আমার ছেড়ে আসা বাণারিপাড়া গ্রামকে ? সন্তান যেমন ভালবাসে মাকে, আমি তেমনি ভালবেসেছি বাণারিপাড়াকে।

লক্ষ গ্রামের বাংলাদেশে আমার গ্রাম বাণারিপাড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে শুধু বরিশাল জেলায় নয় সমগ্র বাংলার মধ্যে বাণারিপাড়া অনন্য।

বরিশাল জেলায় যে যায়নি সে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্' বাংলা মায়ের এইরূপ-বর্ণনা প্রত্যক্ষ করেনি। প্রকৃতি দেবীর অকুণ্ঠদানে প্রতিদিন দু দুবার করে জোয়ার-ভাটার খেলায় বরিশালের গ্রামপ্রান্তর সুজলাং, বরিশালের মলয় শীতলাং ও বরিশালের মাটি সুফলাং শস্য-শ্যামলাং হয়েছে। রসপুষ্ট বরিশালবাসী তাই দূর দূরান্তরে থেকেও বরিশালের মাটিকে ভুলতে পারে না। সেই বরিশালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপদ বানারিপাড়া।

আমার গ্রামের পশ্চিমে বিস্তৃত খরস্রোতা নদী—দূরদূরান্তরে যাবার স্টিমার পথ, আর গ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তর ও পূর্বদিক ঘেসে ছোট স্রোতস্বিনী খাল চলে গেছে—বরিশাল শহরে যাবার নৌকো পথ এটা। এই খাল ও নদীর সংযোগস্থলে খালের

দু পাশে বিরাট বন্দর, এর বিপরীত দিকে গ্রামের পূর্ব সীমানায় সপ্তাহে দুদিন হাট বসে এবং এই হাটে হাজার হাজার মণ ধানচাউল কেনাবেচা হয়ে থাকে। বন্দর ও হাটকে যুক্ত করে গ্রামের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে সিমেন্ট বাঁধানো একটি রাস্তা। এই পথ ক্রমে দীর্ঘ হয়ে বরিশাল শহরে যেয়ে মিশেছে। বর্ষা অন্তে মোটর-যোগে বরিশাল শহরে যাতায়াতে এ পথই প্রশস্ত। গ্রমের কিছু দূরে উত্তরে চাখার, খলিসাকোটা, উজিরপুর ; পূর্বে নরোত্তমপুর, গাভা, কাঁচাবালিয়া ; দক্ষিণে আলতা, আটঘর, স্বরূপকাঠি ও পশ্চিমে বাইসারি, দন্তোঘাট, ইলুহার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলো বাণারিপাড়াকে মধ্যমনি করে স্ব স্ব ঐতিহ্যের বাহকরূপে দীপ্যমান রয়েছে। গ্রামের দক্ষিণাংশে বাস বিখ্যাত নট্ট সম্প্রদায়ের, যাদের সুমধুর ঢোল বাজনা ও যাত্রাগান বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গ্রামের চারদিকে রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তারা বংশ পরম্পরায়, হাট-বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গ্রামকে সর্বদা প্রাণচঞ্চল রেখেছে। আর সেই সুন্দর পাকা রাস্তার দুধারে ও গ্রামের অন্যত্র ছড়িয়ে আছে বাংলার সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা সংস্কৃতি ও শিক্ষায় সমাজে খ্যাতি লাভ করেছে। এঁদের মধ্যে গুহ ঠাকুরতা বংশই সংখ্যায় গরিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বত্র সুপরিচিত।

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় গ্রামে নানাবিধ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এঁদেরই অনুপ্রেরণা ও স্বার্থত্যাগে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে এ গ্রামে স্থাপিত হয়েছে প্রথম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। দুটি বৃহৎ দালানে অবস্থিত রয়েছে এই বিদ্যালয়টি। গ্রামান্তরের বহু ছাত্রকে দেখেছি বাণারিপাড়ার ঘরে ঘরে থেকে শিক্ষালাভ করেছে। স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা ও রজনীকান্ত গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে একদিকে ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এ বিদ্যালয়টির, অপরদিকে পররর্তীকালে জাতীয় বিদ্যালয়, হরিজন বিদ্যালয়, মনোরঞ্জন শিল্পসদন, একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় ও শ্রীভবন নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বাণারিপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীটিও স্থাপিত হয়েছে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে। পরে আরো একটি লাইব্রেরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনামূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার জন্যে জেলাবোর্ডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, যাতায়াতের সুবিধার জন্যে খালের ওপর নির্মিত হয়েছে চার চারটে প্রকাণ্ড লোহার পুল। পূর্বে বাজারের কাছে যে রমণীয় দোলায়মান লোহার পুলটি ছিল তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনমূলক কাজ এগিয়ে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে গ্রামে আনন্দ বিতরণের জন্যে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট অবদান কীর্ত্তগান, কবিগান, যাত্রা ও থিয়েটার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলনও হয়েছে।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন থেকে সুরু করে অসহযোগ ও আইন অমান্যের কাল পর্যন্ত যাবতীয় রাজনৈতিক আলোড়নে বাণারিপাড়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ গ্রামের অবদান সত্যই বিরাট। ১৯৩৪ সালে দার্জিলিংএ লেবং নামক স্থানে তদানিন্তন গভর্ণর এণ্ডারসনকে হত্যা করতে গিয়ে ভবাণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামে ১৬ বৎসর বয়সের যে যুবক ফাঁসীর মঞ্চে জীবন বিসর্জন দেয় সে যে এই গাঁয়েরই আত্মভোলা ছেলে! আইন অমান্য, বিলিতিদ্রব্য বর্জন, মাদকদ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং, ঘরে ঘরে লবণ তৈরী ও সূতাকাটা প্রভৃতি বিষয়ে কেশব ব্যানার্জি, কালাচাঁদ ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ ঠাকুরতা, কুমুদ ঠাকুরতা, শ্রীমতী ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা, নলিনী দাশগুপ্ত ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দ যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সে যুগে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—বংগভংগ আন্দোলনে বরিশাল সম্মেলনের সময় সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য করে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণের জন্যে পুলিশের লাঠিতে নিগৃহীত চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁরই অমরকীর্তি সন্তান। পুলিশের প্রহারে জর্জরিত-দেহ, তবু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির বিরাম নেই। সুতীব্র প্রতিবাদে জানিয়ে দিলেন তিনি—

'বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমরা কি মা'র সেই ছেলে?'

তাঁরই গ্রামবাসী আমরা কী করে ভুলে থাকব আমাদের গ্রাম-মাকে?

সুভাষ চন্দ্র বসুর পদার্পনে ধন্য হয়েছে আমার গ্রাম। খুব ছোট্ট ছিলাম তখন, কিন্তু আজো বেশ স্পষ্ট মনে আছে—জাতীয় বিদ্যালয় প্রাংগণে বক্তৃতা দেওয়ার

পর আমাদের পাশের বাড়ির দালানের বারান্দায় জ্যোৎস্না রাত্রে ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন সুভাষচন্দ্র, তাঁর আশে পাশে ছিলেন আরো কয়েকজন। জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সুভাষচন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল'। পাশে দাঁড়িয়ে আমার এক দাদা প্রশ্ন করলেন—কী, মরণ? সুভাষচন্দ্র উত্তর দিলেন 'যে মরণ স্বরগ সমান'। সুভাষচন্দ্র আজ জীবিত কি লোকান্তরিত জানি না, কিন্তু দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে রাত্রির আলো-আঁধারেই তিনি দেশ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন। আজ দেশবাসীর কাছে নেতাজী রূপে বন্দিত তিনি, কিন্তু তাঁকে 'দেশ গৌরব' মুকুটমণি প্রথম পরিয়েছিলেন কলকাতা মহানগরীর এক জনসভায় আমাদেরই গ্রাম-গৌরব স্বর্গত চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

অপূর্ব শোভামণ্ডিত আমার ছেড়ে আসা গ্রামে আবির্ভাব হয়েছে বহু স্মরণীয় ও বরণীয়ের—জীবনের এক একটি ক্ষেত্রে তাঁদের এক এক জনকে পথিকৃৎ বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হবে না।

থানা, ডাকঘর, হাটবাজার, স্কুল ইত্যাদি নিয়ে আমার গ্রামটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লী সৌন্দর্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার—সুখেশান্তিতে নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে গ্রামবাসীরা। গ্রামের আশে পাশে রয়েছে বিভিন্ন আশ্রম। গ্রামের মধ্যে আছে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন চকমিলানো বানিয়াবাড়ি। এ বাড়ি গ্রামের একটি গৌরবের বস্তু। দূরদূরান্তরের গ্রামের লোকেরা নৌকোপথে এর সমুখ দিয়ে যাবার সময় নৌকো থামিয়ে একবার অন্তত এ বাড়ির সৌন্দর্য না দেখে যেতে পারেনা। যাত্রা-থিয়েটারের দ্রব্যসামগ্রী থেকে সুরু করে একটা সংসারের পক্ষে আবশ্যকীয় যাবতীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায় এখানে। জে-বি-ডি কালীর আবিষ্কারক স্বনামখ্যাত জগবন্ধু দত্ত এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

দুর্গোপূজোর দুদিন আগে থেকে লক্ষ্মীপূজোর পরদিন পর্যন্ত প্রবাসী ও অপ্রবাসী গ্রামবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে জাহাজের মতো বিরাট একখানি করে স্টিমার খুলনা থেকে সরাসরি বাণারিপাড়া পর্যন্ত চলাচল করতো—বহুদূরের গ্রামবাসীরাও বাণারিপাড়া ষ্টেশনে নেমে নৌকো করে চলে যেতো নিজ

নিজ গ্রামে। পূজোর পরে সুরু হতো নানা রকমের সভা সমিতি, প্রীতি সম্মিলনী, বড়ো ও ছোটদের নাট্যাভিনয় ও যাত্রাগান। এ সব অনুষ্ঠানে মুসলমানেরাও যোগ দিয়েছে প্রতিবেশী ভাই হিসেবে, পূজোর প্রসাদ নিয়েছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়। প্রসাদের প্রধান উপকরণ ছিল নারকেলের তৈরী বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী। গ্রামের মেয়েদের হাতের তৈরী নারকেলের জিনিষ খেয়ে সুভাষচন্দ্র পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

ছোট বড়ো প্রতিটি লোকের সংগেই প্রত্যেকের কী মধুরসম্পর্কই না লক্ষ্য করেছি গ্রামে কলকাতার জীবনে আজ তা বিশেষভাবেই অনুভব করেছি। ধোবা, নাপিত, ভূমালি এরা সবাই ছিল আপনার জন। ছোটবেলায় এক গ্রাম সম্পর্কীয়া পিসির বিয়ের ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বিয়ের আসরে আমাদের গাঁয়ের নাপিত এসে বিড়বিড় করে কী যে গৌরবচন বলে গেল তখন তা ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে তার কাছ থেকে টুকে নিয়ে সবটা মুখস্তই করে ফেলেছিলাম। এখনো সে গৌরবচনের কিছুটা মনে পড়ে ছড়া কেটে সে বলেছিল—

চন্দ্রসূর্য দেবগণ চিন্তাযুক্ত হৈল মন।
না হইলে নাপিতের কর্ম, শুদ্ধ হয়না কোন বর্ণ।
ডাইনে শংকর বামে গৌরী,
অন্ত মিলন হইল শিব-গৌরী।
আপনেরা চাঁদ বদনে বলেন হরি হরি,
নাপিতের দক্ষিণা স্বর্ণ এক ভরি।
নাপিতস্ত গড়গড়ি !

এই 'নাপিতস্ত গড়গড়ি' কথাটিই ছিল আমাদের হাসির খোরাক। কিন্তু সে যাই হোক, বর-কনের মিলনকে শুদ্ধ করে দিয়ে নবদম্পতির জন্যে তার শুভ কামনার বিনিময়ে সে যে দক্ষিণা স্বরূপ এক ভরি মাত্র স্বর্ণ প্রার্থনা করতো তা কী আর এমন বেশি ! বিবাহাদি ব্যাপারে এমনি নিজ নিজ কাজ করে ধোপা, ভুমালী প্রভৃতি সব বৃত্তিজীবিরাই বিদায় পেতো। তারা সব আজ কোথায় ? তাদের কি করে চলে ?

বাণারিপাড়া সম্মিলনীর কথা উল্লেখ না করলে এই গ্রামের বর্ণনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। বাণারিপাড়ার বহু অধিবাসী ভাগ্যান্বেষণে আজ দেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। বাণারিপাড়ার কয়েকজন উৎসাহী কর্মী প্রবাসে থেকেও পারস্পরিক মিলনক্ষেত্র হিসেবে এবং সেবার আদর্শ নিয়ে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে সম্মিলনী নানাভাবে গ্রামের সেবা করে আসছে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসেআমাদের হাস্যমধুর প্রাণচঞ্চল গ্রামখানি আজ নিস্তব্ধ শ্মশান—এই শ্মশানে আবার শিবের আবির্ভাব কবে হবে কে জানে?

মনে পড়ে কতোদিন ভোরে রায়েরহাটের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের দূর হতে ভেসে আসা নামাজের সকরুণ সুর শুনেছি—সে সুরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মিলনের আহ্বান ছিল—জেহাদি জিগির ছিল না। দিবাবসানে কতো সন্ধ্যায় সর্ব উত্তরের বাড়ির পুলের ওপর দাঁড়িয়ে ঘরে ঘরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজনা শুনেছি, সেই আরতির তালের সংগে যেন নৃত্য করেছে আমার সারা প্রাণ। কতো রাত্রে নদীর পারে বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়েছে, নদীর জলে ছুটে চলেছে শত শত চাঁদের রূপালী বন্যা। শরৎকালের কতো প্রভাতে, শীতের কতো মধ্যাহ্নে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখেছি প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য—সারি সারি পাল তুলে চলেছে কতো অজানা মাঝির নৌকো, দূর দিগন্তের শ্যামলিমা মুগ্ধ করেছে মনকে। কিন্তু সে সবই আজ স্মৃতি। তাইতো বলতে ইচ্ছে হয়—নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই। রাজনৈতিক ঘটনা বিবর্তনে সে গ্রাম আজ আমার কাছ থেকে দূরে—বহুদূরে, কিন্তু জীবনের শত পটপরিবর্তনেও মনের পটে আঁকা থাকবে একখানা ছবি—সে ছবিখানি আমার ছেড়ে আসা গ্রাম বাণারিপাড়ার।

গাভা

সুখ-স্মৃতিকে রসিয়ে রসিয়ে রোমন্থন করা বোধ হয় মনের একটা বিলাস। না হলে আজ এতো দুঃখকষ্টের মধ্যেও, ছন্নছাড়া অব্যবস্থিত জীবনের দুর্দিনেও কেন আমার জন্মভূমি গাভার কথা এতো বেশি করে মনে পড়ছে? আমার মাটির মায়ের কাছ থেকে যে শান্তি যে সান্ত্বনা যে সুখ যে বৈভব পেয়েছিলাম একদিন, তার সংগে আজকের দিনের জীবনকে তুলনা করতে কেন আমি ব্যস্ত? মন আমার অতীত-মুখর,—এই নগরজীবনের সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে বল্গাহীন অশ্বমেধ ঘোড়ার অফুরন্ত উল্কার গতি নিয়ে ছুটে চলেছে মন। তার সামনে কোন বাধা কোন বিপত্তিই যেন টিকবে না, মানুষের গড়া ভেদাভেদের কোন তোয়াক্কাই করে না সে। উদ্দাম ঊর্ধ্বশ্বাসে সে পরিক্রমা করছে গাভা গ্রামটিকে কেন্দ্র করে। মনে পড়ছে, শীতের এক অপরাহ্ণে কলকাতার শ্মশানের বহ্নিশিখায় এক মাকে হারিয়েছিলাম। বহুদিন পরে আর এক খণ্ডপ্রলয়ে পূর্ববাংলার দিগন্ত বিস্তৃত হিংসার আগুনে হারালাম আমার দেশমাতাকে। জননীর সংগে সংগে জন্মভূমিও গেলেন আমাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে। অসহায় বোধ করছি নিজেদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। যাঁর স্নেহাঞ্চলে বড়ো হয়েছি তাঁর প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ থাকা বিচিত্র নয়। প্রকৃতির পরিহাস এমন নির্মমভাবে কেন আমাদের ওপর বর্ষিত হলো? সংসারের অমোঘ বিধানে একদিন এই ধরাতল থেকে সকলকেই যেতে হবে—তাই জ্বলন্ত চিতাগ্নির মধ্যে গর্ভধারিণী মাকে চিরবিদায় দিয়ে এসে বিয়োগব্যথায় মুহ্যমান হলেও সময়ের পদক্ষেপে তা ফিকে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মাটির মা—যাঁর সংগে জীবনে ছাড়াছাড়ি হবার কোন সম্ভবনাই নেই সেই মাকে হারানোর ব্যথা ভুলবো কি করে? রাত্রিদিন অন্তরের অন্তঃস্তলে গভীর ক্ষতের অসহ্য যন্ত্রণা মনকে বিকল করে দিচ্ছে যেন। প্রকৃতির অফুরন্ত

সৌন্দর্য-সম্পদ থেকে আমি নির্বাসিত। স্বর্গ থেকে বিদায় হলাম কোন পাপে জানি না। অপূর্ব সুষমামণ্ডিত আমার ছেড়ে আসা গ্রামের চারদিকে শুধু সবুজের প্রাণভোলানো হাতছানি। সর্বত্রই ছিল সম্ভাবনার সুর, কিন্তু আগমনীর বাঁশি বাজতে না বাজতেই যেন তা রূপান্তরিত হয়ে গেল বিদায়ের সুরে। সুন্দর ভুবন থেকে তো আমরা কোন দিন বিদায় চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম মানুষের মধ্যে বাঁচতে। কবিগুরুর বাণী তাই মনে আনতো প্রেরণা। শহরের রুক্ষমলিন বাঁধন কাটিয়ে যখন আমার মাটির মায়ের স্নেহস্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়ে হাজির হতাম, তখনই কবিগুরুর মহাবাণীর সত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটতো। তখনই মন পাখা তুলে নেচে উঠতো, মুখ দিয়ে অজ্ঞান্তেই বেরিয়ে যেতো, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। মুহূর্তে ভুলে যেতাম শহরের সব গ্লানি, দুঃখকষ্ট, অপমান—জীবনের পুঞ্জীভূত দৈন্য অপসারিত হয়ে সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দিতো নবজীবনের গান। দুপাশে ধানের ক্ষেতের রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা, ভরা জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ খালের মধ্য দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথের দুপাশে ঘন সন্নিবিষ্ট নারিকেল বীথি আর সুপারী কুঞ্জের মনোরম খিলানের নিচে পল্লী মায়ের শুচিস্নিগ্ধ শান্তিনিকেতন। পল্লী মায়ের সেই মনোমুগ্ধকর ছবিখানি চোখ বুঁজে ধ্যান করলে আজো আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজ সেই মাকে হারিয়ে নিজেকে রিক্ত ও সর্বহারা বলেই মনে হচ্ছে—জীবিকার্জনের ধাঁধাঁয় শাহরিক যন্ত্রসভ্যতার চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে আজো মাথা আপনাআপনি জন্মভূমির পায়ের ওপর লুটিয়ে পরে ভক্তি-নম্রতায়। আপন মনেই ভাবি মাটির মাকে কি ভবিষ্যতে আবার তেমনি আপন করে ফিরে পাবো?

আমার ছেড়ে আসা গ্রামও আর এককালের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনেরই এক গৌরবজনক ইতিহাস। মগের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ ঘোষ একদিন জন্মভূমি ভাতশালা গ্রাম ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে অনির্দিষ্ট পথে নৌকো ভাসান এবং বসতি স্থাপনের উপযুক্ত মনে করে বরিশাল জেলার এই গাভা গ্রামেই আস্তানা পাতেন। সে আজ বহু দিনের কথা—তখন চারিদিকে ধূ ধূ দিগন্ত-বিস্তৃত

বিল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়তো না এখানে। তারপর ধীরে ধীরে বহু যুগ পেরিয়ে এসে এই লোকবসতি বাংলার অন্যতম বৃহত্তম গ্রামে রূপান্তরিত হলো—সাধক রামকৃষ্ণ ঘোষের বংশধরদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সংগে সংগে গ্রামও উঠেছিল সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে।

আমাদের পূর্বপাড়ার সংগে পশ্চিমপাড়ার মিলনসেতু ছিল বড়ো পুলটা—বিলের শেষ প্রান্তে অস্তগামী সূর্য যখন অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় যেতো দিগন্তের কোণে তখন এই পুলে বসতো প্রাণচঞ্চল তরুণ আর কিশোরদলের মজলিস। সময় সময় তাদের মধ্যে অসীম সাহসী কোন যুবক হয়তো পুলের রেলিঙের ওপর থেকে ভরা বিলের জলে পড়তো লাফিয়ে। প্রবীণদের আড্ডা বসতো দারোগা বাড়ির ঘাটলায়। পড়ন্ত বেলায় মাঠে মাঠে ছেলেদের খেলাধূলো ও হৈ চৈ হট্টগোলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো সমস্ত গ্রামখানি। ভোরবেলা কিন্তু বাজারই ছিল আমাদের মহামিলন-ক্ষেত্র—ছেলেবুড়ো সবাই সেখানে এসে জুটতো প্রাণের তাগিদে, গল্প করার নেশায়। ঘুম না ভাঙতেই বাজার বসতো আমাদের গ্রামে—যার প্রয়োজন নেই সেও আসতো সকলের সংগে এক জায়গায় ক্ষণিক মেলামেশার আনন্দ উপভোগ করতে! এ ছাড়া, আর একটি মিলনক্ষেত্র ছিল গ্রামের পোষ্ট অফিস। শহরের পোষ্ট অফিসের মতো সেখানে কড়াকড়ি ছিল না—আর পোষ্টমাষ্টার, পিয়ন, ডাক-হরকরারা সবাই ছিল আপনজন, আত্মীয় বিশেষ। পোষ্ট অফিসের দরজায় বাংলায় ও ইংরেজিতে অবশ্য স্থায়ীভাবেই যথারীতি 'ভিতরে প্রবেশ নিষেধ' সম্বলিত সাইনবোর্ডটি ছিল ফলাও করে টাঙানো! কিন্তু আমাদের গতি তাতে রুদ্ধ হতো না কোনদিন,—চিঠি থাক বা না থাক, সটান ঢুকে পড়তাম অফিসের ভেতর। সময় সময় মাষ্টার মশায়ের কাজেও হাত লাগাতাম, শান্ত নিরীহ মানুষটি তাড়াতাড়িতে সব কাজ করে উঠতে হিমসিম খেয়ে যেতেন। তাঁর অবস্থার কথা চিন্তা করে আজো মনটা মুচড়ে ওঠে। কারুর কোন ভালোখবর পেলে তা নিজেই জানিয়ে আসার জন্যে অধীর হয়ে উঠতেন তিনি। জানি না আজ তিনি কোথায়,—সকলকে শুভ সংবাদ দেওয়া যাঁর কাজ ছিল আজ তাঁর শুভ সংবাদ দেবে কে?

গাভার সংগে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন দারোগাবাড়ির দৃশ্য ও তার বিরাটত্বের কথা,—পূর্ববংগের বড়ো বড়ো জমিদারবাড়ির সংগে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে এটি। খালের ধারে প্রকাণ্ড সুদৃশ্য ঘাটলা, নহবৎ, নবরত্ন মঠ—তার ওপরে স্থাপত্যশিল্পের কুশলী নিদর্শন, পূজো মণ্ডপ, বিরাট বিরাট থামওয়ালা নাটখানা, লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখলে দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। এর পরেই সন্তোষের মহারাজা স্বর্গীয় স্যার মন্মথের দাদামশায় বাবু ঈশানের দালানের কথা বলা যায়। কতো বিরাট আর উঁচু হতে পারে একতলা দালান এ তারই যেন একমাত্র দৃষ্টান্ত। সে একতলা কলকাতার তিনতলার সমান।

বর্ষাকালে আমাদের দেশে এঁটেল মাটির কাদা হয় খুব। পায়ের কাদা মাথায় ওঠে এবং ছাড়তে চায় না বলেই অনেকে এই কাদাকে বলেন 'মায়া কাদা'! সত্যিই মায়া কাদা, তা না হলে সে কাদা আজো কেন তেমনি করেই মনের চারপাশে লেপটে আছে? হাজার চেষ্টাতেও উঠছে না সে মাটি,—সে মাটির মায়া কতো তীব্র আজ দূরে বসে বুঝতে পারছি বেশি করে! ছোটবেলায় বর্ষাকালে রাস্তার মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা চারে (সাঁকো) পারাপার হতাম খাল। পরে গাভা সম্মিলনীর চেষ্টায় তা পাকা হয়েছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূতচরণের স্পর্শলাভ করে আমার গ্রাম ধন্য ও পবিত্র হয়ে আছে। হিজলী বন্দী নিবাসে পুলিসের গুলীতে নিহত শহীদ তারকেশ্বর সেনের চিতাভস্ম নিয়ে নেতাজী সেবার গৈলায় আসেন এবং বরিশাল পরিদর্শন করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। খবর পেয়ে আরো দুজন বন্ধুর সংগে গৈলায় গিয়ে চেপে ধরলাম —'সুভাষদা, আপনাকে গাভা যেতেই হবে।' সে স্নেহের দাবী এড়াতে পারেন নি তিনি। গ্রামে একটি শিল্পকলা ও কৃষি-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয় সে সময়। সুভাষচন্দ্র সেই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। সেবার তিনি আমাদের গ্রামের খদ্দর বয়ন প্রতিষ্ঠানটিও পরিদর্শন করেন এবং গ্রামের মধ্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন—'এই গ্রাম ও এই প্রতিষ্ঠান' দুটোই যথার্থ বড়ো, আর আমরা তাঁর এই প্রাণখোলা উৎসাহ-বাণী পেয়ে সেবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! এক একবার ভাবি, নেতাজী যদি

এখনো ফিরে আসেন তাহলে আবার হারাণো গ্রামকে, হারাণো মাকে হয়তো ফিরে পেতে পারি !

ফুটবল খেলায় আমাদের গ্রাম এক সময় ছিল শ্রেষ্ঠ—গাভার টিমের দাপটে বরিশাল জেলা কাঁপতো ভয়ে। খেলা ছাড়াও নাম করার মতো ছিল আমাদের নিজস্ব থিয়েটার ক্লাব—পূজোর পর প্রতি বৎসরই থিয়েটার হতো মহাসমারোহে। এই অভিনয়-প্রতিভাও জেলার গর্বের বিষয়। আমাদের থিয়েটার ক্লাব ছিল এমনি নাম করা। এ ক্লাবের অভিনয় দেখতে বাণারিপাড়া, কুন্দহার, বাইসারি, নরোত্তমপুর, কাঁচাবালিয়া, নারায়ণপুর, ভারুকাঠি, রামচন্দ্রপুর, বীরমহল প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকেও বহু লোক আসতো। গ্রামে যাত্রা হলে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভিড় করতো—এক এক রাত্রে বিশ হাজার লোকের সমাবেশও দেখেছি। দেশ বিভাগের তিন চার বৎসর আগে থেকে স্কুলবাড়ির উৎসাহী যুবক শ্রীনির্মল ঘোষ পুজোর পর নিয়মিতভাবে তাঁর বাড়িতে তিন পালা করে যাত্রা ও সংগে জারি গান দিতে আরম্ভ করেন এবং দেশ বিভাগের পরেও তা চলে আসছিল, কিন্তু এবারের শেষ ধাক্কায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শুনেছি ! যাত্রার সময় দেখেছি উৎসাহ মুসলমানদেরই বেশি। কুড়ি হাজার দর্শক হলে তার মধ্যে পনেরো হাজারই থাকতো মুসলমান এবং তাতে স্থানীয় মুসলমান মাতব্বর ও মুস্লিম স্বেচ্ছাসেবকরাই শান্তি শৃংখলা রক্ষারও ব্যবস্থা করতেন। গান না হলে মুসলমান ভাইরাই দুঃখিত হতেন বেশি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং অভিযোগের অন্ত থাকতো না তাঁদের।

ছেলেবেলার টুকরো টুকরো কতো কথাই না মনে পড়ছে আজ ! স্নানের সময় পুকুরে ডুবানো, 'নইল-নইল' খেলা, কৃত্রিম জলযুদ্ধের মহড়া, খালে নৌকো বাইচ, প্রভৃতিতে সে সব ফেলে আসা দিনগুলো ভরপুর। আনন্দের নির্যাসে পরিপূর্ণ ছিল আমার গ্রামের দৈনন্দিন জীবন। গ্রামে পুকুরের অভাব নেই, ছোট বড়ো পুকুর মিলে শ পাঁচেক তাদের সংখ্যা। এসব পুকুরে স্কুল পালিয়ে ছিপ ফেলে লুকিয়ে মাছ ধরাও ছিল মস্ত একটা আকর্ষণ। জাল দিয়ে মাছ ধরার দিনে যে হৈ-চৈ চলতো আজো তা মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই। দু-চা রটে বড়ো দীঘিও ছিল গ্রামে, তবে তাতে জলের চেয়ে দল-দামই জমে থাকতো বেশি সময়, ওপর থেকে পুকুর

বলে বোঝাই যেতো না। এমনি একটা দীঘিকে জংগল বলে ভুল করে একবার তাড়া খাওয়া এক চোর প্রায় ডুবতেই বসেছিল! দামের নিচে প্রায় দশ বারো হাত জল থাকতো সব সময়। ভবানী ঘোষের বাড়ির দরজার দীঘির পাড়ে দিনের বেলাতেই গা ছম্‌ছম্‌ করতো—দীঘির পাড়ে তাল, তেঁতুল, গাব গাছের সমাবেশ সে স্থানটিকে করেছিল আরো ভয়ংকর। শুনেছি আগে নাকি ঐ দীঘির জলে চড়কের গাছ ফেলে রাখা হতো এবং আর কেউ তার কোন সন্ধান পেতো না—কিন্তু চড়ক পূজোর আগের দিন দীঘির পাড়ে এসে ঢাক বাজালে চড়ক গাছ নিজে থেকেই নাকি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে পড়তো। গ্রামের মুসলমান পাড়ার শেষপ্রান্তে অবস্থিত 'গুয়া চোত্‌রা'র দীঘি সম্পর্কেও একই রকম অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

ছোটবেলার এক উত্তেজনাকর খেলা ছিলো ঘুড্ডির প্যাঁচ, অর্থাৎ ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। এ নিয়ে বহু কলহ বিবাদ হয়ে গেছে বন্ধুদের সংগে। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনাও কম ঘটেনি—জীবনান্ত পর্যন্ত হয়ে গেছে। আমিও একবার সাক্ষাৎ যমালয় থেকে সসম্মানে এসেছি ফিরে। মাস ছয়েক ঝোল ভাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে ডাক্তার দাদু হেসেছিলেন আমার দুরন্তপণার কথা শুনে,—বাবা-মাও কম ভর্ৎসনা করেন নি সেদিন। ঘুড়ি-লাটাই সেইদিনই দূর করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে, অসহ্য ব্যথায় আমি পিটপিট করে শুধু দেখেই গিয়েছিলাম মর্মান্তিক ঘটনাগুলো! আজ মনে পড়লে হাসি পায়, ছোট বেলায় ঘুড়ি-লাটাইকে কী দুর্মূল্য বস্তু বলেই না মনে হতো! আর তা অন্য লোককে দান করে দেওয়ায় সেদিন যে দাগা লেগেছিল তার কোন অর্থই আজ আর ভেবে পাই না। সে মন আজ অদৃশ্য, সামান্যকে অসামান্য করে দেখা যে কতো কঠিন তা আজ বুঝতে শিখেছি! সে মন কি আমাদের সম্পূর্ণ মরে গেছে? এই ঘুড়ি ওড়ানোর মতো আর একটা ডানপিটে কাজ ছিল আমাদের—সে হচ্ছে অন্ধকার রাত্রিতে মজা করে ডাব পেড়ে খাওয়া। এর জন্যেও বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। ডাব-সমুদ্রের দেশেও ডাব চুরি করতে গিয়ে বকুনি খেয়েছি! অবশ্য এটা ঠিক চুরি পর্যায়ে পড়ে না—এটা ছিল এ্যাড্‌ভেঞ্চার এক ধরণের। এ খেলা

তারুণ্যের দুঃসাহসিকতায় ছিল ভরা, যে দুঃসাহসিকতার নেশা আজকের দিনের জীবনকেও চঞ্চল করে তোলে মধ্যে মধ্যে।

আমাদের গ্রামে ব্রত-পূজো-পার্বণ লেগেই থাকতো। তার মধ্যে দুর্গা পূজোটাই ছিল বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীপূজোর মতোই ঘরে ঘরে হতো দুর্গাপূজোর আয়োজন। একটা গ্রামে চল্লিশটি পূজো, সে কি কম কথা? পূজোর সময় গ্রামের চেহারাই যেতো বদলে, সবার মুখে আনন্দের ছাপ। মহালয়া দিন থেকেই হাটে বাজারে সর্বত্র ভিড়-ছিম্‌ছাম্‌ ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ে সজ্জিত যুবকদের দেখে নির্জন গাভাকে এক নতুন শহর বলেই ভ্রম হতো! যে সব ঢাকী বাঁধা ছিল তারা তো আসতোই, উপরন্তু বাণারিপাড়ার বাজার থেকে আরো ঢাকী বায়না করে আনা হতো উৎসবকে বেশি সজীব করে তোলার জন্যে। এই ঢাক বাছাই করা যার তার দ্বারা হতো না, এর জন্যে প্রয়োজন হতো অভিজ্ঞ লোকের তৈরী কান! বাজনার সংগে চমকদার নাচ দেখিয়েও ঢাকীরা খদ্দেরদের মন আকর্ষণ করতো অনেক সময়। সে ঢাকীরা বেশির ভাগই ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলের মুসলমান। এরা সাধারণত 'নাগাবুচি' বলেই পরিচিত ছিল। পূজোর আর একটি জিনিষ বেশি করে মনে পড়ছে, সেটি হলো আরতি—আমাদের দেশে বলে 'আল্‌তি'। এই আল্‌তি বরিশাল জেলারই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার। পুরোহিতের আনুষ্ঠানিক আরতি শেষ হয়ে গেলে বাড়ির ও গাঁয়ের ছেলেরা এবং অনেক বাড়িতে ভাড়াটে ওস্তাদরা এই আল্‌তি দিতো। এক এক বাড়িতে রাত্রি কাবার হয়ে যেতো তবুও শেষ হতো না আল্‌তি! সেরে সেরে ধুনো, গুগ্‌গুল্‌ ও ঝাঁকা ঝাঁকা নারকেল ছোবড়া পুড়ে ছাই হতো। কতো রকম কসরৎ ছিল এই অনুষ্ঠানে—এক সংগে দুহাতে দুটো ধুপতি ও মাথায় একটা ধুপতি নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য নাচ্‌লেও মাথার ধুপতি স্থানচ্যুত হতো না দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম শৈশবে। যাঁদের বাড়িতে এসব পাট ছিল না তাঁদের ঢাকী গিয়ে যোগ দিতো পাশের বাড়িতে। আলতির সময় ঢাকীদের চাংগা রাখার কতো প্রক্রিয়াই না ছিল—কতোভাবে সিদ্ধির সরবৎ করে যে ওদের খাওয়ান হতো তার ইয়ত্তা নেই!

ধান চালের দেশ বরিশাল জেলা, কাজেই সেখানে নবান্নের ঘটা যে একটু বেশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! ধনী-দরিদ্র সকলেই সাধ্যানুযায়ী নবান্ন করতো। অগ্রহায়ণ মাস ভরেই চলতো এই নবান্নের আবাহন। পূজোর মতোই এ উপলক্ষে বাড়ি ফিরতেন অনেক প্রবাসী লোক। নীল পূজোও আমাদের গ্রামে কম হতো না। কয়েক দিন ধরে 'বালা'র নাচ, হরগৌরীর বিবাহের পালা, নানাধরণের সঙ্ আর শোভাযাত্রা এবং শেষে ভোগসরানো। চৈত্র সংক্রান্তির দিন দারোগা বাড়িতে মেলা বসতো। সেই থেকে সমস্ত বৈশাখ মাস ধরেই গ্রামে মেলা চল্‌তো। ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি, চাকর-দাসী সকলেই এই মেলা উপলক্ষে বাড়ির কর্তাদের কাছ থেকে পার্বনী পেতো। মেলার সময়কার হাসিখুসি ছবিটির কথা মনে পড়লে আজো উন্মনা হয়ে পড়ি। সেদিনকার আনন্দের দিন কি আর কখনো ফিরে আসবে না মানুষের জীবনে? অতবড়ো গ্রাম আজ একেবারে ছন্নছাড়া শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। শিবাদল শ্মশান জাগিয়ে শব সাধনায় মেতেছে—এ মাতনের শেষ কোথায়?

আমাদের অঞ্চলটি সবদিক থেকেই বরিশাল জেলার একটি উন্নত এলাকা এবং আশেপাশের ছোটবড়ো গ্রামগুলোও বাংলাদেশে কমবেশি পরিচিত। এ সবের মধ্যে বাণারিপাড়ার কথাই সবিশেষ বলা যায়—গ্রাম হয়েও শহরের মর্যাদা তার। বন্দর এবং বড়ো হাট-বাজারের গঞ্জ হিসেবে তার প্রসিদ্ধি। পাশেই নরোত্তমপুরে রায়েরহাট নাম করা হাট। বাকপুর গ্রামে মাঘী সপ্তমীতে সূর্যমণির যে বিরাট মেলা বসতো তার কথা সবারই জানা। আমাদের গ্রামের পাশেই মৌলবী ফজলুল হকের গ্রাম চাখারের অধুনা খুব উন্নতি হয়েছে। হক সাহেবের দৌলতে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে—এ ছাড়া নতুন নতুন রাস্তা, সাব রেজেষ্ট্রি অফিস হওয়ায় গ্রামের চেহারা গেছে পাল্‌টে। আমাদের গ্রামের একদম লাগাও পূবদিকে ব্রাহ্মণ-প্রধান বীরমহল গ্রাম, আর তা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলেই কাঁচাবালিয়া ও রামচন্দ্রপুর। গাভার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিল অঞ্চলে আটঘর ও কুড়িয়ানা গ্রাম দুটি নমঃশূদ্র-প্রধান। এ অঞ্চলের মাটিতে সোনা ফলে বলে প্রসিদ্ধি আছে। এখানকার শাক-সব্জী ও ফলমূল, বিশেষ করে

আখ আর পেয়ারার সত্যি তুলনা হয় না। দীর্ঘ পাঁপের সোনালী রঙের আখ আর কাশীর পেয়ারার চেয়েও বড়ো পেয়ারা লুব্ধ করে যে কোন লোকের মনকে! নমঃশূদ্ররা গ্রাম ছাড়বে না বলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু শুনলাম তারাও আটঘর ও কুড়িয়ানার মায়া ত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গেছে!

ছুটির সময় যখন গ্রামে ফিরতাম তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়—স্টিমার যেয়ে ভিড়বে স্টেশনে, সে পর্যন্ত দেরী সহ্য হতো না প্রবাসী মনের। ষ্টিমার থেকেই চোখে পড়তো পল্লীমায়ের মনোমোহিনী রূপ। প্রথম সূর্য কিরণে বাসণ্ডার জমিদার বাড়ির নবরত্ন মঠের চূড়ো জ্বলতো জ্বল জ্বল করে, খালের জলে পড়তো তার শতধা প্রতিচ্ছবি। ঘাটে বাঁধা থাকতো জমিদারদের সবুজ বোট। চলার পথে একে একে উঁকি দিতো বাসণ্ডার স্কুল, বাউকাঠির হাট, পিপলিতার রায়ের বাড়ির দরজার মঠ, আরো কতো কি! এসব অতিক্রম করলেই দেখা পেতাম গাভা স্কুলের—তখন মন বল্গাহীন, অপূর্ব হিল্লোলে হৃদয়তন্ত্রী উঠতো নেচে। পটে আঁকা ছবির মতো পরিচ্ছন্ন আমার গ্রাম,—পূবের বাড়ির 'রেইন ট্রী' গাছের কাছে নৌকো বেঁধে লাফিয়ে পড়তাম পল্লীমায়ের কোলে, শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যেতো তখন। তাড়াতাড়ি সোজা রাস্তায় লোকের বাড়ির মধ্য দিয়েই ছুটে যেতাম আমার কুটিরে —যেখানে জন্মভূমির সংগে জননীর স্নেহের পরশ ছিল মিশে। তাঁদের দ্বৈত স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি একদিন, কিন্তু আজ? সে সব আকর্ষনী শক্তি কোথায় গেল? নিজের গ্রামে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না কেন? সব কিছু হারিয়ে কেন আমরা সর্বহারা উদ্বাস্তু হয়েছি? স্বাধীনতার জন্যে? সে স্বাধীনতা কোথায়? আবার কবে আমার জন্মভূমির কোলে ঠাঁই পাবো, তার দিন গোনা ছাড়া উপায় দেখছি না কিছু। মনকেই প্রশ্ন করছি বারবার—মায়ের ডাকে আবার আমরা মিলবো কবে? কবে মায়ের পায়ে আবার মাথা ঠেকাবার সৌভাগ্য হবে?

কাঁচাবালিয়া

জল—জল—জল, চতুর্দিক জলে ভর্তি। মনোরম সরসতা। জল দেখে চিত্ত বিকল হয় না, আশা জাগে, মন ভেসে যায় সাত সমুদ্দুর তের নদী পারের নারিকেল-সুপারী-ঘেরা সবুজ দারুচিনি দ্বীপের প্রাণমাতানো পল্লীমায়ের কাছে! শুষ্ক রুক্ষ শহরের বুকে বসে আজ বেশি করে মনে পড়ছে আমার জননী জন্মভূমির কথা, আমার সোনার বরণ কাঁচাবালিয়াকে। আজ আর তার সোনার রঙ্ নেই, পুড়ে কালো বিবর্ণ হয়ে গেছে। মানুষের লোভ, মানুষের স্বার্থ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব তার গৌরবময় ঐতিহ্যের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে! আমাদের বর্বরতা, আমাদের কলংক, আমাদের বিরোধ সমস্ত কিছু সৎপ্রচেষ্টারই ঘটিয়েছে অবসান। যে দেশের বাতাস টেনে নিয়ে এতো বড়োটি হয়েছি, যে দেশের ধূলোয় উঠেছে শরীর গড়ে, যে দেশের খাদ্য জুগিয়েছে শক্তি, সেই দেশকে আমরা আর নিজের জন্মভূমি বলতে পারছিনা ভেবে বুক ফেটে যাচ্ছে অসহ্য ব্যথায়! আজকের এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে কে শান্তির বারি সিঞ্চন করবে জানি না, পৃথিবীর উত্তপ্ত বুকে কে শীতলতা বইয়ে দেবে তার সন্ধানই করছি শত দুঃখকষ্টকে অগ্রাহ্য করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে। কবে দেখা পাবো আমরা সেই মহামানবের, কবে বলতে পারবো রবীন্দ্রনাথের মতো—ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে তার রোমাঞ্চ লাগে?

শরীরে শিরা-উপশিরার যেমন কাজ রক্ত চলাচলে সহযোগিতা করা, তেমনি নদীর কাজ দেশের বুকে ফসল ফলাবার। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার কাজে নদীই প্রধানতম সহায়,—তাই আমাদের গ্রামখানি ছিল এতো সজীব, এতো সৌন্দর্যের প্রতীক। জালের সুতোর মতো অসংখ্য খাল বিল দিয়ে জোয়ারের জল আসতো জীবনের জোয়ার নিয়ে। খালের প্লাবন ধ্বংসমুখী হয়ে কোনদিন কাঁচাবালিয়ার বুকে দেখা দেয়নি,—সেখানে নদী বর্ষাকালেও গ্রাম প্লাবিত করে যেমন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে না, তেমনি আবার শীতকালেও জলের অভাব ঘটিয়ে মানুষকে নাকের

জলে চোখের জলে করে ছাড়ে না। উত্তর অঞ্চলের গোঁয়ার নদীর মতো দুষ্টু আমাদের গ্রামের নদী নয়, সে মানুষের মতোই মানুষের দুঃখকষ্ট বোঝে, মানুষের সুখদুঃখের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায় সে গৃহস্থ বধূর মতো! আমার গ্রামবাসীরা সেদিক থেকে ছিল সত্যি ভাগ্যবান। অধ্যাপক হেম গুহ তাই মাঝে মাঝে রসিকতা করে নদীটিকে আহ্বান জানাতেন 'ভেনিস্ সুন্দরী' বলে!

যথার্থ নাম হয়েছিল এই 'ভেনিস সুন্দরী'। ঝরঝরে, তকতকে, পুণ্যতোয়া ব্রীড়াবনতা শান্ত নদীর অন্য কোন নাম যেন মানায়ই না। নারকেলকুঞ্জ, সুপারীর বাগান, আম কাঁঠাল-কদলীগুচ্ছের ধারে ধারে বাঁশবনঘেরা সুদৃশ্য সব বাড়ি—কুড়ি ত্রিশ হাত পরিসর খাল চলে গেছে এঁকে বেঁকে সুতোর মতো সমস্ত বাড়িকে স্পর্শ করে। আবার কোথাও কোথাও পরিখার আকার ধারণ করে বেষ্টন করেছে গোটা গ্রামকে। সীমার মধ্যে অসীম হয়ে ওঠার সাধনাই যেন তার প্রধান সাধনা। এ হেন উত্তর বরিশালের মধ্যমণি ছিল আমার ছেড়ে আসা গ্রামখানি। বংগজ কায়স্থ প্রধান কাঁচাবালিয়ার সীমানা ছিল এক মাইলেরও কম, কিন্তু তাতেই সে কখন গড়ে তুলেছিল তার নিজের ঐতিহ্য। সৌন্দর্য সাধনার ক্ষেত্রে সে হয়ে উঠেছিল মহিমময়ী, মহীয়সী!

প্রবাদ আছে সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণের মগ-অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ-মান-ইজ্জত রক্ষার জন্যেই গুহ আর বসু বংশীয়েরা চলে এসে বসতি স্থাপন করেন এখানে। চন্দ্রদ্বীপের ভূঁঞা কন্দর্পনারায়ণের আশ্রয়ে পার্শ্ববর্তী গাভা, নরোত্তমপুর, বাণারিপাড়া, উজিরপুর, খলিসাকোটা প্রভৃতি গ্রামে দেখতে দেখতে বিরাট সভ্য সমাজ গড়ে উঠলো। ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি এসে এঁদের অনেকেই কৌলিন্যের খোলস ত্যাগ করে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন জ্ঞান ও অর্থের উৎস সন্ধানে। তাঁদের কেউ কেউ যান ঢাকায়, কেউ কেউ সরাসরি কলম্বাসের মতো পাড়ি দেন কলকাতা মহানগরীতে! সেকালে ম্যাট্রিক এবং ছাত্রবৃত্তি পাশ করে অনেকে ডাক্তারী লাইনেও গিয়েছিলেন। চিকিৎসাজগতে গিয়ে সুনাম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কটকের জেলা অধিকর্তা মণীন্দ্র গুহের পিতা কীর্তি স্থাপন করেছেন। সে সময় পদ্মা নদী এতো বিপুলকায়া হয়ে ওঠেনি। সবে

রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করতে আরম্ভ করেছে। আমার পূর্বপুরুষগণ দেখেছেন সেই কীর্তিকে গ্রাস করেছে কি করে কীর্তিনাশা পদ্মা। প্রতিমার চালচিত্রের মতো ধীরে ধীরে ডুবে গেছে সেই সভ্যতা, সেই সংস্কৃতি, সেই বীর্যবান পুরুষের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ভাবলেও শিহরণ জাগে শরীরে—সেইদিনকার মতোই কি আমাদেরও কীর্তিনাশ হলো না আজ? আজকের মতো অসহায়তা নিয়ে সেইদিনের বুকেও কি দুঃখের বুদ্বুদ ওঠে নি মানব মনে?

কিন্তু সেই শ্মশানের মধ্যে থেকেও আলো উঠেছে জলে। সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতার মধ্যেই মানুষ থাকবে বেঁচে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আবার গড়ে উঠলো রাস্তাঘাট, পুকুর, দালান, টিনের কোঠা, পাকা দালান—আবার গ্রাম শ্রীমণ্ডিত হলো রাজবল্লভের বংশধরদের আপ্রাণ চেষ্টায়। প্রাণের বাতি জ্বাললেন গ্রামে গ্রামে, আবার মানুষের মুখে ফুটলো হাসি, গান, গল্প। মানুষ আবার মানুষ হলো!

সেই হাসিগানের রেশ মেলাতে না মেলাতেই আবার নেমে এলো বিপদের কালো যবনিকা, শংকিত মানুষ দিশেহারা হয়ে প্রাণভয়ে ছুটলো দেশ-দেশান্তরে! কেন এমন দুর্ভাগ্য নেমে আসে বার বার লাঞ্ছিত মানুষের ভাগ্যে? মগের অত্যাচার থেকে জীবন বাঁচাতে একবার আমাদের দেশত্যাগী হতে হয়েছিল—আবার দেশত্যাগে বাধ্য হলাম বিংশ শতাব্দীর হিংস্র বর্বরতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে! ইতিহাস আমাদের ভাগ্যে কি লিখেছে জানিনা,—আজ শুধু তার নির্মম রসিকতাটুকুই উপভোগ করছি সর্বস্ব খুইয়ে নতুন ইহুদীর পর্যায়ে নেমে এসে! ভারত-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রীদ্বয় সেদিন বাণারিপাড়া গিয়ে নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামের শ্মশানশ্রী দেখে! দেখবার সময় তাঁদের একবারও কি মনে হয় নি সেই কাম্বোডিয়ার সুষুপ্তা সুন্দরী বা Sleeping Beauty-র উৎস ভূমির এমন বৈধব্য-মলিন চেহারা কেন হলো? কোথায় গেলো তার সৌন্দর্য? কোথায় গেলো সেই পূর্বস্মৃতির রূপালীরূপ? শতবর্ষ আগে ভয়াবহ ওলাওঠা যা করতে পারেনি, সর্বনাশী ৭৬ এর মন্বন্তরে দেশের যে হাল হয়নি, ১৩৫০-এর নাগিনীর দীর্ঘশ্বাস যে গ্রামের অংগে কালির কলংক লেপে দিতে পারেনি, সেই অভাবিত সর্বনাশ কেন হলো স্বাধীনতা লাভের মাত্র আড়াই বছরে

মধ্যে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু মানুষ কি আজ আর মানুষের পর্যায়ে আছে? মানুষ কেন মানুষকে আজ সাপের মতো ভয় করছে? জানি মানুষের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই আজকের যুগের প্রধানতম সংগ্রাম! সেই সংগ্রামে জয়ী হবো আমরা—হে ঈশ্বর, শক্তি দাও আমাদের মনে! আমরা অমৃতের পুত্র—বিষক্রিয়া আর কতোদিন কাজ করবে আমাদের ভেতর?

বাইশ শ লোকের গ্রাম ছিল কাঁচাবালিয়া। তার বাসিন্দাদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী, সুচিকিৎসক, সুবিচারক, কৃতী অধ্যাপক, নামজাদা শিল্পী এবং সংগীতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে বাইরে কাটালেও জন্মভূমিকে তাঁরা ভোলেন নি একদিনের জন্যেও। তাঁদের আন্তরিক টান গ্রামবাসীকে মুগ্ধ করতো। মনে পড়ে, পুণ্যতোয়া নদী হিমালয়ের গাত্র ধৌত করে পলিমাটি সঞ্চয়ের কাজ সমাপ্ত করতো যখন, তখন শুভ্র শরতের হতো উদ্বোধন। লক্ষ্য করেছি সেই শারদপ্রাতে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ছুটে আসতেন তাঁরা এই নদীমাতৃক জন্মভূমির পায়ে হৃদয় নিঙরানো শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্যদানের জন্যে। আজ ইচ্ছে থাকলেও মায়ের কাছে ছুটে যাবার উপায় নেই আমাদের। আমরা এখন পরবাসী, অবাঞ্ছিতের দল। তা ছাড়া সেই জল, সেই হাওয়া কোথায় আজ?

মনে পড়ছে আজ বেশি করে মজিদ সাহেবের কথাগুলো! আমাদের দেশ ছাড়া হতে দেখে তিনি একদিন বলেছিলেন—'আপনাদের ভয়টাই বড় বেশি'। স্বীকার করতে মনে বেঁধেছিলো তাঁর অভিযোগটি। আমরা ভীত নই, আমরা কাপুরুষ নই, আমরা দুর্বল নই। আমরা অযথা হানাহানি, রক্তপাতে অসহায় বোধ করি। এই সেদিনও আমাদের গ্রামের ছেলেরা বর্শা দিয়ে বাঘ শিকার করেছে। মাত্র ৩০ বছর আগে আমাদেরই বুটবিন্ সরকার একখানা খাঁড়া দিয়ে এক সংগে দুটো বাঘ ঘায়েল করেছিল। এগুলো গালগল্প নয়, দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। তবুও মজিদ সাহেবের কথা শুনে চুপ করেই থাকতে হলো। তর্ক করে গায়ের শক্তি সপ্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে কি হবে আর? আজো তো কিছু মেয়েপুরুষ রয়েছে সেখানে, তাদের মনোবল প্রশংসা করার মতো। সেই

শূন্য পুরীতে এখনো যে কেউ কেউ ফিরে যায় তা কি শুধু দুটো ফলের জন্যে, না, অকৃত্রিম প্রাণের টানে?

শহীদ সাহেব আসবার সময় জানিয়েছিলেন—'আপনাদের রক্ষা করলাম, আর আপনারাই আমাদের এভাবে ছেড়ে যাচ্ছেন? এসব কি ভালো করছেন মশায় আপনারা? এখান থেকে এমনভাবে দলে দলে গেলে সিকি লোক মরবেন শুধু না খেতে পেয়ে, গুণ্ডায় মারবে সিকি, আর বাকি লোক মরবেন শীত-গ্রীষ্ম-অনাহারে।' এরই পিঠ পিঠ অবশ্য বলেছিলেন গম্ভীর হয়ে কেটে কেটে—'আমরা মসজিদে মোনাজাত করার সময় খোদার কাছে প্রার্থনা করেছি এই বলে,—খোদা, আমাদের প্রতিবেশীদের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তারা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক।' শহীদ সাহেবের কথা আজো কানে বাজছে। তাঁর প্রার্থনা খোদার কানে গেছে কিনা জানি না, কিন্তু এমন দরদীমনের পরিচয় পেয়ে সেদিন চোখ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতার জল ঝরে পড়েছিল।

কিন্তু সুবিধাবাদী চ্যাংড়ার রূপ সর্বত্রই এক। ওখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমাদের মধ্যে যখন এই ধরণের হৃদয়াবেগের কথা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় এসে হাজির হলো আসমান। খানিকক্ষণ হাঁফ ছেড়ে সামনের চেয়ারটায় বসে দুবার লাঠি ঠুকে অকস্মাৎ প্রশ্ন তোলে—'কি কইছো মেঞারা? আমাগো পাকিস্থান ছ্যাইড়্যা মহায়রা এ রকম যায় কা?' তারপর একটা চোখ ছোট করে আমার দিকে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠী ষড়যন্ত্রীর মতো বলে—হনুছি কিছু ব্যাচোনের আছে? বাড়িডা বোলে ব্যাচবেন?' তার কথা শুনে আমরা সবাই তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম! ছোকরা বলে কি, বাড়ি কেনার টাকা হলো কোথা থেকে ওর?

কথাটা যাচাই করার জন্যে মজিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করিছিলাম—'এই আপনার দল? এরাই আমাদের রক্ষা করবে বিপদ-আপদের মধ্যে?' কাঁদ কাঁদ হয়ে ম্লানমুখে মজিল সাহেব শুধু জানালেন—'সবই বুঝি ভাই, একটা কথা কি জানেন? এমনিভাবে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে আমরা কাদের নিয়ে থাকবো বলুন? আপনাদের সংগে একত্রে এতোদিন বসবাস করার পরেও যদি অনাত্মীয়ের মতো আমাদের ছেড়ে যান তাহলে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশের কথা আর কি হতে

পারে! এরা শিশু, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার বুদ্ধি কোথায় এদের? পাপের আপাতমধুর স্বাদেই বিভোর হয়ে রয়েছে এরা, এদের কথার তাই দাম নেই কিছু। সমস্ত হিন্দু গ্রাম ছেড়ে গেলে হিন্দুর মনে যে রকম কষ্ট লাগে, আমাদেরও সেই একই রকম কষ্ট হয়।' লক্ষ্য করেছি কথা বলতে বলতে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখ বেয়ে। জানি না মজিল সাহেবের সাংগপাংগরা তাদের হিন্দু ভাইয়ের অভাব অনুভব করেন কিনা আজো, কিন্তু আমরা দুবেলা স্মরণ করি তাঁদের অশ্রুরুদ্ধ নয়নে। আজ তাই বারবার মনে পড়ছে মজিল সাহেব আর শহীদ সাহেবের কথা। কিন্তু গ্রাম ছাড়ার সময় তাঁরা আরো নিবিড় করে বাধা দিলেন না কেন? কেন তাঁরা প্রাচীর তুলে দিলেন একই মায়ের বুকের ওপর? এ সর্বগ্রাসী দুঃখ তো ভবিষ্যতের হিন্দু মুসলমান মানবে না। এযে সকলকেই নিষ্ঠুর ভাবে দলন করে চূর্ণ করে দেবে! তবে দুঃখী মানুষ আজো কেন জাতিভেদের জাঁতিকলে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে অকারণ? কেন তারা বিদেশী চক্রান্তের ক্রীড়নক হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজে করছে আহম্মকের মতো? এ প্রশ্ন কাকে করি? কে উত্তর দেবে? পাকিস্তান থেকে মজিল সাহেবও কি এমনি চিন্তাই করছেন আজ?

এমন সোনার দেশ কি কারো ছাড়তে ইচ্ছে হয়? প্রথম প্রথম ভীত মানুষ যখন দু-একজন করে ঘরবাড়ি বিক্রী করে দিয়ে চলে আসতে সুরু করে তখনো প্রমদা ঠাকরুণ গৃহনির্মাণ ও উদ্যানরচনায় ব্যস্ত। দেশে এমন দাবানল জলে উঠবে কে চিন্তা করেছিল? ভাই-এ ভাই-এ কোন্দল হয় আবার মিটে যায়, কিন্তু সেদিনের সামান্য ফুলকিই যে দেশজোড়া তাণ্ডবের সৃষ্টি করবে তার হদিসও সামান্য মানুষ পায় নি। প্রমদা ঠাকরুণ মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, গ্রাজুয়েট পুত্রবধূ এনেছিলেন ঘরে। নিজে লেখাপড়া তেমন না জানলেও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর আন্তরিক। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি খাটতে পারতেন অসম্ভব। নিজের হাতে রেঁধে তিনি কতো ভোজ নামিয়ে দিয়েছেন গাঁয়ের। জানি না তাঁর সাজানো বাগান আজ শুকিয়ে গেছে কি না!

সোনালী ভবিষ্যতের কথা তুলতো মাঝে মাঝে কচি মেয়ে কল্যাণী। সে আব্দার করতো আমাদের গ্রামের এই কাঠখোট্টা নামটা পালটে কাঞ্চনবালা রাখলে হয় না?

হিন্দুরা যেমন সবাই লিখতে পড়তে জানে, মুসলমানরাও সেই রকম লিখতে পড়তে শিখবে কবে? ওরা সবাই কেন হিন্দুর মতো স্কুলে যায় না, জ্যেঠামশায়? এমনি কতো অদ্ভুত অদ্ভুত কথার স্মৃতি ভিড় জমাচ্ছে আজ মনের আকাশে। আজ সে অনেক বড়ো হয়েছে,—আমাকে দেখতে এসে সেদিনও বলে গেছে, 'এখন আর গ্রামের কয়েক বিঘে জমিই আমাদের বাড়ি নয় জ্যেঠামশায়, এখন আমাদের বাড়ি সমগ্র ভারত জুড়ে!' কল্যাণী এতো দুঃখেও ভেঙে পড়েনি,—সে যেন বিরাটত্বের স্বাদ পেয়েছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ সাবডেপুটি দেবেনবাবু সমস্ত কাজ ফেলে পূজোর সময় দেশে আসতেন ছুটে। তিনি না এলে মা আসবেন কি করে? তাঁর আসার পরদিন থেকেই সুরু হতো আগমনী সংগীত। ভিখারী-বাউলরা সাবডেপুটি বাবুর চারপাশ ঘিরে আরম্ভ করে দিতো গান—

'আসছেন দুর্গা স্বর্ণরথে
কার্তিক গণেশ নিয়ে সাথে।
আসছেন কালী পুষ্পরথে
মুণ্ডমালা নিয়ে গলে॥'

দুর্গাপূজোর ধুমধাম যেন আজো জলজ্বল করছে চোখের সামনে। কী হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে যেতো দিনগুলো তা চিন্তা করেও আশ্চর্যবোধ হয় আজ। আজ একটি দিন কাটতে চায় না, দুঃখের জীবনপৃষ্ঠা ওল্টাতে যে এতো বিলম্ব হয় তা কে জানতো আগে! কিন্তু সেদিন সারারাত জেগে রামায়ণগান শোনার উৎসাহ পেতাম কোথা থেকে! আনমনা হলেই সেইদিনকার রামায়ণগানের টুকরো টুকরো কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে অজান্তে শতদুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করে—

'অযোধ্যানগরে আজ আনন্দ অপার
রাম রাজ্যেশ্বর হবে শুভ সমাচার।
পল্লব কুসুমহারে কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে
প্রতি ঘরে সবে করে মংগল আচার।
মধুর মংগল-গীত শুনি অতি সুললিত
বাজনা বাজিছে কত বাজে অনিবার॥'

চোখের সামনে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা। প্রতি ঘরে ঘরে যাদের আনন্দধ্বনি জাগতো তাদের ঘরে আজ মর্মরধ্বনি কেন জাগছে? আলোকের ঝর্ণাধারায় কি এই দুঃখকষ্টকে ধুয়ে ফেলা যায় না আমাদের জীবন থেকে?

এমনি কতো শত দুঃখের পাঁচালি মনটাকে করছে ক্ষতবিক্ষত। কোন্ দুষ্টু ছেলে আমাদের ঢিলের মতো চক্রাকারে ভারতময় ছিঁড়ে দিলো? রোহিণী কবরেজ মশায়ের ছোট শিশির স্বর্ণপটপটি আজ গড়াতে গড়াতে এসেছে হাবড়ায়! সারা জীবনব্যাপী শ্রমের ফল, কতো বাড়ির জনশূন্য ছবি হয়তো দেখছেন গোপাল দে মশায় বর্ধমানের ঘোলাটে আকাশে! জানকীদাসের লেকচার স্তব্ধ হয়ে গেং‌গে সংগে দা প্ল্যাটফর্মের পূতিগন্ধময় পরিবেশে! অতোবড়ো বাড়ির মালিক ৫২০ যেমন শিশুরন্যার পুতুলী পুত্রকন্যার হাত ধরে এসে মাথা গুঁজেছেন অন্ধকার কাংকারি খ' তাগ' পঞ্চাশ খণ্ড ইংরেজি বিশ্বকোষের পাঠক আজ কারা? কার্ডালেম্বথা মী চকচকে পোষাকটা কি আজ 'ভবের কোলায়' (বড়ো মাঠে) গড়াগড়ি ছাঁটছ? নরেন বসু উকীল হয়তো থিয়েটারের সখ মেটাচ্ছেন রাঁচীতে! তঁ।। সিরাজ আজ চমকে চমকে উঠছে স্বপ্নের মধ্যে আগুন-রক্ত-তরবারি কিংবা বর্শা দেখে!

ভোলা যায় না, ভোলা যাবে না আমার লাঞ্ছিত জন্মভূমিকে। সেই সংগে ভোলা যাবে না বিরাশি বছরের বৃদ্ধ শশী ঠাকরুণের চশমা এঁটে চিঠি পড়ার দৃশ্যকে, ভোলা যাবে না দামোদর বসুর সূক্ষ্ম হিসেব-বিলাসী মনকে, ভোলা যাবে না সাধু ভাষার ধ্বজাধারী ঈশ্বর বসুকে! তিনি সাধুভাষা প্রয়োগ করতেন স্ত্রীর সংগে আলাপ করার সময়েও। তাঁর স্ত্রীর সংগে কথোপকথনের টুকরো কথাগুলো মনে পড়লে আজো হাসি পায়। একবার সামান্য কলার পাতা ছেঁড়ার জন্যে ঈশ্বরবাবু স্ত্রীকে কড়া তিরস্কার করে বলেন—'এত কষ্টে আনীত, ভাদুসার হইতে কদলীবৃক্ষ, তার পত্র ছিন্ন, কে না হয় বিষণ্ণ?' বলেই পত্নীর পিঠে সপাং সপাং করে বেত্রাঘাত!

মনে পড়ছে গ্রাজুয়েট বর দেখতে গিয়ে এই গ্রামেরই একজন পাত্রের হাতের

দেখা চেয়েছিলেন দেখতে! এমন কতো শত কাহিনী মনকে উতলা করছে কেন জানি না। যাঁরা মনের অতলে গিয়েছিলেন তলিয়ে তাঁরা সবাই উঁকি দিচ্ছেন একের পর এক। তাঁরা সবাই কোথায় আজ? মনে মনে তাঁদের স্বাস্থ্য, অর্থ, শান্তি কামনা করছি। তাঁরা সুখে থাকুন, ভালো থাকুন।

শুনেছি আমার গাঁয়ে আর পুজো হয় না, নবান্নের ধুম নেই। মানুষহীন গ্রাম শ্বাপদসংকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কি কোনদিন ছেলেরা ভোরে উঠে কাক ডাকবে—'কাউয়া কোকো কো, আমাগো বাড়ি আইয়ো' বলে? পৌষ-সংক্রান্তির আগে কৃষক-মজুররা আর কি গৃহস্থের বাড়ি এসে—'রাজার বাড়ি আইলাম রে!' বলে দাঁড়াবে? কুমীর আর বাঘের পুজোর সংগে রসের পিঠে, চিতৈ পিঠে খাওয়া হবে আর কোনদিন?

মনুষ্যত্বের অবমাননা পৃথিবীতে এমন ভীষণভ[illegible] [illegible]দন হয় নি, তবুও দুঃখকষ্ট অপমান নির্যাতনের মধ্যে মানুষ অমৃ[illegible]থে[illegible]ই। পাঁচশ বছর আগে তুরস্কের রাজধানী থেকে বিতাড়িত গ্রীক খৃষ্টানরা প[illegible] ইয়োরোপে জ্বেলেছিলেন প্রজ্ঞা ও শান্তির নতুন আলো। সেই আলোয় সম[illegible]ে[illegible]য়োরোপ আজ হয়ে উঠেছে আলোকিত; অত্যাচারী তুরস্কের পরাজয় হলো [illegible]খ[illegible]ড়িত বিধর্মীদের কাছে। মনে হয় বাংলার কাজ হবে নতুন আলোকবর্তিকা [illegible]তে এগিয়ে যাওয়া—সমগ্র দেশের প্রাণে নতুন জীবন যোজনা করা। জানি ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী। ছোট্ট জমির মালিক আর আমরা নই, এখন সারা ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের সাধনা এখন বিরাট হওয়ার, মহৎ হওয়া প্রাণ-গংগার ঢেউ একদিন ঐরাবতের মতো সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই, নতুন পরিবেশে আবার আমরা সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবো, আবার আমরা মানুষ হবো।

মাহিলাড়া

বরিশাল থেকে মাদারীপুর ছত্রিশ মাইল দীর্ঘ যে প্রশস্ত সরকারি রাস্তাটা চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে—তারই মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের জন্মভূমি মাহিলাড়া গ্রাম। গ্রামটি রাস্তার পূব ধারে। এরই প্রায় এক মাইল দক্ষিণে রাস্তা-সংলগ্ন গ্রাম বাটাজোড়, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি। সরকারি রাস্তার সংগে সংগে বয়ে চলেছে সরকারি কাটা খাল।

মায়ের কোলে যেমন শিশুর সুখের সীমা নেই, তেমনি সুখ ছিল আমাদের পল্লী মায়ের কোলে। সরকারি খাল থেকে আর একটা খাল পূব দিকে তিন ক্রোশ দূরে গিয়ে মিশেছে আড়িয়ালখাঁ নদীতে। এই খালের দুই তীরে ছবির মতো গ্রাম মাহিলাড়া। জোয়ার ভাঁটায় খালের জল সদাই চঞ্চল, যেন পল্লীমায়ের বুকে দুলছে একছড়া কণ্ঠহার। ভোরে যখন সূর্য ওঠে, পূর্ণিমায় যখন নীল আকাশে চাঁদ ফোটে, তখন খালের জলে লক্ষমাণিক জ্বলে।

মাঝখানে একটা কাঠের পুল এক করে দিয়েছে এপার-ওপার। পুলের উত্তরে একটা বহু প্রাচীন তাল গাছ, আর দক্ষিণে একটা কদম গাছ। আষাঢ়ে সবুজ পাতার সংগে পাল্লা দিয়ে ফোটে রাশি রাশি কদম ফুল। এরা সজলচোখে হাসি ফুটিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে। খালের দুধারে আরো কতো গাছ—হিজল, জারুল, কাঠাল। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন প্রথম জোয়ারের জল ছুটে আসে কূল ছাপিয়ে, তখন তাতে ভাসে রাশি রাশি হিজল, আর জারুল ফুল। হিজল ফুল লাল, আর জারুল ফুল বেগুনে। অজস্র ফুল পরস্পর মিলে-মিশে রঙীন কার্পেটের মতো ভেসে আসে জোয়ারের জলে, আবার পিছিয়ে যায় ভাঁটার টানে—নদীর দিকে।

গ্রামের উত্তরে খানিকটা দূরে শ্মশ্রুবহুল ঋষির মতো দুটো বট গাছ। বিশাল

ছায়া ফেলেছে পায়েচলা পথের ওপরে। কতো বয়স তাদের হলো কে তার হিসেব রাখে! পূর্ব সীমায় গুপ্তদের দীঘির পাড়ে একটা বকুল গাছ। ফুল ঝরে পড়ে তার দীঘির জলে। দক্ষিণে সরকারের মঠ। তিন চার শ বছরের পুরানো দেউল। তার দেহে ঢেউখেলানো কারু-কাজ। আর একটু পশ্চিমে একটা অশথ গাছ—বুঝি হাজার বছর বয়স হবে তার। এটি গোবিন্দ কীর্তনীয়ার গাছ বলে জনশ্রুতি। কি প্রকাণ্ড দশদিকে ছড়ানো এর ডালাপালা-গুলো। ওখানে নাকি কোন দেবতার বাসা। কেউই চড়ে না ঐ গাছে। আর একটা পুরানো মন্দির গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে—ঐ সরকারের মঠের সমবয়সী ও। এরও সর্বদেহে খোদাই করা ' দ্মফুল, লতাপাতা। ঐ মন্দিরে দুর্গাপূজো হয় প্রতি আশ্বিনে। গ্রামের পশ্চিম সীমায় সরকারি রাস্তার এক প্রান্তে সুদীর্ঘ আর সুবিশাল শিমুল গাছ—শালপ্রাংশু মহাকাল। ফাগুনে আগুন-বরণ ফুল ফুটিয়ে চেয়ে থাকে ও আকাশের দিকে। এই চতুঃসীমার বাইরে ধানের ক্ষেত—সবুজ-সতেজ। অঘ্রাণে বাতাসে ঢেউ লাগে ওদের বুকে। আমরা চেয়ে থাকি অপলক। কি যাদু আর কি মায়া আছে ঐ ঢেউখেলানো সবুজ ক্ষেতে। ইচ্ছা হয় সর্বাংগ ভাসিয়ে কেবল সাঁতার কাটি ঐ মনভোলানো শ্যামসায়রে। অশথ গাছের শোভাই কি কম? ওর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাতা সদাই মুখর, সদাই চঞ্চল প্রাণহিল্লোলে। চৈত্রে কিছুদিন ধরে পাতা ঝোরে ফেলে রোদের কিরণ আর হাওয়া টেনে নেয় ও সর্বদেহে। তারপরে আসে একটা চেতনা। একটু সবুজের ছোপ লাগে ডালপালায়। তারপরে ঈষৎ লোহিত। ক্রমে সবুজ—রঙ বদলায় দিনে দিনে—গাঢ় থেকে গাঢ়তর সবুজে।

সরকারি রাস্তাটার একধারে গ্রামের উচ্চ ইংরেজি স্কুল—আর একদিকে বন্দরের মতো হাটখোলা। ওখানে কামারশালে ঢং ঢং করে শব্দ হয় রাতের বেলা। ডগডগে লাল লোহার কণা ছিট্‌কে পড়ে হাতুরির ঘায়ে। চমৎকার লাগে দেখতে ঐ সৃষ্টিশালা—ওরা শুধু গড়ে।

গ্রামের রাস্তাঘাট গড়েছিল প্রতাপ রায় সদলবলে মাটি কেটে, মাথায় ঝুড়ি বয়ে। তার আগে চলারপথে কোথাও ছিল একহাঁটু জল, কোথাও একগলা।

তারপরে কতোই হলো। কতো প্রতিষ্ঠান—ইংরেজি বিদ্যালয়, বালিকা স্কুল, ঔষধালয়, দরিদ্র ভাণ্ডার, লাইব্রেরী আরো কতো কি! এসবও সেই প্রতাপ রায়ের গড়া। ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দিতো প্রতাপ রায়ের ঘণ্টা—তারপরে উষাকীর্তন। শীতকালে খালে জল থাকতো না ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত। সদলবলে প্রতাপ রায় টেনে বার করে দিতো বিপন্ন মাঝিদের নৌকোগুলো। একবার এই শুকনো খালে আটকেপড়া নৌকোয় ধুকছিল দুটি জরবিকারের রোগী। না ছিল ঔষধ, না পথ্য। তাদের কাঁধে করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের কাছারি বাড়িতে। সেবা হলো দিন রাত। একটি বেঁচে গেল, আর রজনীকে পোড়ান হলো ঐ সরকারি রাস্তার ধারে। গ্রামে অষুধ-পত্তরের অভাব। প্রতাপ রায়ের চেষ্টায় যৌথ তহবিলে হলো ঔষধালয়। অশ্বিনীকুমারের আদর্শ রূপায়িত করেছিলেন প্রতাপ রায়—অক্লান্ত শ্রমে। তাই তো তিনি আশীর্বাদ জানাতে আসতেন প্রতি উৎসবে। খুঁজলে আজো পাওয়া যাবে তাঁর পদরেণু।

রামচন্দ্র দাস ছিলেন প্রেমিক, কবি। ফর্সা রঙ—স্থূলহ্রস্ব দেহ। দুটি বড়ো বড়ো চোখ—প্রীতিরসে ঢল ঢল। শুধু ভালবেসে মানুষ গড়া যায়, তার উদাহরণ যোগালেন রামচন্দ্রবাবু। তাঁর দেহে-প্রাণে-মনে জ্যোতির ঝলক নামতো উর্ধ্ব থেকে অন্তরের গবাক্ষপথে। তাঁর প্রেরণা আসতো যুক্তির পথে নয়, হৃদয়ের অজানিত অন্তঃপুর থেকে—শাশ্বত সত্যের চিরভাস্বর জ্যোতির মত।

আজ প্রতাপ আর রামচন্দ্রের চিতাভস্ম মিশে আছে ঐ পল্লীর পথের ধুলোয়। যাঁদের কাছে এই ধুলো ছিল স্বর্ণরেণু তাঁরা ছিটকে পড়ছেন কোন্ দূর-দূরান্তে। কোথায় সেই নরেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, হরেন গুপ্ত আর রমেশচন্দ্র? তাঁদের চোখে হয়তো ধরণীর আলো হয়ে এসেছে নিষ্প্রভ।

কোথায় চলে গেল সেই অনন্তকুমার! যখন কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠতো—বাঁশঝাড়গুলো ঝড়ের দোলায় নুয়ে পড়তো মাটির বুকে, তখন অনন্তকুমার আমাকে নিয়ে উঠতেন ঐ উঁচু গাছের মগডালে। দেখতাম এলোকেশীর উন্মাদিনী মূর্তি। জীবনে যাই যখন খাঁটি বুঝতো তাই করতো প্রাণ দিয়ে, জীবনের মূল সুরটি ছিল

ভক্তির। সন্ধান করতো তাঁর—যে আড়ালে থাকে—ইসারায় ডাকে। লিখতো সে চমৎকার, গানও গাইতো অতি মধুর।

মনে পড়ে রসরঞ্জনকে। কুষ্ঠরোগীর সেবক নেই। পয়সা পাবে কোথায়—অনাহারে অনিদ্রায় পায়ে চলে নদী সাঁতরে শত শত মাইল চললো সে বৈদ্যনাথে রোগী সেবায়! এরা আজ কেউ নেই—কিন্তু আজো আছে ঐ সুরেন। বেঁচে আছে সে আপন প্রভায়। শৈশবে ছিল সে কবি—ছবিও আঁকতো চমৎকার। গৌরবর্ণ, মুখের কাঠাম মংগোলিয়ান—দীর্ঘদেহ। জলের মোটা মোটা লম্বা জোঁকগুলো দেখলে আমাদের গা শির্ শির্ করতো। সুরেন ওগুলো ধরে এনে ট্যাকে করে ঘুরে বেড়াতো—আমাদের ভয় দেখাতো। সাপের ল্যাজ ধরে শুন্যে তুলে ও মজা দেখতো! কল্পনা করতো, কবিতা লিখতো ভারত উদ্ধারের। ভারত উদ্ধারের কথা আমাদের মনে দাগ কাটতো বেশি। দুর্জয়কে জয় করার আকাংখা জেগে উঠতো আমাদের মনে। আমরা তখন কিশোর। দেহের পুষ্টির সংগে এই বয়সে নেমে আসে শক্তিধারা—সে শক্তিকে অচঞ্চল ভাবে ধারণ করতে পারে—এতো শক্তি কার আছে? বাঁশ কেটে লাঠি বানাই—তলোয়ার, বন্দুক, ধনুর্বাণ। কখনো কি মনে হয়েছে এই অস্ত্রে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না? তারপরে এলো স্বদেশী আন্দোলন। আমাদের ভেতরে প্রেরণা জাগালো 'আনন্দমঠ', প্রেরণা জাগালো রামচন্দ্র দাসের কবিতা, মুকুন্দ দাসের সেই প্রাণমাতানো গান—

'দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম,
মাথায় পাগড়ী বেঁধে সাধক সেজে
দেশোদ্ধারে লেগে যেতাম।'

আজ সেই দেশোদ্ধারী সুরেন, কবি সুরেন, চিত্রশিল্পী সুরেন পোষাক বদলেছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোধা ডক্টর সেন এখন অবসর প্রাপ্ত। যখন কৈশোরে বয়সের অনুপযোগী ইতিহাসের মোটা মোটা বইগুলো রাত জেগে পড়তো তখন একটি লোক তাকে উস্কে দিতো—তিনি আমাদের বরিশালের অশ্বিনী দত্ত। মনে আছে একবার সুরেন অশ্বিনীবাবুকে কবিতায় চিঠি দিলো—

'ষাট বছরের বুড়ো তারে সবাই কেন বলে,
বুড়ো হয়ে যায়না শুধুই বয়স বেশী হলে।
সাদা হাসি আছে তাঁহার সাদা গোঁফের তলে,
বিশ বছরের যুবার মত বুক ফুলিয়ে চলে।
আমি যদি মেয়ে হ'তাম হ'তাম স্বয়ম্বরা,
ঐ বুড়োর গলে দিতাম তবে আমার মালা ছড়া।'

অশ্বিনীকুমারও জবাব দিয়েছিলেন তেমনি রসাল কবিতায়। সে কবিতা আজ আর মনে নেই। ডক্টর স্বরেন, ভাইস চ্যান্সেলার স্বরেন আজো তেমনি কিশোর, কিন্তু আপন জন্মভূমিতে সে অনাদৃত।

আমাদের এই খেলাঘরে জুটলো এসে মনোরঞ্জন গুপ্ত। ভিন গাঁয়ের তরুণ। আজ বয়স তাঁর ষাট পেরিয়েছে, কিন্তু আজো সে কিশোর—গাছের পাতাটি ছিঁড়ে নিতে ওর দুঃখ হতো, কিন্তু যখন ডাক এলো গেরিলা বিপ্লবের,তখন এই বাঁধন ছেঁড়া সাধকের হৃদযন্ত্রে বাজলো শুধু একটি তারের একতারা। দেশের মুক্তিযজ্ঞে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে আহুতি দিলো নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ। সরকারের খাতায় ওর মাথার মূল্য বেড়ে যায়, কিন্তু আইন-কানুনে ওকে ধরা যায় না—রাজসাক্ষী দেয় না ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য। তবু ওকে শিকল পরতে হলো। নিজের পায়ে শিকল না পরলে কি মায়ের পায়ের শৃংখল খোলা যায়? কিন্তু সে শৃংখল 'চরণ বন্দনা করে, করে নমস্কার।' আজ দেশ তো বিদেশীর গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু মুক্ত হয়নি ভয়, মুক্ত হয়নি মানুষের মন। দেবতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই দুর্যোগে কে দেখাবে আলো? তাই নিরন্ধ্র অন্ধকার পথে একক অভিযাত্রী ঐ ষাট বছরের কিশোর। প্রতিকার হাতে নেই, আছে দরদ, আজ অস্ত্র তো অবান্তর, তাই চোখে আছে জল—'সাত সাগরের জল'। এই গ্রাম মনোরঞ্জনের খেলাঘর। আজ আর খেলার মাঠে সাথীদের কোলাহল নেই—কুটিরে কুটিরে জ্বলেনা দীপ। নেই বালকদের পাঠাভ্যাসের উচ্চরব। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে আর শংখ বাজেনা, আর কেউ জোটেনা নৈশ রাতে খোল-করতাল নিয়ে কীর্তনে। তবু যেন শুনি সেই গান—

'মনরে তোর পায়ে ধরি রে,
একবার আমায় নিয়ে—একবার আমায় নিয়ে—
ব্রজে চলো—দিন গেলো, দিন গেলো !'

কীর্তনের কথায় মনে পড়ে প্রিয়নাথের কথা—তার ছেলে মন্মথের কথা। আজ দুজনের কেউ বেঁচে নেই।

কি চমৎকার ওরা গাইতো ! প্রিয়নাথের ডাকনাম ছিল মুলাই। দু দলে পাল্লা দিয়ে গান চলেছে। দোহার বালকদের সংযত করে মুলাই ট্যারা চোখ ঢেলা ঢেলা করে গান ধরে—

'হল দেহ-তরী ডুবু ডুবু প্রায়
পড়ে অকূলে আজ অসময়

*　　*　　*　　*

তরীর নব ছিদ্রে বহিছে বারি-ই-ই,
তাহে পাপের বোঝা নয়রে সোজা
উপায় কি করি।
এখন একূল ওকূল দুকূল যায়—'

শেষটা বলে যখন হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে গাইতো—শ্রোতারা হরিধ্বনি দিয়ে উঠতো তখন। মুলাইর ডাগর চোখ ভিজে উঠতো জলে। পাশের গ্রাম যশুরকাটির ভজরাম সেন বড়ো গায়ক। সে ছিল ওর শ্বশুর। প্রায়ই গান হতো তার সংগে পাল্লা দিয়ে। শ্বশুর বলে সে রেহাই পেতো না। মুলাই বলতো দোহারসহ—

'শোন রে ভজা শোন,
আর আর পক্ষে যেমন তেমন
তোমার পক্ষে যম।'

ভজরামও জবাব দিতো যোগ্য ছন্দে।

ওদের গান আজো কানে বাজে। ভুলতে পারি না গোপাল ভদ্রের সেই আকুতি—

'ব্রজের পথে হায়রে নিতাই,
যদি মোর দেহ পতন হয়—
তবে কৃষ্ণ-নাম লিখো আমার গায়—
ওই তুলসী মৃত্তিকাতে কৃষ্ণ-নাম লিখো—আমার গায়।'

মনসার ভাসান রয়ানী গান হতো একাদিক্রমে সাতদিন ধরে। বেহুলার দুঃখের অন্ত নেই—কলার মাজুসে স্বামীর অস্থি নিয়ে গাঙের জলে ভেসে চলে বেহুলা সুন্দরী। সেই নদী তীরে গোদা বঁড়শিতে মাছ ধরে।

'বুড়িয়া গোদা বড়শি বায় তর্লা বাঁশের ছিপ,
সুন্দরীরে দেইখ্যা গোদা ঘন মারে টিপ।'

পেছনে সমবেত কণ্ঠে দোহাররা ধুয়া গায়, 'বড় তা-আ-আপিত'।

ভিন দেশ থেকে আসতো কালা বৈরাগী রামায়ণ গাইতে। বাঁকা ঠোঁট বাঁকা চোখ—গলাটা ছিল মিঠে আর ধারালো। সেই গানের কথা আজো দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দেয়—

'রাম নামের গুণে জলে ভাসে শিলে—এ-এ।'

এদের কেউ আর বেঁচে নেই—ওদের গানের রেশ আজো বাজে ঐ অশথের পাতায় আর বাঁশ বনের মর্মর শব্দে।

গ্রাম্য কবি হারাধন ছিল খোঁড়া। লাঠি হাতে একখানা পা এক পাক ঘুরিয়ে স্থির হলে তবে চলতো অন্য পাখানা। কবি বাণীকণ্ঠও ছিল ট্যারা—রচনা ছিল গ্রামের ভাষায়। তারাও নেই, আর তাদের রসিক শ্রোতারাও পালিয়ে গেছে তেপান্তরের মাঠে। গ্রামের যুবকদের মধ্যে কতো শত হয়েছে গ্রাজুয়েট, কতো অধ্যাপক ; পি, আর, এস হয়েছে চারজনা, ক'জনা পি-এইচ-ডি ; বিলেত থেকেও ডিগ্রী এনেছে কতো সোনার ছেলে, কিন্তু পল্লীমায়ের অদৃষ্টে নেই তাদের মিলিত সেবা পাওয়া! কে ভি সেন এনেছিল হাফ্‌টোন ব্লকে যুগান্তর ; জ্যোতি গড়ে ছিল আর্ট স্কুল। তাঁদের শিষ্য উপশিষ্যেরা ছড়িয়ে আছে ভারতময়।

প্রত্যেক ব্লকের কারখানায় তারাই কর্ণধার। বিলেতে পাশ দিয়ে অশ্বিনী সেন গড়লেন হুগলী কটন মিল, দেশের শিল্পে সুর দিলেন গোপাল সেন, দর্শনশাস্ত্রে রস যোগালেন নিবারণ দাশ, দেশবন্ধুর ভগিনী বিয়ে করলেন অনন্ত সেনকে তাঁর কৃতিত্বের আকর্ষণে। তাঁদের অর্থে সম্ভব হলো দেশের শিক্ষাদীক্ষা। তারাপ্রসন্ন ব্যয় করলেন মুক্ত হাতে, কিন্তু আজ তাঁদের ঘরে আর দীপ জ্বলে না! রাস্তাঘাট আগাছায় আচ্ছন্ন!

তবু ভুলতে পারি না সেই পল্লীমাকে। বৈশাখে মেলা বসতো বটতলায়, আর অশথতলায়। দেশী কাঠের পুতুল গড়ে আনত শিল্পী অধরচাঁদ। আর আসতো মাটির পুতুল হাঁড়ি-কুড়ি। ফুটি-তরমুজও মেলায় আসত রাশি রাশি। সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে ঐ ফুটি, তরমুজ, ডাব, ফেণী বাতাসা, চিনির খেলনায় দেওয়া হতো নারায়ণের 'শীতল'। কি মজা ছিল প্রসাদ পেতে! ঘরে ঘরে জমা থাকতো মুড়ি, চিড়ে, কলা, নারিকেল, পাটালি। গাছে গাছে পাওয়া যেতো আম, জাম, কাঁঠাল, গাব, ডউয়ো, কামরাঙা, লিচু, জামরুল আরো কতো ফলমূল। এতো খেতাম কি করে তাই এখন ভাবি।

শ্রাবণে মানসা পুজো, ভাদ্রে বিশ্বকর্মা পুজোর বাচ, আশ্বিনে দশহরা। ভাদ্র সংক্রান্তি আর দশহরায় আসতো লম্বা লম্বা ছিপ-নৌকো। সারি সারি জোয়ান বসতো দুই ধারে। বাবরি দুলিয়ে মাঝি ধরতো হালের বৈঠা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ছিল না এতোটুকু। উৎসবে-পুজো-পার্বণে—ওরাই কর্মী, ওরাই লেঠেল—বাচ খেলে ওরাই। আমরা খালের কিনারে নৌকোয় বসে বাচ দেখতাম। খালের জলে ঢেউ উঠতো কূল ছাপিয়ে—দুলিয়ে দিতো আমাদের নাও।

কার্তিকে রাস-পূর্ণিমায় মেলা বসতো বাটাজোড়ে। বাটাজোড় মেলার পরেই অঘ্রাণ মাসের নবান্ন। সোনার ধানে ভরে যেতো গৃহস্থদের আঙিনা। নবান্নে সবাইকে নেমন্তন্ন জানাতে হবে। মানুষ, পশু-পাখিকেও ডাকতে হবে। মনে পড়ে বড়ো বড়ো গাছের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বলতাম—

'ও দাঁড়কাক, ও পাতিকাক
আমাদের বাড়ি শুভ-নবান্ন
তোমরা সবাই যাইও,

চাল, কলা, গুড়, সন্দেশ
পেটটি ভরে খাইও।'

মনে পড়ে দেশপূজ্য অশ্বিনী কুমারের একখানা পুরানো চিঠি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। চিঠিখানা লিখেছিলেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাঞ্জাব থেকে প্রায় বছর সত্তর পূর্বে। গুরুগোবিন্দ, রণজিৎ সিং, দলীপ সিং প্রভৃতির কীর্তিকলাপ, তাঁদের অস্ত্রাগার, সমাধিস্থল প্রভৃতি দেখে তাঁর মনে একাধারে যে আনন্দ ও বেদনার উদ্রেক হয়েছিল তাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি ঐ পত্রে। দীর্ঘ পত্রের একস্থানে তিনি লিখেছিলেন -

'......ভারতলক্ষ্মী অবশেষে এই বিশাল ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবে আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজ সেই স্থান হইতেও দূরীভূত হইলেন। ঐ অস্ত্রাগারের সম্মুখে বসিয়া শুধু মনে হয় যদি সমস্ত ভারতবাসী পরস্পরের গলা ধরিয়া দুঃখের কাহিনী গাহিয়া ক্রন্দনের রোল তুলিয়া কাঁদিতে পারিত তবে বুঝি কষ্টের কিঞ্চিৎ উপসম হইত। কিন্তু তাতেও বাধা, 'ফুটিয়া ফুকারি কাঁদিতে না পাই' এমনি আমাদের দুরদৃষ্ট।...একবার মনে হয় গুরুগোবিন্দের ঢালখানি নিয়া পলায়ন করি, মনে হয় ঐ পতাকাগুলি, অস্ত্রগুলি কলঙ্কের নিদর্শন স্বরূপ রাভি নদী জলে বিসর্জন দেই; মনে হয় দলীপের ক্রীড়াসামগ্রী কামানটি বুকে করিয়া উচ্চৈঃরোলে কাঁদিতে থাকি—কত কি ভাব হয় কি লিখিব ?'

দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দেশের অতীত গৌরবের অবমাননা দেখে কেমন মর্মাহত হয়েছিলেন এ চিঠি থেকেই তা বোঝা যাবে। তাঁর প্রিয় বাংলা, তাঁর প্রিয় বরিশালের আজকের রূপ যদি তাঁকে দেখতে হতো কী করে তিনি তা সহ্য করতেন? এতো দুঃখেও তো আমাদের ঠিক শিক্ষা হলো না। সমস্ত ভারতবাসী কবে পরস্পর মিলিত হবে ভারতবর্ষের কলংক মোচনে?

চাঁদসী

গ্রাম নয়। জননী। আমার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি। তাঁদের জীবন প্রভাতে শংখধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল এ গ্রামের বাতাস, জীবন-সূর্যাস্তে তাঁদের চিতাবহ্নি নিবিয়েছে এ গ্রামের জলরাশি। এ গ্রামেই প্রথম সূর্যালোকের সংগে আমার পরিচয়। আজ সে গ্রাম থেকে চলে এসেছি অনেক দূরে, তবুও সেই নবান্নের ঋতু, আম-কাঠালের ঋতু, পূজোর ঋতু, আকাশ-ডাকা ঋতু আজো আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমার চিন্তাধারার স্তরে স্তরে লেগে আছে সেই গ্রামটির প্রতি অসীম মমত্ববোধ। সে গ্রামের পরিচয় লিখতে গিয়ে আজ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসছে দুটি চোখ। সে গ্রামকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দুঃখ দৈন্য নিরাশাম্লান শরণার্থী জীবনে আমার জননী, আমার ছেড়ে আসা গ্রামের স্মৃতি এখনো আশার প্রদীপশিখার মতো অনাহত ও অমলিন।

কলকাতায়, শুধু কলকাতায় কেন, বাংলা দেশের সর্বত্রই চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসকরা খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই চাঁদসী পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলার একটি গ্রাম, সে গ্রামই আমার জন্মভূমি। দেশ-বদলের পালায় সে গ্রামকে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু শত দুঃখের দিনেও চাঁদসীর মানুষ বলে নিজে গর্ব অনুভব করি, দেশের কথা মনে হলে কেমন একটা প্রশান্তিতে ভরে যায় এই হতাশার মুহূর্তগুলো। গ্রাম তো শুধু আমার একার নয়, হাজার মানুষের গ্রাম চাঁদসী শুধু আজকের নয়, কতোকাল ধরে কতো মানুষের পদচিহ্নে এ গ্রাম ধন্য। সে ইতিহাস আজ হয়তো সকলের মনে নেই, কিন্তু সে গ্রাম আজো রয়েছে অতীতের নীরব সাক্ষ্যের বাণী বহন করে। গ্রামের কথা লিখতে বসে সে ইতিহাসের পূর্ণ পরিচয় দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু আমার নিজের সংগে গ্রামের যে মধুর পরিচয়টুকু জড়িয়ে আছে সে কাহিনীই আজ জানিয়ে যাই।

অনেকদিন ছেড়ে এসেছি গ্রামকে। কিন্তু সেখানকার প্রতিটি দিনের কাহিনী আজো আমার সারা মন জুড়ে রয়েছে। গরমের ছুটিতে কলেজ ছুটি হলেই গ্রামে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। জলের দেশ বরিশাল। স্টিমার কতোক্ষণে গিয়ে পৌঁছুবে গৌরনদী স্টেশনে, সেজন্যে কী ব্যাকুলতা! ঘাটে পৌঁছুলেই সোনামদ্দি মাঝি চিরপরিচিত হাসি হেসে প্রশ্ন করতো—'কর্তা, আইলেন নাকি, চলেন নৌকা আনছি। আপনারা যে আইজ আইবেন হেইতো আমি জানতামই। আমিও আপনাগো মত দিন গুনি কবে আপনেরা আইবেন। তা কর্তা, গায়-গতরে ভাল আছেন তো?'

এইরকম কতোশত প্রশ্ন করতো সোনামদ্দি। সে বুঝতো বাড়ি পৌঁছুবার জন্যে আমাদের আগ্রহ। তাই খুব তাড়াতাড়িই নৌকো চালাতো সে, বলতো, 'ওই যে কর্তা লোহার পোল দেহা যায়।' এই পুলটি ছিল আমাদের বিশ্রামের জায়গা। সেখানে বর্ষার দিনে দেশ-দেশান্তরের নৌকো এসে ভিড়তো পণ্য বহন করে। আর একটু এগুলেই কাপালীবাড়ি, আমাদের গ্রামে ঢুকবার দক্ষিণ প্রান্তের প্রবেশমুখ। আরেকটু এগিয়ে যান, দেখতে পাবেন একটি কাঠের পুল, তার পাশেই ঝাঁকড়া মাথা একটা আমগাছ। খবরদার, রাত্রিবেলা অন্ধকারে সেদিকে যাবেন না। গেলেই হয়তো গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়া কোন নারীমূর্তি দেখে আপনি চমকে উঠবেন। স্বামীর অত্যাচারে এক বাজন-দারের বউ ঐ গাছটার সংগে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল। খুব ভয় করতো বৈকি সে গাছের তলা দিয়ে যেতে। এমনি ভয় করতো কালীবাড়ি ও জয়দুর্গা খোলা দিয়ে যাবার সময়। যাই হোক, ঝাঁকড়া আমগাছটা পেরিয়ে বাজনদার বাড়ি ছাড়িয়ে গেলেই চোখে পড়বে বিখ্যাত দীঘির ঘাট। এই দীঘির ঘাটটা ছিল আমাদের লেক্। গ্রীষ্মের কতো সন্ধ্যের মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই দীঘির পাড়ে; কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জল। তার কিছুটা দূরেই গ্রামের ডাকঘর। সেখানে প্রতিদিন সকালবেলা গ্রামের লোক সব জড়ো হতো। চলতো আলাপ আলোচনা, চলতো খবরের কাগজ পড়া। ওরই দক্ষিণে গুহদের বাড়ি। কতো জাঁকজমক ছিল ওবাড়ির, গমগম করতো দিনরাত। পুজোর সময় গ্রামের

সকলেই এসে জমতো এ বাড়িতে। তার দক্ষিণে মজুমদার বাড়ি ; আরো এগিয়ে যান—কালীবাড়ি, দশমহাবিদ্যা বাড়ি, কেদারবাবুর বাড়ি হয়ে চলে আসুন তালুকদার বাড়ি, গ্রামের একেবারে শেষ সীমান্তে। পায়ের জুতো খুলে দেখুন একটুও কাদা লাগবে না, বর্ষাকালেও না। এতো সুন্দর ও চমৎকার এ গ্রামের পথঘাট।

গ্রামটি ছোট হলেও এখানে চার-চারটি থিয়েটার পার্টি ছিল। বিষহরি নাট্য সমিতি, দশমহাবিদ্যা নাট্য সমিতি, সিদ্ধেশ্বরী নাট্য সমিতি ও চাঁদসী আর্ট প্রোডিউসার্স—সংক্ষেপে সি, এ, পি। এই শেষোক্ত পার্টিই ছিল গ্রামের মধ্যে সেরা। এদের দলেই গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অংশ গ্রহণ করতো। পূজোর সময় থিয়েটার নিয়ে কী মাতামাতিই না হতো! কতো দলাদলি, ঘোঁট পাকানো, জব্দ করার ফন্দী, এসব মত্ততার মধ্য দিয়েই পূজোর কটা দিন কেটে যেতো। পূজোয় দেশে যাবার আনন্দই ছিল ওর মধ্যে। এই থিয়েটারে অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে দুই সহোদরের কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে, হবিবর রহমান ও লুৎফর রহমান ওরফে বাদশা মিঞা। বাদশা মিঞা আজ পরলোকগত। এমন সুন্দর চেহারা, শিক্ষিত ও অমায়িক লোক খুব কমই দেখেছি। এঁরা দুজনে সমস্ত অভিনয়েই অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাও প্রায়ই হিন্দুদেবতার ভূমিকায়। আজ একথা শুনলে ইসলাম ভক্তরা চোখ কপালে তুলবেন জানি, কিন্তু সেদিন এ ছিল সত্য, স্বপ্ন নয়। মধু শেখ গ্রামের সকলেরই কাছে ছিল অতি পরিচিত, আপন বন্ধুজন। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। সে সমস্ত পশু-পাখির ডাক নকল করতে পারতো আর তা শোনাবার জন্যে গ্রামের সমস্ত মেয়ে মহলেও তার ডাক পড়তো। সেও আজ পরলোকগত। কতো লোকের কথাই তো আজ মনে এসে ভিড় করছে—কার কথা লিখবো, রজনী গুহ মশায়ের বাড়ির কথা কি ভোলা যায়, না ভোলা যায় তাঁর বাড়ির সকলের অমায়িক ব্যবহারের কথা? এই বাড়িতেই চলতো থিয়েটারের মহড়া দিনরাত। চলতো গান-বাজনা। কারণ গান-বাজনার সমজদার ছিলেন এ বাড়ির সকলেই, আর সকলেই ছিলেন সুকণ্ঠ। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আরো অনেকের গান আমাদের

মুগ্ধ করতো। দিনের কর্মাবসানে এরা একত্রে মিলিত হতো। রাত্রিতে অনেকের বাড়িতে 'ত্রিনাথে'র মেলা বসতো। খোল, করতাল, মৃদংগ সহযোগে চলতো ঠাকুর ত্রিনাথের ভজন। কী সুন্দর তার মূর্ছনা! কোন এক আত্মভোলাকে দেখেছি জ্যোৎস্না রাতে নির্জন স্থানে বসে একটি একতারা সহযোগে অপূর্ব সুরজাল সৃষ্টি করে বাউল সংগীত গেয়ে চলেছে। সে সংগীত শুনে ঘর ছেড়ে তার পাশটিতে এসে চুপ করে বসে থাকতে হতো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো শ্রোতার ও গায়কের উভয়েরই। সংগীত শেষ হলে মনে হতো কোন স্বর্গলোক ভ্রমণ করে এলাম এতোক্ষণ। সেই আত্মভোলা আর তার সংগীত কি আজো বেঁচে আছে!

সেবারের শীতকালের একটি মজার ব্যাপার বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। ডিসেম্বরের কনকনে শীত; সকলে মিলে বকুলতলার খালে মাছ ধরা হচ্ছে, এই মাছ ধরা ছিল আমাদের বড়দিনের উৎসবের একটি অংগ। হঠাৎ খবর এলো গ্রামে বাঘ এসেছে। দল বেঁধে চল্লাম সেই অকুস্থলে। চাক্ষুস দেখার পর স্থির করলাম, তিনি একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের নেকড়ে ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু সেই ক্ষুদে নেকড়েই আমাদের গ্রামে যে নাটক অভিনয় করে গেলেন তার মধ্যে করুণ ও হাস্যরস দুইই ছিল, আঠারোটি লোক ঘায়েল হয়েছিল তার সংগে লড়ায়ে। মরতে মরতে বেঁচে গেছে তারা। এটাই ছিল করুণ রস। হাস্যরসের কথা উল্লেখ করতে সত্যি আজো হাসি পায়। চার পাঁচ জন বীরপুংগব যারা তাদের পাকা শিকারি বলে গ্রামে জাহির করতো, তারা তাদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারাও শেরের বাচ্চার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি, যতোবারই তারা দুতিনজন একসংগে গুলী চালিয়েছে বাঘের গায়ে, ততোবারই দেখা গেছে ব্যাঘ্রমশায় তার লাঙুলটি নাড়তে নাড়তে বহাল তবিয়তে অন্য ঝোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সারাদিন ধরে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করা হলো কিন্তু সবই ব্যর্থ, সবই বৃথা। শেষের দিকে কয় জন শিকারি বাঘের হাতে সাংঘাতিক রকম জখম হয়ে বাঘ মারার বাহাদুরী নেবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করলো! আর সন্ধ্যের অন্ধকারে ব্যাঘ্র মামাও

তারও গ্রামের লীলা সাংগ করে বহাল তবিয়তে অন্য গ্রামে গিয়ে লীলা খেলা আরম্ভ করলেন!

এমনি কতো ঘটনা আজ মনে পড়ছে। 'নীল খেলার মাঠে' ফুটবল খেলা, সন্ধ্যের অন্ধকারে 'ধরের ভিটা'য় দল বেঁধে ডাব চুরি করতে যাওয়া, আরো কতো কি! বেচারাম ধুপী চৌকিদারী করতো, শাসাতো। কিন্তু ডাব নিয়ে যেতে বাধা দিতো না বড়ো একটা। শৈশবের এসব কাহিনী ভুলতে পারি না। মনে পড়ছে গ্রীষ্মের দুপুরে বটগাছের ডালে বসে টৌটাল পাখি একটানা সুরে টুপ্ টুপ্ করে গেয়ে যাচ্ছে। ঘুঘু-ডাকা অলস দুপুর। গ্রামের ছায়া-সুনিবিড় এক একটা বাড়ি। তেমনি নীরব নিরালা বাড়িতে বসে সে ডাক শুনতে কী ভালোই না লাগতো! আজ সে সব হারিয়ে শহরে এসে মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজছি, তাও মেলে না। এই অনাদৃতদের আবার ঘরে ডেকে নেবে কে? অসহ্য বেদনায় আজ কেবল কবি বিহরীলালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—

'সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাফালা
উঃ কী জলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতংগ পতন।'

এ অগ্নিকুণ্ড থেকে আমাদের কি উদ্ধার নেই? পতংগের মতোই কি আমরা শুধু আত্মাহুতি দিয়ে যাবো? কিন্তু কোন মহত্তর কল্যানের জন্যে এই মৃত্যুযজ্ঞ? সমগ্র দেশের ভিত যে কেঁপে উঠছে এ বীভৎসতায়!

সৈওর

সুগন্ধা নদী। সুদর্শন চক্রে গৌরীর খণ্ড অংগ-প্রত্যংগের নাকটি এই নদীগর্ভে পড়েছিল। ভোর হয়ে আসে। দাঁড়কাকের টানাটানা থামা থামা ব্যথা-গম্ভীর ডাক, কোকিলের অশান্ত কাকলি। আকাশ ছোঁয়া টেলিগ্রাফের তার। বাঁ দিকে 'সুতালরি'র মাথা ভাঙা মঠ। সুতালরির পোষাকী নাম 'সূত্রলহরী'। মাথা ভাঙা কেন? কোন সন্তান মায়ের চিতায় এই মঠ তোলা শেষ হলে বলেছিল, শোধ করলাম মাতৃঋণ, অমনি ভেঙে পড়লো মঠের মাথা। সত্যিই তো, মাতৃঋণ কি কেউ কখনো শোধ করতে পারে?

আমাদের গ্রামটি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখান থেকে কখনো কেউ বিলেত যায়নি, সে গ্রামে কোন কোঠাবাড়ি নেই, এম-বি ডাক্তার নেই, কোন বাড়িতে চাকর পর্যন্ত নেই, কোন ক্লাব নেই, লাইব্রেরী নেই, পলিটিক্যাল পার্টি নেই। এমন একটি গ্রামের কথা বলতে বসেছি, যে গ্রামের লোকদের মন আজো শহর থেকে অনেক—অনেক দূরে।

সামনেই নলচিটি। ছবির মতো ছোট্ট পণ্টুনখানা। নদী এখানে আরো চওড়া। পাড়ে পাড়ে ষ্টিমারের সংগে পাল্লা দিয়ে, আলো-নেভা লণ্ঠন, সড়কি-বল্লম আর চিঠির ঝোলা কাঁধে 'রাণার ছুটেছে, রাণার'। ষ্টেশনের ওপারে ষাটপাইকা গ্রাম। ওখানে নাকি একদা ষাট জন বিখ্যাত পাইকের বাস ছিল।

এখানে নেবেই ধরতে হয় আমাদের গ্রামের পথ। কিছুটা পথ হেঁটে অথবা বর্ষাকালে নৌকোয় যেতে হয়। অন্য সময় খালগুলো কচুরিপানায় ঠাসা থাকে। যারা গ্রামে যায়নি, ফুটে থাকা কচুরি ফুলের খবর তারা জানে না। পার্ক ষ্ট্রীট রিফিউজী ক্যাম্পে থাকার সময়, সাহেবদের বাড়ি সাজানোর জন্যে মাঝে মাঝে কয়েকটি করে কচুরি ফুল বিক্রি হতে দেখতাম।

নৌকো গ্রামের খালে এলেই, দুদিকের সারি সারি ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে, দূরের আম-সুপুরি-তাল-নারিকেল গাছগুলোর ডগায় ডগায়, উড়ে যাওয়া কাকের বকের পাখায় পাখায়, দূরদূরান্তব্যাপী নীল আকাশে, এক কথায় পথের সর্বত্র যেন পেতাম কেমন একটা স্নেহস্পর্শ। সেখানে লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, একেবারে খাঁটি উন্মুক্ততা। লগির খোঁচা খাওয়া নৌকোর তলাকার জলের মতোই মন তখন আনন্দে ছলছলিয়ে উঠতে থাকে।

হাঁটাপথে নলচিটির পর নরসিংহপুর, বৈচণ্ডি, আখোরপাড়া, হয়বাৎপুর বা হবিৎপুর, তারপর আমাদের গ্রাম সৈওর। সৈওর গ্রামটি এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ষ্টিমারের সংগে যেমন গাদাবোট থাকে, হবিৎপুরের সংগে সৈওর গ্রামটিও ঠিক তেমনি। আমাদের গ্রাম বলতে আমরা বুঝি হবিৎপুরকে, বলেও থাকি তাই। হাট, বাজার, পোষ্ট-অফিস, হাইস্কুল, খেলার মাঠ সবই হবিৎপুর ও আখোরপাড়ার। এখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় অনেক। আমাদের ঢোলবাদক আর কুমোররা বরিশালের মধ্যে বিখ্যাত। জামাইবাবু, পিসেমশাই ও মামারা আমাদের গ্রামকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলতেন। অফুরন্ত মাছধরা আর গোয়ালের গরুগুলো না থাকলে তাঁরা নাকি আমাদের ওদিকে যেতেনই না। অবশ্য কলকাতার খবরের কাগজ শহরের আগেই আমরা পেতাম। নলচিটি বরিশালের আগের ষ্টেশন, মাত্র ছ ক্রোশ পথ।

এককালে কোন শক্ত জমিদার এই কয়েকখানি গ্রাম বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাই কয়েকটি খুব বড়ো বড়ো দীঘি দেখতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের দীঘি সবচেয়ে বড়ো। তার চারদিকে এখন গা-ছমছম-করা অরণ্য আর শীতল স্তব্ধতা। দূর কুটিরের ঢেঁকিপারের ঠুক্ ঠুক্ শব্দ-লাগা প্রচণ্ড দুপুর ঝিমুতে ঝিমুতে কেঁপে কেঁপে ওঠে। খেজুর ফুলের গন্ধভরা নিরিবিলি পায়েচলা পথ রোদে ঝাঁঝরা শেওলাখোলার পাশ দিয়ে চণ্ডীদীঘির ছায়া মেখে কোথায় যেন চলে গেছে! এ দীঘির পারে বসে শ্রান্ত পথিক তার হুঁকো-কল্কেটি বের করে নিয়ে বুটুর বুটুর তামাকটানা সুর শোনায়। তারপর রাজাবাড়ির দীঘি। এখানে বড়ো বড়ো মেঘডম্বুর সাপ অনেক মারা হয়েছে। দীঘিটি জমাট ঝোপে ঢাকা। তার ওপর

গরু চড়ে বেড়ায়। কিন্তু পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে এক পক্ষকালের জন্যে সব ঝোপ তল পড়ে। এর বৈজ্ঞানিক কারণ কি তা জানা যায় নি। তবে ঘটনাটি অনেকবার দেখা। তৃতীয়টি সম্প্রতি আঁধি। চারধারে হোগলা, ভিতরে ফণাধরা সাপ আর জলপদ্ম। পাড় খুব উঁচু, সেখানে ছেলেদের খেলবার মাঠ। সুপুরির সময় এখানে চটি পড়ে। শ খানেক গোল গোল চক্‌চকে বঁটি, আঙুলে নেকড়া জড়িয়ে লুকা জ্বালিয়ে চটির লোকরা কাজ করে আর গান গায়। এক একটি বড়ো বড়ো চালান শেষ হবার অবসরে গান হতো 'গুণাবিবির পালা'। রাত-মাতানো হৈ-হৈ আর কী বেদনা সে কণ্ঠে—

'ও নাথ, গুপ্ত হন গুপ্ত হন
পুলিশ এসেছে,
আপনার চাচা ধলু মেঞা এজাহার দিছে।'

আবার গেয়েছে—

'—ও গুণা, গুণা গো,
আর কেন্দোনা, কেন্দোনা, দেশে চলে যাও,
নয়লাখ টাকার জমিদারী বেচে বেচে খাও।'

গ্রামের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে কিছুকাল পর্যন্ত এ সব গানই চলতে থাকে শোনা যায়, এককালে এ গ্রামেব ভোজ উৎসবের সব বাসনপত্র এই দীঘির জলে ভেজানো পাওয়া যেতো, ভোজশেষে তা আবার দীঘিকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার প্রথা ছিল। কিন্তু কোন শাশুড়ির শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নর পর কোন বউ নাকি দুএকটি বাসন লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর থেকে আর কেউ কিছু পায় না। এই জলে নাকি একরকম মাছ দেখা যায়, তাদের মাথায় ধূপদানী, কপালে টক্‌টকে লাল সিঁদুর।

কেউ কেউ বলে, এসব গ্রামে আগে নাকি গভীর অরণ্য ছিল, আর একদল ডাকাতই ছিল এখানকার আদিম বাসিন্দা। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কারণ সমস্ত গ্রামটিতে দুর্গাপূজো অপেক্ষা কালী পূজোরই বেশি ধূম। প্রায় বাড়িতেই, আমাদের বাড়িতেও, প্রাচীন আমলের বড়ো বড়ো ঢাল সড়কী এখনো

অনেকগুলোই আছে। ঠাকুরদাদা হাঁটু ভেঙে এক হাতে বড়ো বড়ো মোষ বলি দিতেন। সুগভীর রাত্রিতে ঘড়ি-ঘণ্টায় ঘুম ভেঙে পূজোমণ্ডপ থেকে ঠাকুরদাদার কালী পূজোর মন্ত্র উচ্চারণ শুনতাম। ওঁ হ্রীং প্রভৃতি এক একটি শব্দের ঝংকারে ঘরের কড়িকাঠগুলো যেন ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে উঠতো। গ্রামের নর বা ঢোলবাদকরা একত্রে এক এক বাড়ি করে বাজনা বাজায় ও আরতি হয়। যারা শোলার ফুল তৈরী করে, তাদের বলে বনমালী। বনমালী সব বাড়ি বাড়ি আরতির সময়ে ভাণ্ডের ব্যবস্থা নিয়ে আসে। সমস্ত গ্রামের লোক একত্রে এক এক বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন দেয়। পূজোয় কে কতো বড়ো শিংওয়ালা ছাগ বলি দিলো এ ব্যাপারটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই সারা গ্রামের অদ্ভুত একতা। কোন বাড়ির নেমন্তন্নর ব্যাপারে প্রত্যেক বাড়ির পুকুর থেকেই নির্বিবাদে চলতো মাছ ধরার উৎসব। কোন বাড়ি জামাই এলো তো এ যেন সারা গ্রামখানারই জামাই এলো, তখন গ্রামশুদ্ধ প্রত্যেক বাড়িতেই একটা সুন্দর সলজ্জ পরিচ্ছন্নতা দেখা যেতো।

গ্রামের কালীবাড়িটি গভীর অরণ্যের মধ্যে। প্রতিবছর পূজোর পাঁচ সাত দিন আগে থেকে জংগলে আগুন লাগানো হতো। নির্দিষ্ট দিনে পূর্ববছরের প্রতিমা ভাসান দেয়ার বিধি। পূজো হয় পূর্ণিমার দিন। গাঁয়ের 'তিন মাথা' লোকরা এই পূজোর দিন ঠিক করেন। শতাধিক বছর আগের কালী মন্দির! বট-অশ্বত্থের শেকড় জড়ানো তার আপাদ-মস্তক। কালের হাওয়ায় সর্বাংগের ইঁটচুণ গেছে খসে, তাই ইদানিং সেটি একটি সুদৃশ্য শেকড়ের মন্দির-গুহার রূপ ধারণ করেছে। তার মধ্যেই আবার বেল গাছ, জবাফুল গাছ, কচি দূর্বোর ছড়াছড়ি।

গ্রাম্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র সবাই গোঁড়া Puritan, কিন্তু এই পূজোর দিনের প্রথা অনুসারে, বাল-বৃদ্ধ পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-শূদ্র সবাই একত্রে গা ছুঁইয়ে প্রসাদ খেতে বসে। মাংস দিয়ে খিচুড়ি আর পায়েস। সেদিন গ্রামের কোন বাড়িতেই রান্না হয় না। সবাই উবু হয়ে খেতে বসে। প্রথমবারের পরিবেশন হলেই ঘোষাল একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে বলে—'ও ভাই সাধু!' সবাই তখন সমস্ত শরীরকে

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে 'হেঁইও', ঘোষাল বলে—'ডাইল খাইলা', সবাই—'হেঁইও', ঘোষাল—'তরকারী খাইলা' সবাই—'হেঁইও', এই ভাবে।

'আরও খাইলা ভা—জী'

হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও !

মহামায়ার,

হেঁইও !

পেরসাদ খাইয়া,

হেঁইও !

মন করিলা রাজী—

হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও !'

এই হৈ-হুল্লোড় হাসা-হাসিতে পেটেরটা হজম হয়ে যায়। তখন আবার পরিবেশন চলতে থাকে। এর কারণ, এই প্রসাদ কেউ পাতে ফেলতে পারবে না আবার সম্পূর্ণ পেট না ভরে খেলেও চলবে না। তাতে নাকি বংশে কলেরা হবার সম্ভাবনা আছে, অন্তত এর পরবর্তী ছড়াটি তো তাই বলে।

গ্রামের দক্ষিণে গভীর জংগল। সেখানে ছোট বড়ো এলোমেলো ছায়াঘন গাছের অন্ত নেই। জায়গাটিকে বলে 'পরাণ শীলের বাড়ি'। এখানে প্রাচীন হরিতকী গাছের তলায় মস্ত উই ঢিপি আর আশেপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় মস্ত মস্ত সাপ। কোন কালের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি নাকি আছে ঐ উই ঢিপির মধ্যে। বর্ষাকালে এখানে বড়ো বড়ো বাঘের থাবার চিহ্ন পড়ে।

শীত আসে। শেষ রাত্রে পাতায় পাতায়, টিনের চালের এখানে-ওখানে, থেমে থেমে, মোটা মোটা টুপ্‌ টাপ্‌ টং টং শিশির ঝরার শব্দ শোনায়। ঘাসের শিশিরে দু পা ভিজে যায়। নীরব সন্ধ্যায় লেজ ঝোলা 'শিয়ালী' কোথায় যেন ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ করে খেজুর গাছ কাটে। খালের স্বচ্ছ জলে গাছের সারি চুপচাপ মুখ দেখে, আর কেউ কোন নৌকো বেয়ে গেলে তাদের ছায়াগুলো যেন খিল খিল করে হেসে ওঠে। ক্রমে রাত্রি হয়, মাঠে মাঠে 'আওলা দানো' বা আলেয়া ভুত নাবে।

শীতের মাঝামাঝি গ্রামে বাঘ পূজো হয়। জংগলের পথে পথে সন্ধ্যের পর

মশাল জেলে ছেলে-মেয়েরা বেরোয়, আর বুধাই শীলের পাঠশালার নামতা পড়ার মতো সুর করে একজন আগে বলে ও পরে আর সবাই—

'আইলাম রে শরণে,
লক্ষ্মীদেবীর বরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর,
চাউল কড়ি বিস্তর।
চাউল না দিয়া দিবেন কড়ি,
ঠিকদুয়ারে সোনার লরী ;
সোনার লরী রুপার মালা,
পাঁচ কাঠালে সোনার ছালা।
একটি টাকা পাই রে—
বানিয়া বাড়ি যাই রে !'

এর পর তারা বার বাঘের ছড়া বলে—

'এক বাঘ রে   একবাঘ রাইঙ্গা,
ঘর ফালাইলরে   ঘর ফলাইল ভাইঙ্গা ;
আর বাঘ রে   আর বাঘ চৈতা,
বাওন মারইয়ারে   বাওনের নিল পৈতা ;
আর বাঘ রে   আর বাঘ নৈচৈ
গোয়াল মারইয়ারে গোয়াল মাইরা খাইল দৈ।' 'ইত্যাদি।

পূজোর দিন উঠোনে, বড়ো বড়ো বাঘা-বাঘিনী এঁকে মেয়েরা হলুদ গুঁড়ো চাল গুঁড়ো সরষে কালোজিরে এসব দিয়ে বাঘের গা করতো চিত্রবিচিত্র। সেদিন ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হতো না। সবাই পূজোর চিঁড়ে মুড়ি পেট ভরে খেয়ে রাত কাটাতো।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর দিন এ বাড়ির ও বাড়ির মা কাকিমা বৌদি বোনদের সারাদিন উপুড় হয়ে ঘর জোড়া রুচি-শুভ্র আলপনা দেয়া দেখতাম। দেশের মা দুর্গার কী টানা টানা চোখ! আমরা কুমোরদের বলি 'গুণরাজ'। আমাদের

জানকী গুণরাজ কালা। জোরে না বল্লে সে শোনে না, কিন্তু কথা নিজে বলে খুবই আস্তে। সে এমনি কাটা মোষের মাথা তৈরী করে উঠোনে রাখতো যা দেখে শকুনি উড়ে পড়তো। নিজের হাতের কনুয়ের কাছটা ঠোঁটে লাগিয়ে জানকী ইসারায় তামাক চাইতো। পুলাঘাটায় গুণরাজের মাটির নৌকো আসে। সেখানে ছেলেদের কী জমাট জমায়েৎ! পুলের কাছেই বোসেদের দীঘি আর হাটখোলা। দূরে দূরে কলাপাতার ঘোমটা ঢাকা লাজুক সব কুটির। ওপাড়ে ময়াল সাপের মতো শেকড় জড়ানো ভ্রূকুটি-কুটিল বাদাম গাছের ডালে ডালে শকুনিরা চোখ বুঁজে ঝিমোয়। বাড়ি আসার সময় এখানে নেবে কোন গ্রাম্য বৃদ্ধকে দেখে প্রণাম করতে হতো। এখানে নেবেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে,—মা ভিজে চুল পিঠে মেলে উনুনে ফুঁ দিচ্ছেন। কাকিমা আর বৌদি ঢেঁকি পাড় দিতে দিতে হাসছেন। পিসিমা উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে সবে কোমড় সোজা করে দাঁড়ালেন, সোনা ভাই দাঁতহীন ঠোঁট নেড়ে পুকুরের জলে জবাফুলের পর জবাফুল ভাসিয়ে চলেছেন কামিনী আর স্থলপদ্ম গাছের ফাঁকে ফাঁকে। আমাদের কোথাও যাত্রাকালে এই পুলঘাটা অবধি ঠাকুরদাদা মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আসতেন—'ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা, বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত বহ্নি……।'

চা খাওয়ার রেওয়াজ আমাদের গ্রামে নেই। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ির বাইরের বারান্দায়, এক তাওয়া আগুন, একতাল তামাক, কয়েকটি করে কল্কে আর হুঁকো এ থাকবেই। তাওয়াটিতে চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন থাকে। মেয়েরা গন্ধক কাঠি তৈরী করে রাখে এবং দেশলাইয়ের পরিবর্তে ঐ গন্ধক কাঠির সাহায্যে তাওয়ার আগুনে আলোজ্বালানোর কাজ চলে।

অতিথিপরায়ণতা গ্রামবাসীদের মজ্জাগত। কচিৎ কোন লোকের সংগে দেখা হলে তার চৌদ্দ-গোষ্ঠীর সংবাদ জিজ্ঞেস করা এদের স্বভাব। নেহাৎ অতিথি হিসেবে সে যদি নাও থাকতে চায় অন্তত এক ছিলিম তামাক তাকে খেতেই হবে। ভাড়ার নৌকোকে আমাদের ওদিকে বলে কেরায়া নাও। এই কেরায়া নাও-এর যাত্রীদেরও এ ব্যাপারে রেহাই নেই। এসব মনগুলো শহর কলকাতায় এসে যে কী অবস্থায় পড়ে কী রূপ পরিগ্রহ করবে, তা ভাবতে গিয়ে

থেকে থেকে একটা কান্নার দমকা আমার বুকগলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে, চোখ ভিজে আসে।

সেসব থেকে থেকে পাখি-ডাকা গভীর রাত্রের নীরব শিহরণ আর আমাদের কানে আসবেনা। 'অক্কু'র ডাকে ডাকে রাত্রির যাম আর শুনতে হবেনা। চিলের মতো এক প্রকার পাখি অক্কু। পুকুর পাড়ের উঁচু তালগাছে থাকে। ঝড়-ঝঞ্ঝা বাদল-বৃষ্টি যাই হোক না কেন সন্ধ্যের পর থেকে প্রতি চার প্রহর পর পর এরা ডাক শোনাবেই। এদের কণ্ঠ সবার ওপরে। দিনের বেলা ছায়া মেপে সময় নির্ণয় করার প্রথা আমাদের ওদিকে বিশেষ প্রচলিত। ছায়া মেপেই ঘড়ি ঠিক রাখতে হয়।

'পদেতে মাপিলে ছায়া যত পদ হবে,
দ্বিগুণ করিয়া তাহে চৌদ্দ মিশাইবে।'

এর পরের লাইন দুটি মনে নেই, তাতে বিশেষ ক্ষতিও নেই। ছায়া যতো পা, তাকে দুই দিয়ে গুণ করে চোদ্দ যোগ করে তাই দিয়ে ২৯২কে ভাগ দিলে দণ্ড হয়, আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা।

সাম্প্রদায়িক গোলযোগ আমাদের গ্রামে কোনকালেই ছিল না, আজো নেই। প্রথম দাংগা আরম্ভের পর, কলকাতার খবর পেয়ে আমাদের গ্রামে গ্রাম্য ভাষায় সত্যপীরের পাঁচালীর সুরে ছড়া লেখা হয়েছিল। পাঁচালীটি বেশ বড়ো, সুতরাং মাঝখান থেকেই একটু বলি—

'তোমার ঘরে পানি নেওনা আমি যদি ছুঁই,
গো-জবাইতে বাধা দিলে কাফের কইতাম মুই।
অশিক্ষা কুশিক্ষা আল্হে তোমাতে আমাতে,
তমো মোরা দুইজনেই আল্হাম হাতে হাতে।
রাজায় রাজত্ব হরে পেরজার চৌহে ঝরে পানি,
অধর্মেরই ছুরি খাইয়া অইলাম রে অন্নরানি।'

তবু সে আজ আমাদের ছেড়ে আসা গ্রাম। সে গ্রাম ছেড়ে আসতে পা কি চলতে চায়, বার বার পেছন ফিরে ঝাপ্সা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, কেবল

দেখেছি। দুএকজন মুসলমান প্রজা সংগে সংগে ষ্টেশন অবধি এসেছিল। খালাসিরা সিঁড়ি ফেল্লো। ওপারে ধানের ক্ষেত। নৌকোগুলো ঢেউয়ের আঘাতে আছাড় খাচ্ছে, মাঝিদের কোলাহল, সন্ধ্যের আকাশে একঝাঁক পাখি কোথায় উড়ে গেল, দিগন্তে পাণ্ডুর সূর্যাস্ত। কেঁপে কেঁপে ষ্টিমারের বিদায়ের বাঁশি বেজে ওঠে। ঘাট নোঙর ছেড়ে দেয়। দু ফোঁটা চোখের জল, বুকভরা অশান্ত কান্না। তারপর শহর। এখানে আমরা যেন কোন ভিন্ন জাতি, সভ্যতার একটুকু বিলাসব্যসনের চিহ্ন যাদের দেহে নেই, তাদের সারা মুখে দেখা দেয় একটা অপমৃত্যুর বিভীষিকার ছায়া। আর সেখানে দুশ বছরের পুরানো বটকে যেন কেউ সমূলে উপড়ে ফেলেছে, সেখানে খাঁ খাঁ করে একটা বিরাট শূন্যতার গহ্বর। সেখানকার সন্ধ্যের নিশাচর বাদুড়েরা গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে আর কোন কচি কচি গলার স্বরে শোনে না—

'বাদুড় ভাই, বাদুড় ভাই, তুমি আমার মিতা,
আমারে ফেলাইয়া যে ফল খাবা,
সে ফল তোমার তিতা তিতা তিতা!'

সত্যি, আমার গায়ের প্রিয় পশু-পাখিরা কি ভাবে আমাদের কথা, তারা কি আজো মনে রেখেছে আমাদের? আমরা যে কিছুতেই ভুলতে পারিনা তাদের, ভুলতে পারি না আমার গাঁয়ের সে মাটি, সে জল, সে গাছপালা ও সে মিষ্টি বাতাসকে! আবার কবে ফিরে যেতে পারবো তাদের মধ্যে?

নলচিড়া

'মোট ক্ষতির পরিমাণ কতো?' প্রশ্ন করেছেন সরকার। উদ্বাস্তু শরণার্থী-দের ছেড়ে আসা ভিটে মাটিতে মোট ক্ষতির পরিমাণ কতো তা জানাতে হবে সরকারকে। গণিতের হিসেবে চিরকাল আমি কাঁচা। সাহায্য নিয়েছিলুম কোন বন্ধুর। সত্যি, কতো নম্বর মৌজায়, কতো নম্বর খেবটে আমার কি ধরণের স্বত্ব, সে খবর কোনদিন রাখিনি। আমার সম্পত্তির অবস্থান এবং আমার স্বত্ব বোঝাতে গেলে যতোখানি জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োজন, আমার তা কোনদিনই ছিল না। কিন্তু গোটা নলচিড়াকে এতো ভাল করে চিনি যে তার সম্পর্কে কিছুমাত্র ভুল হয় না।

আঁড়িয়ালখাঁর দক্ষিণ তীরে সাহেবের চর থেকে আমাদের এই গ্রামের পত্তন। সদর থেকে মাইল কুড়ি উত্তরে। পড়শী গ্রামের সংগে আমাদের সীমানা ছোট-খাটো নিশানা দিয়ে। আমাদের গ্রাম থেকে মাহিলাড়া পেরিয়ে অশ্বিনী দত্তের বাটাজোড় মাইল পাঁচেক হবে। অনেক উপলক্ষেই যাওয়া হতো সেখানে। সবচেয়ে উৎসাহ পেতাম লক্ষ্মীপুজোর দিন জলপদ্ম আনতে গিয়ে। জেলাবোর্ডের সড়কে দুমাইল এগিয়ে একটা সোতা পেতুম। পার হয়ে বলতুম, পৌছুলাম ভিন গাঁয়ে। এমনি সব সীমানা।

একেবারে অচিন গাঁয়ের অধিবাসী আমরা নই। 'তিমির তীর্থে'র সাহিত্যিক যে দেশের মাটিতে প্রণাম রেখেছেন, সে আমাদের সবার তীর্থভূমি। বাইরের সংগে তাঁর গ্রামকে একালে তিনিই যুক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাসের কথা আমরা মুখে মুখে রক্ষা করেছি। সংস্কৃত চর্চার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল নলচিড়া। এক ভট্চার্যি বাড়িতেই চৌদ্দটি টোল ছিল। নবদ্বীপে না গিয়ে অনেকে আসতেন এ গাঁয়ের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে। বিশেষ

করে তাঁরই গৌরবে নলচিড়া নিম্ন-নবদ্বীপ বলে খ্যাতি পেয়েছিল। গোটা গোটা আমলকির লোভে আমরা যেতুম 'নাক কাটা বাসুদেবে'র বাড়ি। ও বাড়ির পুকুর পাড়ে একটি খণ্ডিত বাসুদেব মূর্তি ছিল। শুনেছি নলচিড়ার এমন আরো কয়েকটি শিলামূর্তি এবং শিলালিপি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। এসব অতীত ইতিহাস নিয়ে গৌরব করতাম। কিন্তু যে ক্ষতি সহ্য করছি তা প্রকাশের মতো ভাষা কোথায়? আমাদের সর্বাংগে মাখানো থাকতো গ্রাম-মায়ের স্নেহের পরশ। এখনো মাঝে মাঝে হাবার মতো কলকাতার রাজপথে তাই খুঁজে খুঁজে বেড়াই।

সদর থেকে ডিঙি নৌকো অবশ্য বাড়ির ঘাটেই পৌছে দিতো। কিন্তু 'গয়না'র নৌকো দাঁড়াতো শিববাড়ির ঘাটে। সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে এই এলাকাটুকুরই একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। একটি শিব-মন্দির, খানকয়েক মুদী দোকান, একটি ডাকঘর এবং একটি পাঠাগার। এর যে কোনও একটিকে উপলক্ষ করেই গাঁয়ের লোক এখানে জড়ো হতেন, রসিকজন বিনা উপলক্ষেও আসতেন। শিবমন্দিরটির মূল কাঠামো জ্যাস্তো বট গাছের না ইটপাথরের বোঝা যেতোনা। ছেলেদের বসবার জায়গা ছিল ওর ফলন্ত ডালগুলো আর না হয় গাছটার বাড়ন্ত শিকড়গুলো। বুড়োরা এ খাল পারের তেঁতুল গাছটিকে নিষ্ফলাই বলতেন। ছেলেদের দৌরাত্ম্যে এর ফলের মাহাত্ম্য তাঁরা টের পেতেন না। মুদী দোকানের বৈঠক কখনো ক্ষান্ত হতে দেখি নি। গ্রামের সালিশী থেকে আরম্ভ করে কীর্তনের মহড়া সবই চলতো এইখানে। গ্রামের সব কথার মোহানা এই শিবতলায়। বিকেলের দিকে অনেকে বসতেন পাঠাগারের সামনে। দুদিনের বাসি খবরের কাগজ পৌছতো। আর তাই নিয়েই চলতো যতো পঠন-পাঠন সমালোচনা।

মহেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের বর্তমান বয়েস বারো চৌদ্দ বছরের বেশি নয়। গ্রাম ছেড়ে আসার দিনও দেখেছি হাজার দেড়েক বই এবং আনুষংগিক সবকিছু নিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে পাঠাগারটি। কোনও বিশেষ একজন এ প্রতিষ্ঠান গড়ে দেননি, এ ছিল সর্বজনের হাতে গড়া। একে কেন্দ্র করেই আমরা ছেলের দল গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতুম, ছোটখাটো সড়ক বাঁধতুম। ছোটবেলা থেকেই 'সরকারের দীঘি'র পাড়ে জংগলের মধ্যে

একটা 'কংকালঘর' দেখতুম। এটাই ছিল বিবেক আশ্রম। 'শংকর মঠে'র আদর্শে ধর্মচর্চার জন্যে এর পত্তন করলেন শচীন কর। তারপরে এলো শরীরচর্চা। তারপর সারা দেশের সঙ্গে সৎ ও শক্ত আশ্রমবাসীরা দীক্ষা নিলেন অগ্নিমন্ত্রে। 'রায়ের ভিটা'র জংগলে প্রতিষ্ঠিত হলো মহেন্দ্র রায়ের বোমার উৎসভূমি। এর পরের কাহিনী গল্পের মতো। শেষপর্যন্ত মহেন্দ্র রায় ধরা পড়লেন মেছোবাগার বোমার মামলায়। কারাগৃহেই তাঁর প্রাণ গেল।......একদিন হঠাৎ স্কুলের মাঠ থেকে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন মন্তুদা 'সরকারের দীঘি'র পারে। কাঠামোটা না ভেঙে আমরা সবশুদ্ধ আশ্রম গৃহটি মাথায় করে নিয়ে এলুম শিববাড়ি। এ দৃশ্যটি আজো মনে পড়ে। এইটেই আমাদের মহেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার। বড়ো পাঠাগার আরো দুটি আছে—একটি নিম-নদীয়া গ্রন্থাগার আর একটি ইউনিয়ন বোর্ডের লাইব্রেরী।

এমন আর একটি কথা ভাবতে বুকটা ফুলে ওঠে। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটি খুঁটির সংগে বড়ো একটা পেরেক ছিল। ন্যাশনাল স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো হতো ওইখানে। দুর্গাঠাকুর রঙ করবার সময় সমস্ত রঙ-এর সেরা রক্ত-চিহ্ন রেখে দিতুম ওই পেরেকটির চারদিকে একেবারে ছোটবেলা থেকে। দশভূজার মণ্ডপে ওই শক্ত মানুষগুলোকেই মানাতো।

ডাকঘরের কথা বলছিলুম। আমরা ছোটবেলা থেকে ও ঘরটি একজনের তত্ত্বাবধানেই দেখেছি। এর 'প্রবেশ নিষেধে'র সতর্কবাণীটি অনেককালই মুছে গিয়েছিল। 'দেখতো মাষ্টার', বলে মণি অর্ডার প্রত্যাশী অনেকেই ঘরে ঢুকে পড়তেন। ঘরের কর্তা আপত্তি করতেন না।

শিববাড়ির কাছেই নলচিড়া স্কুল। পাশাপাশি চারটি গ্রামের ছেলেদের নিয়ে এ অঞ্চলে এই প্রথম 'হাই স্কুল' স্থাপিত হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এর সংগে যুক্ত ছিলেন। তারপরে অবশ্য আলাদা আলাদা স্কুল হয়েছে। আমাদের আমলে বিজ্ঞান আবশ্যিক পাঠ্য হলো। উদ্ভিদ এবং প্রাণি-বিদ্যার আংশিক সরঞ্জাম গ্রামেই জুটে গেল। পদার্থ রসায়নের কিছু যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তাগিদে। সারা বছর ধরে দেখলাম ওর আলমারী

তালাবন্ধই থাকলো চাবি খারাপ বলে। ওর একটা জিনিষ নষ্ট হলে নলচিড়া স্কুলের পক্ষে যে ভারি বিপদের কথা!

'সরকারের দীঘি'র উত্তর-পূব কোণায় জলের মধ্যে অবিরত বুদ্বুদ উঠতো। ওই নিয়ে অনেক কাহিনী আমরা ছেলেবেলা শুনতাম। তারপর স্কুলে নলকূপ বসাতে গিয়ে গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেল মাটির তলায়। নলকূপের গর্তটার মুখে ফুটো সরা বসিয়ে দেশলাই জেলে দিতুম। খুব জোরে হাওয়া না দেওয়া পর্যন্ত নীল আলো জ্বলতো। শাপলার ডাঁটা দিয়ে ওই আলো আমরা স্কুল অবধি নিয়ে যেতুম। অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট বিমলদা আমাদের সব পাগলামোর বুদ্ধি জোগাতেন। ভূতুড়ে ব্যাপারটির কিছু হদিশ মিললো বটে। কিন্তু খুব আতংক এলো সবার মনে। গন্ধকের খনি ফেটে নলচিড়া উড়ে যাবে, নয় তো সরকার গন্ধক তুলতে গিয়ে গ্রাম উঠিয়ে দেবেন। বৃদ্ধদের পরামর্শে গর্তের মুখে মাটি চাপা দিতে হলো।

আমাদের বাঁশতলার নতুন আম গাছে আষাঢ় মাসে ফল ধরলো। জ্যেঠাইমা প্রথম ফলটি দিয়ে পাঠালেন কুতুব শার দরগায়। বড়ো হয়ে দেখেছি গ্রামশুদ্ধ লোক প্রথম ফসল উৎসর্গ করেন ওই দরগায় কুতুব শার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ওই দরগায় একখানা পাথরখণ্ডের তলা থেকে কুতুব শার আজান শুনতাম আমরা। কাজে অকাজে আমাদের ডাক পড়তো। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ওই দরগায় বিরাট মেলা বসতো। ক্ষেতের ফসল, গাছের ফলমূল, গাই-এর দুধ, যে যেমন পারতো নিয়ে আসতো। সব মিলিয়ে জাল দেওয়া হতো বিরাট একটা মাটির পাত্রে। ওই প্রসাদ সবাই নিতো অসংকোচে। বিজয়া এবং রাসপূর্ণিমার পরদিন 'সন্তেশ (সন্দেশ)-কলা' পেতে এবং রাধাকৃষ্ণের 'দেহাবশেষ' কুড়োতে আসতো হিন্দু-মুসলমান সব ছেলে-মেয়ে।

প্রত্যক্ষ দেবতার ঠাঁইতে পৌঁছুলেই হাতদুটো আপনার থেকেই যুক্ত হয়ে আসতো। ঠাকুরের খোলা, রক্ষাচণ্ডীর খোলা, হরগৌরীর ভিটে এ সবের কথা মনে দাগ কেটে আছে। দেবীদাস বক্সীর কালীমার ভোগের 'পাথর' পুকুরে পড়েছিল কয়েক পুরুষ আগে। পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে এক এয়োস্তির হাতে

পড়লো ওই থালা। মা স্বপ্ন দেখালেন। মানলো না ও। তিনরাত না পোয়াতে পরিবার শুদ্ধ নিশ্চিহ্ন হলো! প্রতিটি দেবতাকে কেন্দ্র করে এমনি সব অতীত ও চল্‌তি কাহিনীর অন্ত ছিল না। অলীক হলেও এসবে লোকের অবিশ্বাস নেই!

'কালীসাধক মঠে'র ঠাকরুণকে ভারি ভয় করতুম। বাড়িতে এলে মাঝ উঠোনে উনি বসতেন। বাড়িশুদ্ধ লোক পায়ে পড়ে প্রণাম করতাম। ছোট-বেলা থেকে ওকে একই রকম দেখেছি। মাঝে মাঝে ওঁর শিষ্যদের কাছে আমাকে দিয়ে চিঠি লেখাতেন। 'অরণ্যে রোদন' কথাটি ব্যবহার করতে হতো অনেকবার।

ঠাকরুণের কালী সাধনার গান শুনে ভয় লাগতো। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের পদাবলী গান আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। ওঁর চওড়া বুকখানায় অনেকগুলো পদক শোভা পেতো। বাংলার জেলায় জেলায় তিনি সম্মান পেয়েছেন। গ্রামে একবার ওঁর কীর্তন হলে অনেকদিন ধরে আমাদের মুখে মুখে তার অনুসরণ চলতো—'শোন বুড়িমাই, তোমাকে জানাই আমার মরম কথা।' লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুর পরেও এই কীর্তনের দল ভেঙে যায় নি। এই সংগে মনে পড়ে বৈকুণ্ঠ ঢুলীকে। কোন এক উৎসবে মাছরঙের বিখ্যাত বাজনদাররা এসেছেন। আসর খুব জমে উঠেছে। বৈকুণ্ঠ ঢুলী হাতজোড় করে বললেন,—'একটি টোকা কম পড়ছে।' পরে দেখা গেল ওর বাঁ হাতের একটি আঙুল কাটা। পরদেশী বাজনদার গুরু বলে মেনে নিলো বৈকুণ্ঠকে। ভ্রমর বয়াতির জারিগান শুনতে চার পাশের গ্রাম পর্যন্ত ভেঙে পড়তো। বাঁশের সাঁকো সেদিন শিথিল হয়ে যেতো।

কালী পুজোর পর দুদিন ধরে দত্ত বাড়ি এবং পালের বাড়ি যাত্রাগান হতো। ভোরে উঠে আগের দিনের প্রসাদ নিয়ে হাজির হতুম। দু বাড়ির আসর এবং সাজঘর সব আমাদের দেখা চাই। আসরের মহারাণী সাজঘরে বিড়ি খাচ্ছেন, এইটে দেখার খুব আগ্রহ ছিল আমাদের। আমাদের গ্রামেও যাত্রার দল ছিল। প্রথম অভিনয়ের পরেই ওর অভিনেতাদের নতুন নামকরণ হয়ে গেল। পুজোর পর কালী পুজো অবধি পর পর থিয়েটার চলতো। ওই কয়টা দিন গ্রাম থাকতো কোলাহল-মুখর। প্রবাস থেকে আসতো মানুষ, মফঃস্বলের জমিন থেকে আসতো ফসল।

রাধা করাতীর নীল পূজোর গান আমাদের মুখস্থ ছিল। মহাদেব-গৌরীর পিছন পিছন আমরা ছুটতুম এই বলে,—'শংখ পরিতে গৌরীর মনে হইল সাধ।' সন্ন্যাসের দিন আমাদের আনন্দের সীমা থাকতো না। বাস্তু পূজো উপলক্ষে আমরা গান গেয়ে ভিখ নিতুম—'আইলাম লো শরণে, লক্ষ্মীদেবীর বরণে।' 'বারবাঘের লেখাপড়ি' আমরা খুশিমতো রচনা করতুম। সারা বছর যাঁদের ওপর রাগ থাকতো বাঘ বানাতুম তাঁদেরই। দোল পূর্ণিমার আগের দিন 'বুড়ির ঘর' পোড়ানো ছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। সহজদাহ্য সবকিছু লাগতো আমাদের এ 'উৎসবে'। বাগান সাফ হয়ে যেতো। বুড়ির ঘরের উচ্চতার পাল্লা দেখে বৃদ্ধরা শিউরে উঠতেন, বলতেন,—'শেষে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবি!'

চৈত সংক্রান্তির দিন থেকে সপ্তাহখানেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসতো। মেলা বুঝে আমাদের 'খোল-খরচ' বরাদ্দ ছিল। দক্ষিণ পাড়ায় কালীতলার মেলায় মা-জ্যেঠাইমারাও যেতেন। বছরের মসলাপাতি কেনা হতো ওইখানে। বছরের পয়লা আমাদের একটা বার্ষিক কর্ম ছিল। গানের বৈঠক বসতো।

দেশ ভাগের কয়েক বছর আগে কলকাতায় নলচিড়া সম্মিলনী গ্রামের সমস্ত কল্যাণ কর্মের দায়িত্ব নিলো। ষোল বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে শচীন কর সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন। সাহেবের চরের বিশ্রামাগার, মেয়েদের হাইস্কুল, মেয়েদের কংগ্রেস, কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র সব গড়ে উঠলো। ভেঙেও পড়লো সব কটি বছরের মধ্যেই। 'রাষ্ট্রদ্রোহী' শচীন করকে যথাকালে পালিয়ে আসতে হলো। স্কুল বিল্ডিং ফণ্ডের টাকা সেদিন ফিরিয়ে দেয়া হলো। একটি অবৈতনিক পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। মাস কয়েক ওতে পড়িয়েছিলুম। ছুটির সময় হলে ছেলেরা বলতো,—'মাস্টার মশায়, জল খেয়ে আসি-ই।' সে স্মৃতিটুকু সোনা হয়ে রয়েছে।

দেশভাগের পরেও অনেকদিন আদর্শ পাঠশালা, মহেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগার এবং রেডক্রস নিয়ে মেতে ছিলুম। একদিন তাড়াহুড়ো করে সব ছেড়ে চলে আসতে হলো। সন্ধ্যেবেলা এলাম সাহেবের চরের ঘাটে। স্টিমার এলো শেষ রাতে। অতোক্ষণ আমি কি করেছি? সে সময়কার মনের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। বোধহয় ফাঁসির আগের রাতে অমন হয়।

সেদিন কলকাতায় আমাদের গ্রামের পোস্টমাস্টার মশায়ের সাথে দেখা! উনি আমাদের স্কুলেরও মাস্টার ছিলেন। এক কোম্পানীতে কেরাণীর কাজ করছেন এখন। সেদিন ওর আফিসে গিয়ে দেখি পুরানো সমস্ত কাগজপত্রে লাল কালির দাগ দিয়ে রেখেছেন, বললেন,—'ইংরেজি ভুল।' ডিগ্রীবিহীন এ সনাতন শিক্ষকটির স্থান কোথায় ?

অগোছাল কথা এখানেই শেষ করি।···বেশি ভাড়া দিয়ে একদিন এক্সপ্রেস বাসে ওঠা গেল। প্রচণ্ড বর্ষা। এমনিতেই সতর্কবাণী—'বাইরে হাত দিও না'। সাবধানীরা জানালার কবাট তুলে দিলেন। ইচ্ছে করেই দাঁড়ালুম পা-দানীর ওপর। হঠাৎ একটা স্মৃতির বিদ্যুৎ খেলে গেল মনের আকশে—ভাদ্রমাসে একটা ভরা খাল দিয়ে বাইচের নৌকো বেয়ে চলেছি। বাঁ হাতে আর পায় ঠেকিয়ে বৈঠা, ডান হতে টেনে তুলছি কলমি শাকের ফুল। বুকটা মোচড় খেয়ে উঠলো। অবাক হয়ে ভাবলুম, তাহলে আমার 'মোট ক্ষতির পরিমাণ কতো ?' !

ফরিদপুর জেলা

কোটালিপাড়া

বিশাল বনস্পতিও ধরাশায়ী হয় প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায়, বুনো হাতির পায়ের চাপে সাজানো ফুলের বাগান যায় বিপর্যস্ত হয়ে। ঠিক তেমনি তো হয়েছে আমার পূব বাংলার হাজার হাজার সোনার পল্লী-প্রতিমার অবস্থা—জলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম ভুল রাজনীতির আকস্মিক অশনিপাতে। বহু পুরুষের যত্নে গড়া কতো বাড়িঘর আজ পড়ে আছে শ্রীহীন হয়ে, খাঁ খাঁ করছে কতো বিদ্যায়তন কতো দেউল! শিবশূন্য শিবালয়গুলোতে হয়তো চলেছে অশিবের হানাহানি, হয়তো বা অনেক মঠ-মন্দির লুপ্তও হয়ে গেছে এতো দিনে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এতো নতুন কিছু নয়—দেবালয় ধ্বংসের অভিযান অনেকবারই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে ভারতবাসীকে।

একটা ক্রুদ্ধ রুদ্র নিঃশ্বাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে পূব বাংলায়। অতীত ইতিহাসের কতো গৌরবময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাংলার এক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে; কিন্তু আজ যেন এক একটা ছেড়ে আসা গ্রামের অধিবাসীদের সংগে সংগে পল্লীমায়ের সেই সব স্মৃতির আভরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌বিদিকে। এমনি এক গ্রাম-মায়ের কোল থেকেই প্রথম সূর্য-প্রণাম করেছিলাম আমি প্রায় বছর চল্লিশ আগে। আজন্ম-আত্মীয় সে মাটি আজ আমার পর—এ কি সত্য না স্বপ্ন! সত্য হলেও গ্রামকে নিয়ে গর্বের যে আমার অন্ত নেই।

আমার জন্মভূমি কোটালিপাড়া শুধুই একটি গ্রাম নয়, এটি গ্রামও বটে, আবার পরগণাও। বাংলার এককালীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ সম্বন্ধে যেমন বলা

হতো, 'নবদ্বীপে নবদ্বীপ গ্রাম, পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক নাম।' এও অনেকটা তাই। পাশাপাশি কাজোলিয়া, মাজবাড়ি, পশ্চিমপাড়া, ডহরপাড়া, পিঞ্জুরি, উনশিয়া, মদনপাড়, দীঘিরপাড়, রতাল এবং এমনি আরো বহু জনপদের সমষ্টিগত গ্রাম-নাম কোটালিপাড়া। এসব জনপদের লোকেরা বাইরে গিয়ে চিরকালই নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসছে কোটালিপাড়ার অধিবাসী বলে। গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এই পরগণা-গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পুণ্যতোয় ঘাগর নদ। ছোট বেলা থেকেই দেখে এসেছি প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে লক্ষ লক্ষ লোককে এর শীতল জলে স্নান করে গংগা স্নানের পুণ্যার্জন করতে। সে উপলক্ষে এর তীর জুড়ে বসতো বিরাট মেলা। আজো কি বসে সেই মেলা? মেলার উল্লাসে মেতে উঠার মতো মানুষের মন কি আজো আছে কোটালিপাড়ায়? আমার মন যে তা বিশ্বাসই করতে চায় না। ঘাগড়েরই কোলে গড়ে উঠেছিল ঘাগর বন্দর। সে বন্দরের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। দেশের মাটিকে বিদায় দিয়ে আসার আগেও দেখে এসেছি কতো দূরদূরান্তরের কতো পণ্যবাহী নৌকোর ছড়াছড়ি সে বন্দরে! সেদিন এক বন্ধু এসে জানালো, ঘাগড় বন্দরের যৌবনোচ্ছ্বাস আর নেই, বার্দ্ধক্যের ঝিঁমুনি লক্ষ্য করে এসেছে সে তার চোখে।

মনে পড়ে ঝনঝনিয়া, দেওপুরা, বরুয়া এবং বাগিয়া বিলের কথা। বিশাল জলরাশি বুকে ধরে এসব বিল এ অঞ্চলের মাটিকেই শুধু রসসিক্ত করেনি, এ পরগণার মানুষের মনেও বইয়ে দিয়েছে রসের বন্যা। কতো গায়ক, বাদক, কথক এবং আরো কতো জ্ঞানী-গুণী জন্মগ্রহণ করেছেন এ মাটিকে ধন্য করে! এই কোটালিপাড়ায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল। 'বারোশ বামুনের তেরোশ আড়া, তার নাম কান্দপপাড়া'—একটি অংশের এই পরিচয় থেকেই বাকি কোটালিপাড়া সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা মিলবে। কারণ প্রায় সব কোটালিপাড়া জুড়েই রয়েছে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাস। লক্ষাধিক লোকের বাসভূমি এ পরগণায় লক্ষ শিবের পুজো হতো বলে কাশীতুল্য স্থান হিসেবে এর ছিল ব্যাপক প্রসিদ্ধি। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া—বাংলার

ব্রাহ্মণ্য বিষ্ঠার এই মুকুটমনিদলের মধ্যে কারো চেয়ে ন্যূন নয় আমাদের কোটালিপাড়ার স্থান।

এ অঞ্চলে এক একটি দেবস্থান গড়ে উঠেছে এক একটি গ্রামের কেন্দ্র-পীঠ রূপে। সিদ্ধান্তের খোলার বহুবিশ্রুত চড়ক পূজোর কাহিনী যে কতো পুরানো তা জানা নেই। অনেক অলৌকিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই চরকপূজোর সংগে। ভয়ে ও শ্রদ্ধায় এ এলাকার মুসলমানেরাও চড়কঠাকুরকে প্রণামী দিয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে আসছে চিরকাল। আজো কি তারা তেমনি করে? হরিণাহাটি ও পশ্চিমপাড়ার কালীবাড়ির সংগেও জড়িয়ে আছে অনেক পুরানো কথা। মদনপাড়ের গোবিন্দদেব, সিদ্ধান্ত বাড়ির বুড়ো ঠাকুর, রতালের মনসা-দেবী, সিদ্ধেশ্বরী মাতা ও লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহও সমধিক প্রসিদ্ধ।

একেবারে ছোটবেলা থেকেই রতালের মনসাদেবী সম্বন্ধে কতো গল্প শুনে আসছি। জনপ্রিয় দেবদেবীর মধ্যে বাংলাদেশে মনসাদেবী নাকি একেবারে জাগ্রত! রঘু গাইনের নাম আজো কোটালিপাড়ার লোকের মুখে মুখে। এক সময় ফরিদপুর জেলার সর্বত্র মনসার গান গেয়ে বেড়াতেন ইনি সদলবলে। সে প্রায় শ দুই বছর আগেকার কথা। প্রত্যাদেশে মনসা পেয়ে যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঘু গাইন তাই আজ রতালের মনসাদেবী নামে খ্যাত। আদিষ্ট গীতাবলী অবলম্বনেই মনসার গান গাইতেন রঘু গাইন। অনেক অদ্ভূতপূর্ব ঘটনার কথা প্রচলিত আছে এই দেবী ও তাঁর ভক্ত রঘু গাইন সম্বন্ধে। ১৩২৬ সালের আশ্বিনের ঝড়ে রতালের গাইন বাড়ির সব ঘর ধূলিসাৎ হলেও যে ঘরে মনসার চামর ছিল সে ঘরখানি ঠিক দাঁড়িয়েই ছিল। আশ্চর্য ঘটনা বৈ কি! কিন্তু আজ যে সেই মনসা দেবীর চামর নিয়েই রঘু গাইনের বংশধরগণকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা প্রবাসী হতে হলো, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া তাকে আর কি বলবো? রঘু গাইনের প্রপৌত্র রমাকান্ত গাইনের সময়ে এক রাত্রিতে নাকি ডাকাত পড়েছিল তাঁদের বাড়িতে। কিন্তু মনসাদেবী যে বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকাতের ক্ষমতা কি যে সে বাড়ির কোন ক্ষতি করবে? নাগকুল নাকি এমনি ভাবে ঘিরে রেখেছিল বাড়ির চারদিকের সীমানা যে, দস্যুদল সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দে বাড়ির ভেতর

ঢুকতেই আর সাহস পায়নি। এতো অনেককাল আগেকার কথা। একালেও তো পূব-বাংলায় মনসাদেবীর ভক্ত সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। তাদের রক্ষার জন্যে দস্যু-দের বাধা দিতে এগিয়ে এলো না তো এ কালের নাগেরা! রঘু গাইনের মনসা-ভক্তি সম্বন্ধে ছোটবেলায় একটি অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম। সেই অভূতপূর্ব অলৌকিক ঘটনার কথা আজো মনে পড়ছে। ফরিদপুর জেলার বাইটামারি গ্রামে কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এক নবজাতকের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে হয়েছে মনসা পূজো। মনসা ভাসানের গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ হয়েছে দুটি বিখ্যাত দলের। তার মধ্যে একটি হলো রঘু গাইনের দল। গাইনের দল আসতে একটু দেরি করে ফেলায় ধনী গৃহস্বামী এতোটা উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, তাঁদের গানের আর প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়ে দিলেন তিনি। আর কোন উপায় না দেখে, ফিরে যাবার আগে মনসাদেবীকে একবার প্রণাম জানিয়ে যেতে চাইলেন রঘু গাইন। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো, কিন্তু সংগে সংগে এ নির্দেশও দেওয়া হলো যে, কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁকে পশ্চাদ্দিক থেকে দেবীকে প্রণাম করতে হবে—আসরে ঢুকে সম্মুখ থেকে তাঁকে প্রণামের অধিকার দেওয়া হবে না। তাতেই রাজী হলেন রঘু। মণ্ডপের পিছনে যেয়ে গানের সুরে প্রণাম জানালেন তিনি দেবীকে। অপূর্ব তন্ময়তা সে গানে। সমবেত সমগ্র জনতা যখন সে সুরের মূর্ছনায় বিভোর সেই অবকাশে কখন যে দেবী প্রতিমা ঘুরে গেছেন পিছন দিকে কেউ তা লক্ষ্যই করে নি। যখন চোখে পড়লো, তখন সে কি সোরগোল! শেষ পর্যন্ত উল্টো দিকেই দেবীর সামনে নতুন করে আসর বসিয়ে রঘু গাইনের মনসা ভাসানের গান শুনতে হলো সবাইকে! কঠোর বাস্তবের আঘাতে বিপর্যস্ত আজকের বাঙালী দেবদেবীর এসব অলৌকিক কাহিনী কী করে বিশ্বাস করবে?

তালতলা ভজন কুটিরের হরিসভার কথা মনে পড়ে। প্রতি পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-শুভ্র সন্ধ্যায় বসতো সেখানে ভাগবত পাঠের আসর। ভক্তিযুক্ত মন নিয়ে কতো পল্লীবাসী নরনারী আসতো সেখানে কৃষ্ণকথা শুনতে, আমিও যেতাম। সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরেও দেখেছি অজস্র লোক সমাগম হতো বার্ষিক উৎসবে, শিব

চতুর্দশী ও কালীপূজো উপলক্ষে। রতালের মহাশক্তি আশ্রমে লোকের ভিড় লেগেই থাকতো। আশ্রমাধ্যক্ষ আচার্য শ্রীবরদাকান্ত বাচস্পতি জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এঁর জ্যোতির্বিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাই এসে আপদে বিপদে জড়ো হতো সেখানে। বাস্তবিক পক্ষে মহাশক্তি আশ্রম কোটালিপাড়ায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র। শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতের দুরান্তবর্তী অঞ্চল থেকেও অনেক লোককে আসতে দেখেছি এ আশ্রমে জ্যোতিষী মাহাত্ম্যের ফল লাভের জন্যে। বাচস্পতি মশায়ের গণনা সম্বন্ধে কতো যে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প রয়েছে তারও শেষ নেই। শুধু গণনাকার্যের জন্যেই নয়, ভজনকীর্তণে, কাঙ্গালী ভোজনে, অতিথি সেবায় সর্বদাই থাকতো এ আশ্রম মুখরিত। রতালের মনসাবাড়ি নামেও খ্যাত ছিল এ বাড়ি। আশ্রমমাতা জ্ঞানদা দেবী প্রসাদ বিতরণে, দরিদ্রনারায়ন সেবায় ছিলেন অন্নপূর্ণা-রূপিনী। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কতো হিন্দু-মুসলমানের যে প্রাণরক্ষা হয়েছে এই আশ্রমমাতার কৃপায় গ্রামবাসীরা কি সে কথা ভুলতে পারে? কিন্তু তবু এঁদের সবাইকে চলে আসতে হয়েছে প্রিয় গ্রাম ছেড়ে। শুনেছি সেই মহাশক্তি আশ্রম উঠে এসেছে কলকাতা পাইকপাড়ায়। সেখানে নাকি লোকের ভিড়ের অন্ত নেই, শ্রীশ্রীনারায়ণ ঠাকুরের দর্শনার্থী সেখানে আসে দলে দলে। কিন্তু কোটালিপাড়ার সেই পরিবেশ পাওয়া কি সম্ভব কলকাতায়? আমার গাঁয়ের হরিসভায় আর ভাগবত পাঠের আসর বসে না, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে আর হয় না উৎসব আয়োজন!

কতো মহাজ্ঞানী ও গুণীজনের আবির্ভাবে ধন্য আমার কোটালিপাড়া! আবার কি আমরা ফিরে যেতে পারবো না সেখানে? পথহারা হয়েও পথ চলতে চলতে তার আকুল আহ্বান সব সময়ইতো শুনতে পাই, কিন্তু তার ডাক শুনেও পা এগুতে চায়না কেন সেদিকে? আজো কি পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়নি আমাদের পাপের? আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই কোটালিপাড়ার অতীতকে স্মরণ করে। বেদান্ত-শাস্ত্রে আচার্য শংকরতুল্য মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় মধুসূদন সরস্বতীর জন্মপূত উনশিয়া কোটালিপাড়ারই অন্তর্গত। মধুসূদনের পাণ্ডিত্যের তুলনা বিরল।

তাইতো কাশীর পণ্ডিত সমাজে আজো প্রচলিত প্রশস্তিবচনে বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে—

'মধুসূদন সরস্বত্যা পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী॥'

মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যার পরিমাণ স্থির করা একমাত্র দেবী সরস্বতীর পক্ষেই সম্ভব এবং একমাত্র মধুসূদন সরস্বতীই দেবী সরস্বতীর জ্ঞানপরিধির পারংগম। বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর সংগে যার তুলনা করেছেন কাশীর পণ্ডিত-সমাজ তাঁর জন্মস্থানের লোক আমরা আজ গ্রামমায়ের কোলছাড়া হয়ে অজ্ঞান অবোধের মতো ঘুরে বেড়াই চরম অসহায়তায়। অতি সাধারণ স্তরের লোকেরাও আজ আমাদের দেখে উপেক্ষার হাসি হাসে, আমাদের কথা শুনে সময়ের অপচয় করতে তারা নারাজ। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? মধুসূদন রচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' অদ্বৈত বেদান্তের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং ভারতের বাইরেও রয়েছেন মধুসূদনের গুণমুগ্ধ বহু দার্শনিক পণ্ডিত। নবদ্বীপ পাকা টোলের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও পরে কাশীরাজের বৃত্তিভোগী কাশীবাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্করত্ন, জয়পুর রাজ কলেজের প্রাক্তন ন্যায়াধ্যাপক স্বর্গত কালীকুমার তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতেরাও ছিলেন উনশিয়ারই অধিবাসী। বাস্তবিকপক্ষে কোটালিপাড়ার প্রধান গৌরব পণ্ডিতস্থান হিসেবেই। এ অঞ্চলের পণ্ডিতদের মধ্যে আজো যারা জীবিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ব্যাসকল্প মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের কথা। ইনি আজ স্থানান্তরে একক সাধনায় মহাকায় মহাভারত রচনায় নিমগ্ন। পশ্চিমপাড়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোটালিপাড়ার প্রথম মহামহোপাধ্যায় পরলোকগত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বর্গীয় শশিকুমার শিরোরত্ন। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ স্বর্গত রাধারমণ রায় এবং বর্তমান যুগের ভারতখ্যাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীও (নাকুবাবু) এ গ্রামেরই ছেলে। আধুনিক শিক্ষায় সুপণ্ডিত রাজনীতিবিদ্ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি ছিল দীঘির পাড়ে এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্যের গ্রামও

কোটালিপাড়ারই মদনপাড়। বাঙ্গালী শিল্পপতিদের অন্যতম স্বর্গত কর্মবীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন হরিণাহাটিতে। কোটালিপাড়াকে বড়ো করার, সমৃদ্ধ করার কতো পরিকল্পনা ছিল তাঁর! সমগ্রভাবে সে আশা পূরণ তাঁর হয়নি, তাঁর বংশধরেরা পাবে কি সে পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার সুযোগ? রতালে জন্মেছিলেন সুপণ্ডিত ও সুগায়ক-কথক রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং জ্যোতির্বিদ গোপাল মিশ্র। তাঁরা উভয়েই দেহরক্ষা করেছেন দীর্ঘকাল আগেই, কিন্তু তাঁদের দেহই শুধু নয়, তাঁদের কীর্তিধন্য নামও যে জড়িয়ে আছে আমার গাঁয়ের সোনার মাটির সংগে!

সমগ্রভাবে ব্রাহ্মণ প্রধান হলেও কোটালিপাড়ার কাসাতলী, গোয়ালংক, পিঞ্জুরি প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ বৈদ্যপ্রধান এবং আধুনিক শিক্ষায় ও প্রগতির ক্ষেত্রে এরা অগ্রণী।

সাত সাতটি হাট, দুটো দৈনিক বাজার, চারটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, দুটো সংস্কৃত কলেজ, দশ বারোটি টোল, এবং তার ওপর থানা, ডাকঘর, সাবরেজেষ্টারি আফিসে সবসময় জমজমাট থাকতো আমার সাধের কোটালিপাড়া। আর আজ? এখন নাকি সরকারী আফিস ছাড়া একটি বাজার, দুটি হাট ও একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় কোনরকমে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে বিশীর্ণ কংকালের মতো। সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ছিল যার আসল পরিচয় সেখানে আজ একটিও টোল নেই, একজনও অধ্যাপক নেই—কোটালিপাড়ার মানুষ আমরা ভাবতেও যে পারি না সে কথা!

আজ কতো স্মৃতি জাগে মনে। বড়ো বড়ো পূজোপার্বনের কথা নাই বা বল্লাম। আমার গাঁয়ের মেয়েরা-মায়েরা মিলে বছরের পর বছর মংগলচণ্ডীর ব্রত করেছে সারা বৈশাখ মাস ধরে—প্রতি মংগলবারে। তাঁদের সমস্ত মংগলকামনার প্রতিদানে ঘোর অমংগলের অন্ধকারে কেন আমাদের ঠেলে দিলেন মা মংগলচণ্ডী? তবে কি এই চরম অমংগলকে অতিক্রম করেই পরম মংগলের সন্ধান পাবো আমরা? যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে সে ইচ্ছেই পূর্ণ হোক মায়ের। ছোটবেলায় আমার দু বোনকে দেখেছি তারাব্রত করতে। তাদের মতো তাদের সমবয়সী মেয়েরাও

করতো এ ব্রত পালন গভীর শ্রদ্ধার সংগে। কতো আকাংখা কতো আকুতিই না প্রকাশ পেতো ব্রতচারিণীদের উচ্চারিত ছড়া-মন্ত্রের কলিতে কলিতে। পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন পর্যন্ত চলতো এই ব্রতাচার। পরিষ্কার উঠোনে আঁকা হতো কতো সুন্দর আলপনা। সে আলপনার ঘরে দাঁড়িয়ে তারা-বন্দনার গান গাইতো আমার দুবোন ছড়া কেটে কেটে। কী মিষ্টিই না লাগতো তা শুনতে আর কী অপূর্ব পরিবেশই না সৃষ্টি হতো শীতের সন্ধ্যায়! আজো মনে পড়ে গভীর মনযোগ দিয়েই আমি শুনতাম তারা-ব্রতের মাহাত্ম্য-কথা আমার বোনেদের মুখে! তারা সুর করে বলতো—

'তারা পূজলে কি বর পায়?
ভীম অর্জুন ভাই পায়,
শিবের মতো স্বামী পায়,
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।
তারা পূজি সাঁঝ রাতে,
সোনার শাখা পরি হাতে।'

হায়, এতো বর লাভের প্রত্যাশা সত্বেও আমার পূববাংলার মা বোনেদের আজ কী হাল? তাদের ব্রত, তাদের সমস্ত শুভ কামনা কবে সার্থক হবে? কবে আমরা আবার সগৌরবে যেয়ে ঘর বাঁধবো আমাদের পূব বাংলায়?

রামভদ্রপুর

যে দেশের জন্যে আমি হা-হুতাশ করছি সে দেশ আজ আর আমার নয়! স্বভূমি, স্বদেশ আজ আমার পরভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে দেশে জন্মেছি, যে দেশের ধূলিকণা আমার শরীর গড়েছে, যে দেশের নদীর জল, গাছের ফল আমাকে এতো বড়োটি করেছে সে দেশের ওপর আমার আজ কোন দাবীই নেই ভেবে মনটা হু হু করে উঠছে। ফুল না ফুটতেই ফুল ঝরাবার খেপামি এলো কি করে বুঝতে পারি না হাজার চেষ্টা করেও। হয়তো এই অবস্থাটিকেই রূপ দেবার জন্যেই কবিগুরু লিখেছেন—

'কোন্ সে ঝড়ের ভুল,
ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেদিন তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল ॥ হায়রে!
নবপ্রভাতের তারা
সন্ধ্যা বেলা হয়েছে পথহারা।...
...হায়গো দরদী কেহ থাক যদি শিরে করো পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে
কোন্‌খানে পাবে কূল ॥ হায়রে!'

সত্যি, প্রথম যেদিন এই মুকুল মাধুরী মেলেছিল সেইদিনই উঠলো জীবন সমুদ্রে ঝড়! সারাবেলা বীণার সুর বাঁধতে গিয়ে কঠিন টানে কেঁদে উঠে ছিন্ন তার যেন রাগিনী দিলো থামিয়ে! জীবনের ছন্দে প্রস্তুত হতে গিয়ে ভাগ্যে ঘটলো নির্বাসন। আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের এই নির্বাসন দণ্ড হলো কোন্ দোষে? নবপ্রভাতের তারা সন্ধ্যেবেলায় পথহারা হলো কেন? বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে আজ আমরা সর্বহারা নামে পরিচিত। সর্বত্র নাসিকাকুঞ্চন ছাড়া অন্য

পুরস্কার তো কপালে জুটলো না! অবাঞ্ছিত হয়ে আর কতোকাল আত্মার অবমাননা করবো? স্রোতে কি বৃথাই যাবো ভেসে, কূলে তরী কি কোনদিনই লাগবে না? এই পথের ধার থেকে তুলে কোন্ দরদী মানুষ গৃহে দেবে স্থান তা জানি না!

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার গ্রাম রামভদ্রপুরের কথা। মরুভূমির মাঝখানে নামটি যেন মরুদ্যানের শান্তির প্রলেপ এনে দেয় মনে। মাদারীপুর মহকুমার অধীনে, মেঘনার এক অখ্যাত শাখা নদীর পশ্চিমে নতমুখে সহস্র লাঞ্ছনা মুখ বুঁজে সহ্য করে যাচ্ছে আমার জন্মভূমি রামভদ্রপুর। আজো মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে আমার গ্রামের ডাক শুনি; আমাদের ফিরে যাবার জন্যে যেন আকুল মিনতি করছে সে। শুনেছি ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয় না,—আবার দেশ জননী আমাদের কোলে টেনে নেবেন ভেবে মন নেচে উঠছে পেখম তুলে। যাবো, নিশ্চয়ই যাবো আমরা ফিরে মায়ের কোলে। আমরাও তো দিন গুন্ছি আশাপথ চেয়ে। আবার আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে গলা জড়িয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করবো আগের দিনের মতো।

মনে পড়ছে আমাদের গ্রামের বাজারের কথা। নদীর ধারে বসতো বাজার। এই বাজারে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কেনাকাটা করতো জিনিষপত্র। দোকানপাটগুলো ছিল মানুষের যেন মিলনতীর্থ, সবাইকে বেঁধে রেখেছিল বন্ধুত্বের সুতোয় একত্রে। কেরামতের মসলার দোকানের খরিদ্দার ছিলাম আমরা, আবার বিখ্যাত হরলালবাবুর দোকানে রিয়াজদ্দী, দিনালী, মোবারক মুন্সী আড্ডা দিতো দিনরাত। সম্প্রদায় হিসেবে দোকান নির্বাচনের জঘন্য মনোভাব কোনকালেই আমাদের ছিল না। মনে পড়ছে মাছ কেনার সময় ঠোঙার প্রয়োজন হলে অকুতোভয়ে চলে যেতাম কেরামতের দোকানে। একদিনের জন্যেও তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখি নি। আবার অন্যদিকে, রিয়াজদ্দীর কোনদিন তরকারি বিক্রি না হলে সোজা সে নিতাই কুড়ির দোকানে বা হরলালবাবুর মুদিখানায় গিয়ে ডালাভর্তি তরকারি রেখে দিতো পরের দিন বিক্রি করার আশায়। বেতের ডালাখানি চৌকির নীচে রাখবার সময় সে হয়তো মুচকি হেসে কোন কোন

দিন বলতো—'কর্তা, থুয়ে গেলাম ডালাটা। আপনার তরকারির দরকার নাই? লাগে ত কন্ থুইয়ে আসি বাড়িতে। পয়সা হেইটা কাইল দিবেন কর্তা।' গ্রামবাসীর ওপর গ্রামবাসীর এই যে সহজ বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের গলা টিপলো কে?

বর্ষাকালে বাজারে যাবার পথে জল উঠতো জমে। গ্রামের লোকজন তখন ভাসিয়ে দিতো নৌকোর শোভাযাত্রা। যারা কষ্ট করে হেঁটে যাবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করতো তাদের ডেকে মুসলমান ভাইরাই আত্মীয়তার সুরে বলতো,—'কর্তাগ যাইতে কষ্ট হইবো—নৌকা যোওন লাগে।' মনে পড়ে ছোটবেলায় দুষ্টুমি করে দলবেঁধে তাদের নৌকো চেপে পাড়ি দিতাম অন্য গ্রামের দিকে সকলের অজ্ঞাতে। কখনো বা নৌকো দিতাম ভাসিয়ে স্রোতের মুখে। নৌকোর মালিক ঘাটে নৌকা না দেখে আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াতো এদিক-ওদিকে। কিন্তু এজন্যে তাদের মুখ-মলিন হতে কোনদিন দেখিনি, নৌকো খোঁজার পরিশ্রম কোনদিন তাদের অসহিষ্ণু করে তোলে নি। কাজের ব্যাঘাতেও সেদিন যারা নির্বিকার ছিল আজ তারা কেন ধৈর্যচ্যুত হয়ে উঠেছে?

পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে মুসলমানেরা যখন মাথায় তরকারির বোঝা আর হাতে দুধের হাঁড়ি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতো তখন আমি, কুমুদ, মাখন, সতীশ প্রভৃতি ছেলেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাদের মোট নিজেদের মাথায় তুলে নিয়ে সাহায্য করেছি। বাবুদের সাহায্য করতে দেখে তারা সভয়ে কতে' সময় দ্বিধাজড়িত গলায় বলেছে,—'এটা করেন কি কর্তা, আমিই নিতে পারুম।' এই ভাবেই চলে এসেছে আমার গ্রামের দৈনন্দিন জীবন। সেদিনের সরল সহজ জীবন কি আমরা চেষ্টা করলে আবার ফিরে পেতে পারি না?

বাজারের পাশেই ছিল মধ্য ইংরেজি স্কুল। সামনে ছোট মাঠ, তার পরেই মেঘনা নদীর শাখার উত্তালতরংগমালা যেন সমস্ত বাধা বিপত্তিকে চূর্ণ করে কূলে এসে আছড়ে পড়ার সাধনায় ব্যস্ত। লাল-নীল-বাদামী-হলুদ পাল তুলে'চলে নৌকোর ঝাঁক,—দূর থেকে ময়ূরপংখী বলে ভুল হয়। হয়তো এপার দিয়ে পাট বোঝাই নৌকো তিন হাজার মণ মাল নিয়ে চলেছে গুণ টেনে। মাঝিদের পেশীবহুল কালোকালো

শরীর বেয়ে ঝরছে স্বেদধারা। গুণ টানার পরিশ্রমে পিঠের শিরগুলো উঠছে ফুলে। পরিশ্রমও যে মানুষকে সময় সময় কতো মনোরম করে তোলে তার পরিচয় আমরা সেদিন পেয়েছি। মাঝিদের লোভনীয় স্বাস্থ্যের সংগে নিজেদের ক্ষীণ শরীর মিলিয়ে কতো সময় লজ্জিত হয়েছি মনে মনে।

গ্রামের ধনী ঈশানচন্দ্র দে মশায়ের ছেলে ললিত মোহন দের অর্থে তৈরী হয়েছিল আমাদের গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলটি। টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা বাড়ি, সমস্ত গ্রামের বিদ্যাবিতরণ কেন্দ্র। নীচের ক্লাসে আমার সংগে পড়তো আকুবালী আর ফজলুল বলে দুজন সহপাঠি। তিনজনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা থাকার দরুণই হয়তো আমরা তিনজনে বন্ধুত্বের ত্রিভুজ গড়ে ছিলাম সেদিন। ওদের ফুলকাটা সাদা টুপি, আর রঙীন ভেলভেটের ফেজ দেখে কতো সময় মন খারাপ করে ঘরের এককোণায় বসে থেকেছি—আমাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে ওরা কতো সাধ্যসাধনা করেছে কারণ নির্ণয়ের জন্যে। পরে কারণ জানতে পেয়ে হেসে নিঃস্বার্থভাবে নিজের টুপি দিয়েছে আমার মাথায় চড়িয়ে। মুহূর্তে মনের মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিতো হাসির সূর্য। তাদের টুপি মাথায় দিয়ে তাদেরই সংগে খেলা করেছি কতোদিন। কিন্তু আজ? জাতিভেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আজ পারবে কেউ এমনভাবে অন্যের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ করতে? ছোট বেলায় যারা টুপির মায়া ত্যাগ করতে পেরেছে আজ বড়ো হয়ে তারা মানুষের মায়াত্যাগ করলো কোনপ্রাণে?

মনে পড়ে আকুবালী আমাদের বাড়ি এলে মা ওকে আম, কলা, দুধ দিতেন বাটি ভরে। আকুবালী আকণ্ঠ ভোজন করে স্বহস্তে বাটিটি ধুয়ে রাখতো বারান্দায়। বারণ করলেও সে শুনতো না কথা। জানিনা কোথা থেকে আকু শিখেছিল এ ধরণের সামাজিক শৃংখলা! আমাদের খাওয়ার সময়েই হয়তো কোন কোনদিন এসে পড়েছে করিমচাচা কিংবা জয়নাল। থপ করে চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ে আকুবালীর দিকে রাগত দৃষ্টি হেনে বলেছে—'তুইতো খাইয়া লইলি পেটটা ভইরা, আমরা পেটটা ভরুম না? দেননা মা ঠাইন দুইটা আম খাইয়া লই। কর্তাগ সিন্দুইরা গাছের আমগুলা খড়ো মিষ্টি!' কতো আনন্দ করেই না মা

খাওয়াতেন তাদের ! আজো হাসি পায় তাদের ভোজনপর্বের দৃশ্যটা মনে পড়লে। আগ্রহ ভরে চেটে চেটে আম খাওয়ার ঢঙ দেখলে মনে হতো যেন বহুদিন থেকে ওরা উপবাসী ! খাওয়ার পরেই কল্কেতে ভরে নিতো তামাক।

এই যে সামাজিক হৃদ্যতা সেদিন দেখেছি তার মৃত্যু হলো কোন্ চক্রান্তকারী ডাইনীর মন্ত্রে ? মানুষ মানুষকে কেন আজ এড়িয়ে চলছে পশুর মতো ? আমরা কি স্বার্থপরতা, নীচতা, শঠতা ভুলে গিয়ে আবার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারি না ? সাধারণ মানুষ কেন হিংস্র হবে, কেন মানবীয় গুণগুলোকে বিসর্জন দিয়ে পরের ক্রীড়নক হয়ে উঠবে ? কাকে ছেড়ে কার চলে সংসারে ? আবার কি আমরা মানুষ হতে পারবো না, একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারবো না ? আমরা কি এমনি অপদার্থ যে, অন্য দেশের কটাক্ষ মেনে চলবো দিনের পর দিন ?

প্রতিবৎসর বাসন্তীপূজো হতো আমাদের বাড়িতে। এ পূজো উপলক্ষে গ্রামের ধনী-মানী-জ্ঞানী-গুণীর নিমন্ত্রণ তো হতোই, সেই সংগে নিমন্ত্রণ হতো সমস্ত গ্রামবাসীর। এ উৎসবে দেখেছি আমাদের চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল মুসলমান ভাইরা। এই দিনটির জন্যে তারা উদগ্রভাবে প্রতীক্ষা করে থাকতো বছরের প্রথম দিন থেকে। তাদের আগ্রহে পূজো যেন আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। তারাই সংগ্রহ করে আনতো বলির মোষ। নিয়ে আসতো চাঁদপুর থেকে মালপত্র সুশৃংখলভাবে। পূজোর ঢাকের আওয়াজে সমস্ত গ্রামখানি হয়ে উঠতো জীবন্ত, বহুদূর থেকে ঢাকের শব্দ শুনে লোক আসতো ছুটে। এ পূজোকে প্রত্যেকে নিজের বলে গ্রহণ করায় সেদিন কোনরকম গোলযোগই দেখা দিতো না গ্রামে। গ্রামবাসী-দের মধ্যে আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারই সমস্ত জিনিষটিকে করে তুলতো মধুময়। আজ আর সেদিন নেই। মানুষ আজ অসহিষ্ণু—সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ভুলে তারা হানাহানিতে মত্ত। সোনার রামভদ্রপুরে আজ তাই শ্মশানশ্রী বিরাজ করছে। মানুষই যে লক্ষ্মী একথা আমরা কবে বুঝতে শিখবো ?

আমাদের বাড়িতে থাকতো অংশু ঢালী আর এলাহীবক্স। তারা বাগান তদারক করতো, কাঠ চিরতো, নৌকো বাইতো—এককথায় কঠোর পরিশ্রমের সব কাজগুলোই তারা সমাধা করতো বিনা বাক্য ব্যয়ে। সকালবেলা

এক গামলা পান্তাভাত খেয়ে লেগে যেতো কাজে। ভাত খাওয়ার ব্যঞ্জনও ছিলো তাদের কতো অনাড়ম্বর—একটি পেঁয়াজ আর এক গণ্ডা কাঁচা লংকা দিয়ে এতো নির্বিবাদে এতো ভাত খাওয়া যেতে পারে তা এলাহীবক্সদের খাওয়া না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না! জীবনযাত্রা এতো সরল ছিল বলেই তাদের পক্ষে সবই সেদিন ছিল সম্ভব, কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। বিলাসের ফাঁসে পড়ে সকলেই হয়ে উঠেছে বিলাসী, এখন সারল্য তাই হয়েছে বিতাড়িত! আগে যারা কর্তাবাড়ির প্রসাদ পেয়েই নিজেদের মনে করেছে ধন্য, আজ তাদের মনোভাব অন্যধরণের। এই প্রসংগেই মনে পড়ছে আম কুড়ুনোর ছবি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগানে আম কুড়ুতে গেলে জংগু আর এলাহীবক্স কতো সমাদর করে আমাদের হাতে আম দিতো তুলে। বাগান জমা নেওয়া সত্ত্বেও তারা আপনা থেকে কোনদিনও একটি আম নেয়নি, সমস্ত আম পৌঁছে দিয়েছে আমাদের বাড়িতে। কর্তামা বা বাড়ির অন্য কেউ ডালায় ভরে যেকটা আম তাদের দিতেন তাই বাড়ি নিয়ে যেতো তারা হাসিমুখে পরম পরিতৃপ্তির সংগে। ডালা কাঁধে তুলতে তুলতে বরঞ্চ কৃতার্থ হয়ে বলতো,—'পোলাপানেরে থুইয়া আমি একলা খামু কেমন কইরা, আপনাগ দয়ায়ইত তবু পোলাপানরা আম জাম খাইতে পায়।' একথা কি বঞ্চিতের কথা? আজ ভারাক্রান্ত মনে ভাবি সময় সময় মানুষের সৌহার্দ্যবোধ কেন নষ্ট হলো? আমাদের আত্মীয়তাবোধ কি তাহলে চোরাবালির ওপর ছিল প্রতিষ্ঠিত, না হলে, তা এমন অতলতলে তলিয়ে গেল কি করে হঠাৎ? মানুষ বিংশ শতাব্দীর শেষে পৌঁছে অমানুষ হবার দিকে ঝুঁকেছে কিনা কোন্ জীবতাত্ত্বিক তা বলে দেবেন!

মনে পড়ে আমাদের বাড়ির সর্বজনীন তামাক খাওয়ার দৃশ্যের কথা। ঘরের বারান্দায় থাকতো তামাকের সাজসরঞ্জাম। বাজারের পথে বাড়ি হওয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা ভিড় থাকতো লেগে। যে কেউ তামাক খেতো তার সাকরেদ হতো জংগু আর এলাহী! বিনামূল্যে এই সামান্য তামাকের আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত, যতোক্ষণ ধোঁয়া না পেটে পড়তো ততোক্ষণ সবাই যেন স্থবির হয়ে বসে থাকতো গোলাকার হয়ে! বিদেশী পথিকরাও শ্রমলাঘবের জন্যে এখানে ক্ষণিকের জন্যে

না বসে যেতে পারতো না! আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি সেদিন, নেশার কাছে সমস্ত জাতিভেদ হয়েছিল পরাজিত। তুরীয় মনোভাবই অপসারিত করে দিয়েছিল পুরোহিত আর পয়গম্বরদের কুটিল মন্ত্রনা! সেটা ছিল মানুষের বিশ্রামাগার, ঘর্মক্লেদাক্তদেহে রৌদ্রের খর তাপ থেকে বিশ্রাম নেবার জন্যেই আত্মীয়তার সুর উঠতো নিবিড় হয়ে বেজে! ধোঁয়ার অক্ষরে অক্ষরে সেদিন লেখা হতো—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই!'

শৈশবের কোমল মনে যে ছাপ একবার পড়ে তা হয়ে থাকে অক্ষয়। এখনো হুবহু মনের মানচিত্রে সমগ্র গ্রামখানি জলজল করছে। মনে পড়ে বাজার থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে প্রশস্ত রাস্তাটি—তার দুপাশে কুমোর, নাপিত, কামার ইত্যাদি নানা শ্রেণীর বাস। আধমাইল যাবার পর ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে গিয়ে গাঁয়ের দুপাড়া এসে মিশেছে চৌমাথায়। এই মোড়টিই গ্রামের কেন্দ্রস্থল। ডাইনের রাস্তাটি মুসলমান পাড়ার বুক চিরে চলে গেছে কার্তিকপুর পর্যন্ত, বাঁয়ের রাস্তা গেছে গ্রামের উচ্চ শ্রেণীর বাবুমশায়দের পাড়া ছুঁয়ে। এই রাস্তার ওপরেই পড়ে মুন্সেফ সায়েবের বাড়ি, নাম 'বাবুবাড়ি'। ঝাউগাছ সমন্বিত প্রশস্ত খোয়া বাঁধানো চওড়া রাস্তাটি বাবুবাড়ির আভিজাত্যের পরিচায়ক। সেদিন ঝাউ গাছের বুক থেকে সোঁ সোঁ শব্দ করে যে হাওয়া যেতো ছুটে আজ সে শব্দ শুনলে মানুষের আর্তনাদ বলেই ভুল হবে! মনে হবে সহস্র দুঃখ-দুর্দশায় বুক ফাটানো আর্তনাদ ফেটে পড়ছে ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে। জানি না মুন্সেফ সায়েব সে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছেন কিনা! রাবণের চিতাগ্নির মতো এই যে মনের আগুণের আর্তস্বর অহর্নিশি শব্দায়িত হচ্ছে এর শেষ কোথায়?

এখানেই পুজোর সময় হতো থিয়েটার। থিয়েটারের জন্যে সমস্ত গ্রাম-বাসীরাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দিন গুনতো, চাঁদা তুলতো, হাতে লিখে প্রোগ্রাম তৈরী করতো। পুজোর ছমাস আগে থেকেই সিন্‌গুলো নতুন হয়ে ঝলমলিয়ে উঠতো। গ্রামের চিত্রকর মল্লিক মশায় ছিলেন এই দৃশ্যপট সজ্জার পাণ্ডা। তিনি দৃশ্যপটে আঁকতেন রামভদ্রপুরেরই গ্রাম্য ছবি। আমার গ্রামের ছবি ড্রপসিনের গায়ে কী চমৎকার যে লাগতো তা আজ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

পুজোর সংগে সংগে মনে পড়ছে মহীসারের বৈশাখী মেলার কথা। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে সাত দিন সে মেলা হতো স্থায়ী। আমরা গুরুজনদের কাছ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে পয়সা জমিয়ে মেলা দেখতে যেতাম হৈ-হুল্লোড় করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে সত্বর হাটখোলার একমাইল উত্তরে সারাদিন মেলায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতাম ক্লান্ত চরণে। হাতের পুঁটুলিতে বাঁধা থাকতো পুতুল, বাতাসা, কদমা, জিলিপি, বাদামভাজা ইত্যাদি লোভনীয় বস্তুসম্ভার। মহীসারের মেলাতে রবারের বল, মাটির গণেশ আনতেই হবে এই ছিল আমাদের নিয়ম। সে:সব দিন কি আমাদের জীবনে আর ফিরে আসবে না? এই মেলা উপলক্ষে আমাদের গ্রামে বাইচ খেলা ছিল প্রধান আকর্ষণ। শান্ত মেঘনার শাখানদীতে বাইচ খেলা সেদিন সমস্ত গ্রামবাসীকে যে উদ্দীপনা দিয়েছে তার তুলনা পাওয়া ভার। নদীর তীরে একটা দীর্ঘ বাঁশে পিতলের একটি কলসী থাকতো ঝুলানো। বাইচ আরম্ভ হলে দ্রুত নৌকো চালিয়ে যে প্রতিযোগিতায় জিতে ঐ কলসী নিতে পারবে তারই শ্রেষ্ঠত্ব সকলে নিতো স্বীকার করে। চক্ষের পলকে তীব্র গতিতে নৌকোগুলো সব হয়ে যেতো অদৃশ্য। নদীর বুকে কালো কালো বিন্দু যেন ছুটে চলেছে, সহস্র চোখে তারই দিকে তাকিয়ে থাকতো অজস্র মানুষ। উৎসাহের বাষ্পে ফেটে পড়া সে মানুষের আজ এ কি অবস্থা? যারা একদিন আনন্দকেই জেনেছিল জীবন বলে, আজ তারা উল্টো পথের পথিক হলো কেন? উপনিষদ বলেছেন যে, আনন্দ থেকেই মানুষের জন্ম,আনন্দের মধ্যেই তার লয়। কিন্তু আমরা তো তার প্রমাণ পেলাম না! আনন্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও আনন্দের মধ্যে তো বিদায় নিতে পারলাম না। তবে কি স্বর্গ থেকে এ বিদায় ক্ষণস্থায়ী? আবার আমরা আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবো? মহাজনবাক্য তো নিষ্ফল হয় না, অবিশ্বাসী আমরা সব সময় স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে পারি না বলেই অযথা দুঃখ পাই। উপনিষদ সত্য, উপনিষদ অভ্রান্ত, উপনিষদের কথা নিষ্ফল হতে পারে না। আবার আমরা মানুষ হবো, আবার আমরা সুখীস্বচ্ছল হবো। একাগ্রমনে কান পেতে শুনুন, আকাশ বাতাসে উঠছে আনন্দের সুর। আনন্দের মধ্য দিয়ে আনন্দকে চিনে নেওয়াই কর্ত্তব্য আমাদের।

কাইচাল

পূজোর ছুটি। 'ঢাকা মেল' ধরবার জন্যে ছুটে চলেছি। ষ্টেশনে একেবারে জনারণ্য। তবুও এ ভিড় অগ্রাহ্য করেই প্রতিবার বাড়ি যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে এমনিভাবে রওনা হয়েছি। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে শেয়ালদা থেকে ট্রেণ বেরিয়ে গেল। কলকাতার আলিংগন মুক্ত হয়ে চলেছি। চেনা চেনা গ্রাম ও শহরের পাশ দিয়ে হু হু করে এগিয়ে চলেছে ট্রেণ। গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমার গ্রাম আমাকে ডাকছে ফরিদপুর জেলায় কাইচাল আমার গ্রাম।

ট্রেণ থেকে নেমে নৌকোঘাটায় গিয়েছি, অমনি শতকণ্ঠে চিৎকার হয়েছে,—'কোহানে যাবেন কত্তা, এদিকে আসেন।' যে নৌকোখানি দেখতে একটু ভালো, গেলাম তার নিকট। মাঝির নাম মৈনুদ্দিন, এই তার আসল পেশা আর এমন বিশ্বাসী সে যে, নৌকোয় কিছু ফেলে গেলেও ফিরিয়ে দিয়ে যায়, সুতরাং ভাড়ার কোন প্রশ্ন উঠলো না।

নৌকো চলেছে। নৌকোর বাইরে বসে আছি, সব দেখছি। মাঝি বললে,—'কর্তা, ছইর মধ্যে যান রৈদ নাগবে ' অবসন্ন দেহ, তবু ঝিম ধরে বসে আছি, কি যে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। ফরিদপুরে 'মাইজা মিঞার খাল' বিখ্যাত, তার মধ্যে নৌকো পড়েছে। মৈনুদ্দিন মাথাল নামিয়ে রেখে মাজায় গামছা কষে নিলো। চইরটাকে একটানে বের করে নিয়ে এক চিৎকার দিয়ে বললে, 'যার যার হাতের বায়ে।' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম, দেখি কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা। মৈনুদ্দিন দিলে না, বললে,—'আপনার নাগবেনা, আপনি বসেন।'

নৌকো ছেড়ে দিলে, জিজ্ঞাসা করি কখন পৌঁছতে পারব। সে বললে, সন্ধ্যাসন্ধ্যি। পাট ভর্তি মুসুর ভর্তি আরো কতোরকম পশরা ভর্তি কতো নৌকো ঝুপঝাপ শব্দে চলেছে নিকটবর্তী কোন এক বন্দরের হাটে।

ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুঝলাম এসে পড়েছি, তবে আশেপাশে ছোট ছোট আরো গ্রাম রয়েছে, তাই আমার গ্রাম কতোদূর তা বুঝতে পারছিনা! মৈনুদ্দিন বললে,—'এই তো কাইচালের বিল, এটা পার হলেই আপনাগো গ্রাম দেহা যাবেনে।'

কাইচাল গ্রামের বাবুদের বিল। এর আছে অনেক ইতিহাস। আশেপাশে ভূত-পেত্নী ঘোরে আর বিলের মধ্যে সিন্দুকের ঘড় ঘড় শব্দও নাকি অনেকে শুনেছে; ফইটকার খালের মুখে একটা ভ্যাসালের কাছে গেলাম। সনাতন মাঝির ভ্যাসাল, ওপরে সে বসে আছে, একটা ছোট হ্যারিকেনের লণ্ঠন বাঁধা। 'মাছটাছ আছে নাকি সনাতন?' বলতেই একখানা চার পাঁচ সের ওজনের নলা এবং সের আড়াই পরিমাণ টাটকানি দিলে সে। বললে, 'লইয়া যান, দাম এখন দেওয়া নাগবে না।' খালের ভেতর দিয়ে একখানা মুসলমান গ্রাম পার হতেই কানে ভেসে এলো দোতারার ক্ষীণ শব্দ, বুঝলাম আমাদের গ্রামের নাপিতপাড়ার প্রসন্ন শীল। এ তল্লাটে ও ছাড়া আর কেউ এ যন্ত্র বাজায় না। আর জানতাম কর্মক্লান্ত দিনের শেষে রোজই ও দোতারা বাজায়। হঠাৎ 'কাহার' বাড়ির আলো দেখলাম, প্রশ্ন এলো, 'যায় কেডা?' নৌকো গিয়ে ঘাটে লাগলো।

গল্প শুনেছি যাতে বাইরের কোন শত্রু কোন হিন্দুর গ্রাম আক্রমণ করতে না পারে এইজন্যে এ তল্লাটের প্রায় প্রত্যেকখানি গ্রামই চতুর্দিকে মুসলমানদের দিয়ে ঘেরা। আমাদের গ্রামখানিও তেমনি। বহু পুরাতন গ্রাম, জমিদারপ্রধান স্থান। কালীমন্দির, শিব মন্দির, পুরাণ দীঘি, রামসাগর, সানবাঁধানো ঘাট ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য দেয়। বসু মজুমদারেরা পুরাতন বাসিন্দা। ছেলেগুলো উচ্চশিক্ষা পাওয়ায় সবাইবিদেশবাসী। তাই নাটমন্দিরের ওপরে উঠেছে বট-পাকুড় গাছ, ভেতরে বাসা করেছে কবুতর আর পেঁচা, তবু কিন্তু কোন পূজো অর্চনা বাদ যায় না।

প্রায় সমস্ত রকমের জাতের বাস আছে এ গ্রামে। ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি থাকায় আশেপাশের সমস্ত লোকের আচার ব্যবহারই ভদ্র। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রায় সকলেরই ধানের গোলা, গাইগরু এবং পুকুর আছে। তারপর প্রত্যেকখানি বাড়িই আম, নারিকেল, কলা, কাঁঠাল, ইত্যাদি গাছে ঘেরা; প্রত্যেকের সাথেই যেন নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি ঋতু উপভোগ

করেছি পরিপূর্ণভাবে, কোকিলের কুহু কুহু রব, দোয়েলের শিস্, পাপিয়ার তান। প্রকৃতিদেবী যেন আপন হাতেই সাজিয়েছেন গ্রামকে। উত্তর এবং দক্ষিণে প্রশস্ত মাঠ। শীতের দিনে দেখেছি পরিপূর্ণা যুবতীর ন্যায় মাঠখানি নানারকম রবিশস্যে ভরা—আবার বর্ষাকালে দ্বীপের ন্যায় মনে হয়েছে গ্রামটিকে। শীতের দিনে কাদের গাছি এসেছে খেজুর গাছে হাঁড়ি পাততে, ছেলের দল ছুটেছে তার পেছনে পেছনে,—'ও গাছি একটা চুমড়ি দেবে?' গাছি বলেছে, 'পান নইয়া আইস।' তার সাজ দেখলে মনে হতো যেন সে কোন যুদ্ধে যাচ্ছে।

নির্মল ঘোষ, বিমল ঘোষ মশায়রা বাড়ি আসছেন শুনলে সারা তল্লাটে সাড়া পড়ে যেতো। আশেপাশের গ্রামের লোকজন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো দেখা করবার জন্যে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠতো চঞ্চল। খেলাধূলোর বন্দোবস্ত হতো সকালে, দুপুরে, বিকেলে—যাতে কেউ বাদ না যায়। সে কী আনন্দ! প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পুরস্কার পেতো। গ্রামের পূবদিকে সাত আট মাইল দূর থেকে নির্মলবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘর দেখে লোকে 'ঐ কাইচাল' বলে এ গ্রাম ঠিক করে। কয়েক বৎসর হলো একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া দেশের এবং দশের অনেক উপকার এবং কাজ এঁরা করেছেন। এঁদের কাজকর্ম দেখে সকলেই বলাবলি করতো, লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে এঁরা দু ভাই দৃঢ়সংকল্প।

এঁরা যখন চলে এসেছেন তখনো নির্জীব হয়নি গ্রাম। ছোট হিস্যার খোকাদার কাছারীঘরের দোতলায় প্রায় সব সময় চলছে নাচের মহড়া—এক, দুই, তিন। বড়ো হিস্যার কাছারীতে চলছে নামকরা অভিনেতাদের পার্ট, কতো অংগভংগি সহকারে মাষ্টার তাদের শেখাচ্ছেন। তারপর মণীন্দ্রমোহন বসু মজুমদারের কাছারীতে চলেছে গান-বাজনার তোড়জোর।

গ্রামে ছিল পোষ্ট অফিস। দূর গ্রাম থেকে কোন লোক এসেছে দরকারে, যতো শীঘ্র সম্ভব ফিরে যাবে; কিন্তু ভুলে গেছে সে তার জরুরী কাজ। এ কাছারী ও কাছারী ঘুরে দেখেশুনে ডাকঘরে যেতে যেতে ডাকঘর হয়ে গেছে বন্ধ!

গ্রামের মোহন শীল বিকট কালো পোষাক পরে কপালে বড়ো একটা সিন্দুরের

ঝোঁটা দিয়ে খাড়াহাতে জল্লাদের ভূমিকায় যখন থিয়েটারের আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তখন অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। খোকাদার প্রকাণ্ড আটচালা ঘরে হচ্ছে যাত্রাগান—গ্রামের রাসভারী প্রকৃতির লোক সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দলের সেক্রেটারী, দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয় ম্যানেজার, শ্রোতার সংখ্যা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই। কারণ জমিদার বাড়িতে গান, তারপর স্বয়ং জমিদাররা উপস্থিত। জায়গায় জায়গায় পেয়াদা এবং বরকন্দাজরা বাঁশের এবং বেতের লাঠি হাতে দণ্ডায়মান হয়ে খবরদারী করছে।

যখন চড়ক পূজো এসেছে, তখন কী মাতামাতিই না সুরু হয়েছে! 'বালা সন্ন্যাসী'রা নানারূপ কৃচ্ছ্র সাধন করে এই জাগ্রত এবং ক্রুদ্ধ দেবতার পূজোর জন্যে তৈরী হয়েছে। খোকাদার বেলতলা পুকুরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি আস্ত গাছ ডুবে আছে—যে সে গাছ নয়, ওর ভেতর রয়েছে দেবতা! প্রবাদ আছে চড়ক পূজোর ঢাকের বাজনা শুনলে ঐ গাছ ভেসে ওঠে। এই পূজোর দিন যতো সব ভূত, পেত্নী, দানব, দৈত্যি নেমে আসে এবং অবাধে যাতায়াত করে; তাই ঐদিন আগে থেকেই সাবধান হয় সব ছেলে-মেয়েরা।

গাজন গান হবে। গ্রামের অক্ষয় পাল এবং নগরবাসী মণ্ডল পুরাণ আলোচনার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে, কতোলোক জমেছে। জ্ঞানীজন সব বসেছে সম্মুখে, পাশে দুটো ঢাক তৈরী হয়ে রয়েছে। হচ্ছে গাজন গান, কী সে আনন্দ! একবার স্যাওড়া গাছের ডাল কাটায় গ্রামের একটা ছেলে ভীষণ অসুখে আক্রান্ত হয়। বাঁচবার আশা তার মোটেই ছিল না পরে প্রকৃত ঘটনা জেনে মানত করে পূজো দেওয়া হয় গাছের গোড়ায়। তারপর সে রোগমুক্ত হয়। আমি নিজে দেখেছি। কাজেই অবিশ্বাস করতে পারি না। তবে হতে পারে কাকতালীয়।

বীজ বপনের সময় বৃষ্টির পাত্তা নেই। সারা মাঠ প্রখর রৌদ্রতাপে ফেটে খাঁ খাঁ করছে। কৃষককুল হায় হায় করছে। অহোরাত্র কীর্তন হচ্ছে। হঠাৎ কেউ বললে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত নিশাতলা—ওখানকার দেবতা স্বপ্নে বলেছে পূজো দিতে! অমনি সবাই মিলে সেখানে গিয়ে দেবতার পূজো দেয়, তিন চার মণ দুধ

দিয়ে যে যে গাছে দেবতা আছে তাদের স্নান করায়। আমরা দেখেছি সেই দিনই কি পরের দিন ভীষণ বৃষ্টি হয়ে মাঠ ভাসিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধিতে এ সবের ব্যাখ্যা চলে না। কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই ঐ জায়গাটিকে ভয় করে এবং ভক্তিও করে। হায়, আর কি কোনোদিন ফিরে যাবোনা সে দেশে, আমার সোনার গাঁয়ে !

কালীবাড়িতে আছেন জাগ্রত কালী, পাশে সাতটি শিব। প্রত্যহই পূজো হয়। আমরা শুনেছি আমাদের কালীবাড়িতে নরবলি পর্যন্ত হয়েছে !

ফাল্গুন মাস। কলকাতা থেকে সুধাংশু বাবু এসেছেন। অনেক গুলী এনেছেন। বাড়িতে তাঁদের বন্দুক আছে। ছেলের দল সব তৈরী হয়েছে ঘোড়ামারার বিলে পাখি শিকারে যাবে। কতো আনন্দ এতে পেয়েছে গ্রামের ছেলেরা। তিন চারটে বাতাবী লেবুর গাছ ছিল, কেউ কোন দিন পাকালেবু দেখে নি—কারণ ওসব দিয়ে ফুটবলের কাজ চালাতে হয়েছে।

পশ্চিমপাড়ার ঠিক কোণায় ছিল নগেন-ক্ষিতীশদের বাড়ি। তাদের মার সংগে আমার মায়ের ছিল বড্ড ভাব, দুজনেই বিধবা। নিজের তিনটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও কি ভালোই না বাসতেন তিনি আমাকে। প্রত্যেকদিনই গিয়েছি তাঁদের বাড়িতে আর কিছু মুখে না দিয়ে কোনদিনই ফিরতে পারি নি। অনেকে মনে করিয়ে দিতো, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু মাসীমার অপত্যস্নেহের কাছে কোন কথাই টিকতো না। মনেপ্রাণে মাসীর মুখে হাসি দেখতে চেয়েছি। নগেন-ক্ষিতীশ থাকতো বিদেশে। মাসীর দুঃখ, তারা ঠিকমতো চিঠি দেয় না ; নগেন বড়ো ভাই হয়েও ক্ষিতীশের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছে না, আরো কতো কি মাসী নালিশ জানাতো আমার কাছে। আজ নগেন, ক্ষিতীশ, মাখন তিনজনেই সংসারী হয়েছে, বেশ সুখে-শান্তিতেই আছে। কিন্তু মাসী তাঁর বৌ আর নাত-নাতনীদের নিয়ে দেশে থাকতে পারলে তাঁর কতো বেশি আনন্দ হতো !

তারপর বিশ্বকর্মা পূজোয় ভাণ্ডার গাঙে নৌকোবাইচ। রতন সর্দার সকালেই তার বাবরী চুলে সাবান দিয়ে ফুলিয়েছে, কপালে বড়ো সিন্দুরের ফোঁটা দিয়েছে, লাল গামছা একখানা পরেছে, আর একখানা মাথায়

বেঁধে একহাতে ঢাল এবং অপরহাতে লকলকে ধারালো খড়্গ নিয়ে নৌকোর ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আশি হাত লম্বা নৌকো, দশবারো হাত হবে তার গলুই। দুপাশে পিতলের চক্ষু, আরো কতো কি দিয়ে সাজানো। গলুইএর ওপরে পিতলের দুটি সাপ ফনা তুলে রয়েছে এবং নৌকোর দোলায় দোলায় উভয়ে উভয়কে আঘাত করছে। রতন সর্দার বোল বলছে—

'আমার নায়ে হোলক গাবি কে,

আরে হোলাবিলাই সাথী করবে

কাহই আইনা দে।'

গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেকটি আম গাছের কোন-না-কোন নাম রয়েছে। আমাদের পুকুরপাড়ে উত্তর-পূব কোণে ছিল একটা খুব উঁচু আমগাছ—নাম তার থোপাঝুড়ি। ঐ গাছের মাথায় ছিল বড়জিয়াল পাখির বাসা। তারা স্বামী-স্ত্রীতে প্রহরে প্রহরে ডাকতো। পুকুরপাড়ের গাছে ছিল মাছরাঙার গর্ত। মাছরাঙা পুকুর থেকে মাছ ধরে পেয়ারাগাছের ডালে বসে খেতো। আমি বাঁশ-গুলী দিয়ে অন্য অনেক পাখি মেরেছি, কিন্তু এদের কোনদিন মারি নি। এখন কে আমায় খবর দেবে তারা আছে কি না?

পূবপাড়ায় ত্রিনাথের মেলা। কে যেন গান ধরেছে,—'আমার ঠাকুর তেন্নাথের যে করিবে হেলা…', তারপর যেন কি ভুলে গেছি। গণশা গিয়েছে সেখানে, তাই কামিনীদি ডাকছে,—'ও গণশা—ঘরে সোমত্ত বউ, আর তুই গান শুন্‌ছিস্?' কামিনীদি শুতে যেতে পারছেন না। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর সেসব বিলাপ শুনতাম।

এখানে আমার ঘুম ভাঙনোর কেউ নেই, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আমার ঘরের কোণে বেতের ঝোপে ডাহুক-ডাহুকি, আরো কতোরকম পাখি ঐক্যতান বাজনার মতো ডেকে ভোরে আমার ঘুম ভাঙাতো।

গ্রামের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বৃদ্ধ ঘোষাল মশায়কে। তিনি যখন মাথায় কলসী নিয়ে অপরূপ ভংগিমাতে নাচতেন, তখন গ্রামের কতো লোক এসেছে তা দেখবার জন্যে। এখনো লোকমুখে সে নাচের খবর শুনতে পাওয়া যায়।

অক্ষয় চক্রবর্তী মশাই চামর দুলিয়ে রামায়ণ গান করতেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সব তন্ময় হয়ে বসে শুনতো। রামের বীরত্বে কে না পুলকিত হয়েছে, লক্ষ্মণের কথায় কার না শরীরে রোমাঞ্চ দিয়েছে, সীতার দুঃখে কে না অভিভূত হয়েছে? কিন্তু আজ সে সব স্মৃতি!

আজকাল পঞ্চায়েৎ প্রথার কথা খুবই শুনছি কিন্তু। অথচ আমার গ্রামে এ সব সময়েই ছিল। আশেপাশের কোন গ্রামে বা কোন লোকের সংগে কারুর ঝগড়া-বিবাদ হলে জমিদার বাড়ির পেয়াদা গিয়ে নিয়ে আসতো তাদের খবর দিয়ে। গ্রামের প্রবীণ লোকদের ডাকা হতো, জমিদার উপস্থিত থাকতেন, সুক্ষ্ম বিচার হতো, উভয়েই খুশি মনে গল্প করতে করতে চলে যেতো। এইভাবে কতোলোক অযথা অর্থব্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো!

গ্রামের চতুস্পার্শে দু-তিন মাইলের মধ্যে ভাংগার হাট, পোড়াদিয়ার হাট, নগরকান্দার হাট, ফলিখালির হাট আর আউরাকান্দির হাট—বর্ষাকালে দেখেছি কতোলোক কতোরকমের নৌকোয় করে ছুটেছে হাটের দিকে। আবার শুকনোকালে দেখেছি মাঠের ভেতব দিয়ে নানা রাস্তায় লোক ছুটেছে কাতারে কাতারে হাটের দিকে। কারো মাথায় ধামার ভেতর কয়েকটি লাউ কিম্বা কিছু বেগুন, না হয় তো অন্য কোন তরিতরকারি, কারো হাতে দুধের ভাড়। এরা সবাই আপন আপন ক্ষেত কিম্বা বাড়ির জিনিষ নিয়ে চলেছে হাটে। তারা ধানের দর পাটের দর, ভাংগার হাটে কয়খানা ধানের নৌকো এসেছে ইত্যাদি বলাবলি করতে করতে চলেছে।

জমিদার বাড়িতে পুণ্যা হবে। কাছারীঘর সাজানো হয়েছে। ভোর হতেই প্রজারা সব আসছে দুধ, মিষ্টি আর টাকা নিয়ে। এদিকে আটটায় সর্দারী খেলা হবে, নামকরা সব সর্দাররা এসেছে। কে কতো ভাল খেলা জানে আজ তার প্রমাণ হবে স্বয়ং জমিদারের সামনে। আফা সর্দার কলসীর উপর থালা উপুড় করে বাজাতে আরম্ভ করেছে, আর আর সর্দাররা পা তুলে নেচে নেচে কতো রকমের কায়দা দেখাচ্ছে। এসব দৃশ্য চোখে ভাসে। আবার কবে দেখব?

খালিয়া

নদীর নাম কুমার, গাঁয়ের নাম খালিয়া। নামের মধ্যেই মূর্ত হয়ে রয়েছে নদীটির পরিচয়। কুমারের মতোই সংযত ও সাবলীল ছন্দে অবিরাম বয়ে চলেছে সে তার অনির্দেশ্য যাত্রায় মধুমতীর উদ্দেশে। তার যাত্রাপথের দু ধারে রেখে যায় সে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের পরিচয়। তার অফুরান প্রাণ-বন্যার পরশে দু তীর ঘিরে সে গড়ে তুলেছে অপরূপ স্বপ্নদ্বীপ ···· ছোট ছোট গ্রাম। নদী আর খাল, শিমূল আর বকুল, বেত-বাতাবীর ঝোপ-ঝাড় আরো কতো অজস্র নাম জানা-নাজানা গাছ-গাছাদির সবুজে শ্যামলে ঘেরা আমার এই ছেড়ে আসা গ্রাম খালিয়া।

আজ থেকে প্রায় চারশ বছর পূর্বে এক অপরাহ্ণবেলা প্রায় শেষ হয় হয়। গোধূলির অন্তিম রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে কুমার নদীর প্রশান্ত জলধারায়। এমনি সময়ে তার তীরে এক প্রাচীন অশ্বত্থমূলে গভীর চিন্তামগ্ন এক তরুণ বসে বসে ভাবছে তার অনাগত বিধিলিপি। তার প্রশস্ত ললাটে পড়েছে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা। অনির্দেশ্য পথের উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ যাত্রীর মনের একটি বন্ধ দুয়ার সহসা খুলে গেল। দূর প্রান্তরের পানে তাকিয়ে চেয়ে থেকে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্বগতোক্তি করলে,—'ওই প্রান্তরই হবে আমার প্রাচীন অশ্বত্থের আশ্রয়।'

বাংলার ইতিহাসের পাদটিকায় এই তরুণ ব্রাহ্মণ রাজারাম রায় নামে পরিচিত। রাজারাম আপনার বাহুবলে কালক্রমে ফরিদপুর জেলার এই কুমার নদীর তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে একাধিপত্য বিস্তার করে খালিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর পাতার কুটীর রূপ নিলো সাতমহলা প্রাসাদে। তাঁর সেই বিশালায়তন প্রাসাদের এক-চতুর্থাংশ মাত্র আজ বর্তমান।

রাজারাম শুধু নিজের প্রাসাদ তৈরী করেই ক্ষান্ত হয়ে ছিলেন না। যে সব কারিগর, মজুর ও শিল্পীর অক্লান্ত শ্রম ও মমতায় তাঁর প্রাসাদটি গড়ে উঠেছিল,

রাজারাম তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক, জমি, যায়গা প্রভৃতি দান করে নিজ গ্রামের পাশেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এ ছাড়া রাজারাম তখনকার দিনে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের সুসন্তানদের এনে নিজ গৃহের আশে পাশে তাদের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে দেন। ধীরে ধীরে রাজারামের প্রাসাদটিকে ঘিরে গড়ে উঠলো একখানি ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম।

কালক্রমে রাজারামের জমিদারী ও প্রতাপ এতোদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, তদানীন্তন মোগল সম্রাট রাজারামকে রায় চতুর্ধারী উপাধিতে অলংকৃত করেন! চতুর্ধারী শব্দের শব্দগত অর্থ হলো যিনি চারিটি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। এই চতুর্ধারী শব্দই ক্রমে লোকমুখে রূপান্তরিত হয় চৌধুরীতে। কথিত আছে একবার বারভূঁঞাদের অন্যতম প্রধান সীতারাম রায় রাজারাম রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজারাম তাঁর অজেয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সীতারামকে পরাভূত করেন। এই অজেয় সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিল নমঃশূদ্র প্রজাবৃন্দ। এরা একদিকে যেমন দুঃসাহসী ও দুর্দম, তেমনি সরল ও নম্র এদের প্রকৃতি। এরা প্রধানত জমির চাষ-আবাদ ও কুটির-শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। অনেকে করতো মাঝি-মজুরের কাজ। আবার এরাই ছিল তখনকার দিনে প্রতাপশালী ভূস্বামীদের মজুত জংগী-বাহিনী।

কালের আবর্তনে সেই রাজারামের আমল অতীত হয়ে গিয়েছে কবে। তবু অলিখিত ইতিবৃত্ত ভাস্বর আখরে লেখা রয়েছে গাঁয়ের মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়। ছেলেবেলায় আমরা ঠাকুমা-দিদিমার মুখে রাজারাম রায়, জয়চন্দ্র রায়, তাঁদের পার্শ্বচর ভোলা বাগ্দী, রহিম শেখের রোমাঞ্চকর জীবন-কথা শুনে ভেবেছি—সত্যি কি তেমনি কাল কোনদিন ছিল, না এ-সবই কাল্পনিক রূপকথার কোন অবাস্তব কাহিনী।

আড়াই শ বছরের বৃটিশ শাসন তার দুষ্টক্ষতের চিহ্ন যদিও রেখে গেছে পূর্ব-বাংলার প্রতি পল্লীতে, তবু সে আমলেও গ্রামগুলো যে কিছুটা উন্নত ও আধুনিক হয়েছিল সেকথা অস্বীকার করবো না। আমাদের খালিয়া গ্রামও কয়েকটি বিষয়ে আধুনিককালের সাথে তাল রেখে চলেছিল। আমাদের বাড়ির পশ্চিমদিকে খালপাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস। আধুনিক সভ্যতার

এক অমূল্য অবদান এই ডাক ও তার বিভাগ। সাত-সমুদ্র তের নদী পারের আপন মানুষের নিরালা মনের কথা তারা এনে পৌঁছে দিয়েছে গাঁয়ের মানুষের কাছে। রোজ সকালে দেখতাম আমাদের গাঁয়ের ডাক-পিওন জলধর তার সেই চিরপরিচিত জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়ে একটা হলদে ক্যাম্বিসের ব্যাগ কাঁধে করে যখন বাজার-খোলায় এসে হাজির হতো তখন চারদিক থেকে গাঁয়ের লোকেরা তাকে অস্থির করে তুলতো চিঠির তাগাদায়। যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন একদিন সারা পাশ্চাত্য জগতের অগ্রগমনে দিয়েছিল অবিস্মরণীয় গতিবেগ—যার ঢেউ-এর দোলায় টেমস্ নদীর উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার ক্ষীণ রেশ আমাদের ওই আত্মভোলা কিশোর কুমার নদীর প্রশান্ত বুকেও এসে লেগেছিল। তাই দেখে এক সময় গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্ময়ান্বিত হতো। সেই প্রথম বিস্ময়ের পর অনেক দিন অতীত হয়ে গেছে, এখন আর গাঁয়ের লোকেরা জাহাজ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে না।

কতো তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশে উড়ো জাহাজের ঝাঁক দেখে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের কোলে জড়োসড়ো হয়ে ডাগর ডাগর চোখ দুটো তুলে বলতো,—'মা-ওই বুঝি সেই পরনকথার ব্যাঙমা পাখি?' গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ মুদী বলতো, ও হলো পুষ্পক রথ। কতোদিন দেখেছি খালিয়া বাজারের পুলের কাছে শ্রীকণ্ঠ মুদীর সেই দোকানটা হর ঠাকুরদার বক্তৃতায় সরগরম হয়ে উঠেছে। দেখেছি, হর ঠাকুরদা মাঝে মাঝে তাঁর হাত দুখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাইচরণ, নিতাই, রসুল মিঞাদের বোঝাচ্ছে,—'বোঝলা কিনা রসুলভাই সেই যে মহাভারতে ল্যাখছে পুষ্পক রথের কথা। হেই পুষ্পক রথই এহন উড়োহাস জাহাজ অইয়া আকাশে উইড়া বেড়ায়।' শ্রীকণ্ঠও ঠাকুরদার কাছ থেকেই শুনেছে পুষ্পক রথের কাহিনী। রসুল নিরক্ষর চাষী। সে মহাভারত পড়ে নাই। তবু ঐ শ্রীকণ্ঠ মুদীর দোকানে বসেই সে মহাভারতের গল্প শুনেছে অনেকদিন। রসুল তার দাড়ির মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বিজ্ঞের মতো কইতো,—'তা কথাডা ঠাউরমশায় যা কইছ হেয়া একালে মিথ্যা নয়।'

গ্রামের বাজারে প্রতি বৎসর মেলা বসতো চারবার। একটি বারুণীর দিনে,

একটি পয়লা বৈশাখে, রথের সময় দুদিন। পয়লা বৈশাখের মেলার নাম 'গলুয়ের মেলা'। এইদিনে আগে কবি-গান হতো এবং অনেক দল পাল্লা দিয়ে গান করতো। একবার একজন মেয়ে কবিওয়ালী প্রতিপক্ষকে বলেছিল—

'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি কুনো,
মুখপোড়া গাবুর একটা বুনো
নচ্ছার তোরে করবো তুলোধুনো।'

বলা বাহুল্য সকলের মতে তারই জিত হলো।

আমাদের গাঁয়ের পূব-পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। রাজারামের নাম অনুসারেই গাঁয়ের লোকে তার নাম দিয়েছিল রাজারাম ইনষ্টিটিউট। আশেপাশের দু দশখানা গাঁয়ের ছেলেরা এই শিক্ষায়তন থেকেই প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। তাদের মধ্যে অনেকে আজ সমগ্র দেশের বরেণ্য—সারা দেশের গৌরব। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি দেশবরেণ্য অম্বিকা মজুমদার মশায়ও একদিন এই রাজারাম ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধক কবি ও দার্শনিক কিরণচন্দ্র দরবেশও ছিলেন এই খালিয়া গ্রামেরই ছেলে। তিনিও ছিলেন একদিন এই রাজারাম ইনষ্টিটিউটের ছাত্র। বর্ষাকালে যখন খালিয়ার পথঘাট নদীনালা একাকার হয়ে যেতো তখন আমাদের বিদ্যালয় প্রাংগণও জলে থই-থই করতো। ছাত্ররা তখন দূরদূরান্তর থেকে নৌকো করে এসে স্কুলে পড়াশোনা করতো। যাদের নৌকো থাকতো না তাদের ডোঙায় অথবা কলাগাছের ভেলায় করে স্কুলে আসতে হতো। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ যে কতো প্রবল ছিল এ থেকেই তার কিছুটা বোঝা যায়। এই বিদ্যালয়টির পিছনে ছিল নিরাড়ম্বর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অকৃত্রিম অনুরাগ। কিন্তু আজ সে বিদ্যালয়টির চারদিক ঘিরে গুমরে উঠছে শুধু এক 'নাই নাই' রব। নাই সে সব নীরব দেশকর্মী শিক্ষকেরা—নাই সে সব দুষ্টুমি আর খুশিতে উজ্জ্বল কিশোর ছাত্রদের কলরব।

বিদ্যালয়টির পাশেই ছিল একটি সাধারণ গ্রন্থাগার। গাঁয়ের উৎসাহী তরুণ কর্মীরা এই গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলেছিল।

স্বদেশী যুগে যেদিন বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বেজে উঠেছিল পরাধীনতার শিকল ভাঙার ঝন্‌ঝনানি সেদিনও আমার এই ছেড়ে আসা গ্রামখানি সিংহের মতো অধীর হয়ে উঠেছিল শিকল ভাঙার উন্মাদনায়। বাবার কাছে শুনেছি কতো নিস্তব্ধ অমারাত্রির অন্ধকারে খালিয়ার মুক্তিপাগল দুর্বিনীত তরুণদল তাদের স্বাধীনতার সাধনায় মগ্ন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে ঝোপ-জংগল ঘেরা কালীমন্দিরের আংগিনায়! সেখানে চলতো বিপ্লবীদের লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বন্দুক চালনা, বোমা তৈরী আর চলতো গভীর মন্ত্রণা কি করে বেনিয়া দস্যু শ্বেতাংগদের হটিয়ে দেয়া যায় সাগরপারে। সারা ভারতের বিপ্লবী বীর বালেশ্বর সংগ্রামের প্রথম শহীদ কিশোর চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীর সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায় সুরু হয়েছিল এই খালিয়া গ্রামের ঝোপে-জংগলে। যে স্বাধীনচেতা রাজারাম প্রাণের নিবিড় মমতায় গড়ে তুলেছিলেন এই খালিয়া গ্রাম—দেহের প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তার স্বাধীনতা, বহু যুগান্তে তারই এক বংশধর তরুণ বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় সারা ভারতের মুক্তির জন্যে বালেশ্বরের যজ্ঞভূমিতে নিজের অস্থিমজ্জা রক্তমাংস আহুতি দিয়ে পিতৃঋণ শোধ করে গেছে। জবাব দিয়েছে খালিয়া গ্রামের মুখপত্র সারা বাংলার হয়ে—সারা ভারতের পক্ষ থেকে উদ্ধত শ্বেতাংগ শাসনের ও শোষণের প্রতিবাদে। সেই শহীদ-তীর্থ খালিয়া গ্রামের মানুষ আজ ভারত শাসকদের কাছে উদ্বাস্তু মাত্র—আর কিছু নয়। কী মর্মান্তিক পরিহাস! ভাবতেও আজ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

আজ আমার ছেড়ে আসা গ্রামের কথা লিখতে বসে একটি দিনের কথা কেবলই মনে পড়ে। গ্রামে তখন শারদোৎসবের ধূমধাম। বহু দূরদেশ থেকে প্রবাসীরা সব গাঁয়ে ফিরে এসেছে মাটির মায়ের টানে। আমাদের গাঁয়ে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দুর্গোৎসব হয়ে থাকে। তাই পুজোর কটাদিন গাঁয়ের কারুরই থাকা-খাওয়ার কোন বাধা বিধিনিয়ম থাকে না। সব বাড়িতেই সকলের নিমন্ত্রণ। ফেরার দিন সকাল থেকেই সব জিনিষপত্র বাঁধাছাদা সুরু হয়ে যায়। বিকেলেই বাড়ি থেকে যাত্রা করতে হবে। দিনটা দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল। বিকেলবেলায় দেখি রাজুদা বাইরের দাওয়ায় বসে গুরুক্ গুরুক্ করে তামাক

খাচ্ছে। মাথায় একটা লাল গামছা পাগরীর মতো করে বাঁধা। রাজুদা আমাদের নৌকোর মাঝি। জাতে নমঃশূদ্র। আমাকে দেখেই রাজুদা বলে উঠলো,—'কি ছোট-কর্তা, দেরী করতে আছো ক্যান্। হ্যাসে তো ইষ্টিমার পাব না য়্যানে। হকাল হকাল বাইরাইয়া পড়ো।' বাড়ির দীঘির ঘাট থেকে নৌকো ছাড়লো যখন আমাদের তখন দিনের সূর্য ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যের কোলে ঢলে পড়েছে। নৌকো যখন খালের প্রান্তে সাধুর বটতলার পাশ দিয়ে কুমার নদীতে পড়লো তখন গোধূলির স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে পড়েছে আমার ছেড়ে আসা গ্রামখানির ওপরে। আমার ভাইবোনেরা নৌকোর ছইয়ের ওপর বসে দেখছে সেই অপরূপ বিলীয়মান ছবি। গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে যতোই দূরে চলে আসছিলাম ততোই আমার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠছিল কী এক অনির্দেশ্য বেদনায়। চোখ দুটো হয়ে উঠছিল অশ্রুছলছল। কী যেন নাই! কী যেন হারিয়েছি, কাকে যেন চাই, কাকে যেন আর পাবো না—এমনি এক অসহায় মর্মরাঙা বেদনা আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল। সেই অব্যক্ত বেদনার মূল আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধু অজ্ঞাতে অস্ফুটে কখন বলে চলেছিলাম—

'মাতৃভূমি স্বর্গ নহে সে যে মাতৃভূমি,
তাই তার চক্ষে বহে অশ্রুজলধারা
যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।'

গ্রাম ছেড়ে আসার সংগে সংগে মনে পড়ছে পল্লীকবির রচিত একটি গান। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্র খেদোক্তি করে বলেছেন—

'সুমিত্রা মা বলবে যখন,
রাম এলি তুই কইরে লক্ষ্মণ—
(আমি) কোন্ প্রাণ ধরে বলব তখন:
মাগো, তোমার লক্ষ্মণ বেঁচে নাই।'

দেশজোড়া লক্ষ্মণের দল আজ শক্তিশেলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কবে তাদের সবার মূর্ছা ভাঙবে সে আশায় দিন গুনছি।

চৌদ্দরশি

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে বাঁচবার জন্যে প্রেরণার বাণীও দিয়ে গেছেন আমাদের। কিন্তু আমরা মানুষের কাছ থেকে নির্বাসিত হলাম, তাদের মধ্যে ঠাঁই তো পেলাম না! যেখানে আজীবন কাটালাম সেখানে আমাদের আর কোন স্থান নেই আজ। কীর্তিনাশাও যেখানে তার স্বভাবগুণে আমাদের বসবাসের জন্যে 'চৌদ্দরশি' জায়গাটি সৃষ্টি করলো, সেখানে হিংস্রমানুষ আমাদের থাকতে না দিয়ে তার কুটিল অনুদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে। কালবৈশাখীর হঠাৎ ঝড়ের তাণ্ডবে আমরা শীতের ঝরাপাতার মতো উড়ে গেলাম নিজের দেশ থেকে। এ ঝড় কোথা থেকে এলো? কার অদৃশ্য কারসাজিতে আমাদের 'বাস্তুভিটে' ছেড়ে আসতে হয়েছে? সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন আজ আমরা 'উদ্বাস্তু' নামে চিহ্নিত হচ্ছি? একেই হয়তো অদৃষ্টের পরিহাস বলে! অঘটনপটন পাটোয়ারের দল যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে তার 'বলি' আমরাই হলাম ভেবে মাঝে মাঝে চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

আমাদের গ্রামের নাম চৌদ্দরশি। গ্রাম ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু তার স্মৃতি ভুলতে পারছি কই? যেখানকার বাতাসে আমার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মিশে রয়েছে তাকে এক কথায় মনের মণিকোঠা থেকে ঝেড়ে ফেলি কেমন করে? দৈহিক অপসরণ সম্ভব হলেও কল্পনার অশ্বমেধ ঘোড়াকে আটকাবো কোন্ যাদু মন্ত্রে? এখনো অসতর্ক মুহূর্তে গ্রামের নদীর ধারের, বাবুদের ডাক্তারখানার, স্কুলের মাঠের, বাগানবাড়ির স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। চৌদ্দরশি কি আজো প্রাণমাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সকলকে আকর্ষণ করছে?

ফরিদপুর শহর থেকে চৌদ্দরশির দূরত্ব মাত্র পনেরো মাইল। বর্ষাকালে টেঁপাখোলা হয়ে নৌকোয় যেতে হয়, অন্যসময় মোটরে। ফরিদপুর জেলায় সকলেই

আমাদের গ্রামের নাম জানেন। জিজ্ঞাসা করলে সকলেই রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন, যদিও মূল চৌদ্দরশি বলে কোন নির্দিষ্ট গ্রামই নেই। পূর্বে স্থানটির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো কীর্তিনাশা পদ্মানদী। অকস্মাৎ তার গতিপথ বিপরীতগামী হওয়ায় তার বুকে প্রকাণ্ড চর জেগে ওঠে। যেখানে যখন চর জাগতো জমিদারের লোক এসে মাপামাপি করতো রশির ক্রমিকসংখ্যায়। এই চরগুলোই গ্রামের ভূমিকা। গ্রাম গড়ে ওঠে কীর্তিনাশার আনুকূল্যে, কিন্তু গ্রামের নাম থেকে যায় রশিমাপের সংখ্যাতত্ত্বের ওপরেই। এমনিভাবে পত্তন হয়েছে বাইশরশি, সাতরশি, নয়রশি ইত্যাদি নানা গ্রামের, আর এইসব গ্রামের সমষ্টিই শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছ চৌদ্দরশি ডাকনামে।

চৌদ্দরশি গ্রামের সংগে সংগে মনে পড়ছে গ্রামের জমিদারবাবুদের কথা। 'জমিদার' নামটির মধ্যে যে ভয়াবহতার চিহ্ন থাকে তা এঁদের মধ্যে ছিল না। এ জমিদারেরা অমায়িক। ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা জেলায় এঁদের বিরাট জমিদারি—এমন প্রতিপত্তিশীল জমিদার পূর্ববংগে খুব কমই ছিল। তিন সরিকের জমিদারি, তিন ভাইয়ের তিন হিস্সে। তিনজনের বাড়ি, মন্দির, বাগান, দীঘি নিয়ে যেন তিনটি শহর। আমলা-কর্মচারী, পাইক-পেয়াদা, সেপাই, মোসায়েবের দল গিস্‌গিস্ করতো। বাবুরা পায়ে হেঁটে কোথাও বেরুতেন না, তাঁদের প্রত্যেকের ছিল সুসজ্জিত পাল্কী। পাল্কী-বেহারাদের 'হেঁইও হো—হেঁইও হো'র একটানা শব্দ শুনেই বোঝা যেতো কোন জমিদারবাবু আসছেন। পাল্কীর সামনে পেছনে চলতো বন্দুকধারী সেপাই। মনে পড়ছে বাবুদের দেখবার জন্যে গ্রামের ছেলে-বুড়ো এসে জুটতো রাস্তার দু-পাশে। সে জনতায় হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে থাকতো না,—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সবাই উঁকি দিতো পাল্কীর দরজায়। দেড়মাইল দূরে গ্রাম্যনদী ভুবনেশ্বরী। নদী চলার পথে জমা থাকতো বাবুদের বড়ো বড়ো বজরা। আয়তনে ছিল মোটরলঞ্চের চেয়েও বড়ো। ত্রিশ-চল্লিশ জন মাঝিমাল্লা ছাড়া এ বজরা চালানো সম্ভবপর হতো না। মাঝিমাল্লারা ছিল প্রায় সকলেই মুসলমান। হিন্দু-জমিদারের সুখ-সুবিধের জন্যে তারা একদিন প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পারতো। গ্রামই করতো না হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের

জিগীরকে। বাবুদের পেয়াদাও ছিল সকলেই মুসলমান—তাদের লাঠি সড়কির ওপরেই নির্ভর করতো বাবুদের মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি। সেখানে কোনদিন তো ভেদাভেদ দেখিনি। এক হিন্দু জমিদারের মুসলমান লাঠিয়ালরা বাবুর সম্মান রক্ষার জন্যে অন্য জমিদারের মুসলমান লাঠিয়ালের মাথা চূর্ণ করে এসেছে দ্বিধাহীন চিত্তে! ঠিক এর উল্টোটাও হয়েছে। তখন মানুষ ছিল বড়ো। ধর্মের বিকৃতরূপ মানুষের মাথা খারাপ করতে পারেনি। মুসলমান পরিবারের সাহায্যার্থে কতো হিন্দুকে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে দেখেছি। বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে গরুর গাড়ি বোঝাই করে টাকা পয়সা আনার গল্প শুনেছি। জমিদাররা ছিলেন এমনি ধনী। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহাল করতেন কর্মচারী। তাঁদের কাছে ধর্ম বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল কর্মঠ লোকের অকৃত্রিম পরিশ্রম। মুসলমানরাও বুঝতো সে কথা, তাই তাদের কাজে কোথাও ফাঁকি থাকতো না। বড়ো হিস্সের রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ, মেজো হিস্সের রমেশচন্দ্র ও ছোট হিস্সের দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ। তাঁদের জমিদারি তদারকের জন্যে থাকতো তিনজন অবসরপ্রাপ্ত জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট।

হিন্দু হলেও তিন সরিকের মধ্যে কখনো কখনো বিবাদ বাধতো. কিন্তু সে কহলের ফল সাধারণত হতো শুভই। জনসাধারণ তাঁদের কলহমন্থন করে লাভ করতো অমৃত। বড়োবাবু নিজের সুনামবৃদ্ধির জন্যে যেই দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, মেজোবাবু তার পাল্টা জবাব দিলেন ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ বসিয়ে। ছোটবাবু চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি ফরিদপুরে উদ্বোধন করলেন সিনেমা হাউসের। এমনিভাবে সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জনগণ পেলো হাই স্কুল, হাঁসপাতাল, কলেজ ইত্যাদি। এগুলো থেকে সুযোগ-সুবিধে পেতো গ্রামবাসীরাই—হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের গণ্ডি টেনে কোনদিন এসব প্রতিষ্ঠানকে খাটো করা হয়নি। আজ আর সেদিন নেই। কলেজের হিন্দু অধ্যাপকদের অবমাননা করেছে তাঁদেরই স্নেহভাজন মুসলমান ছাত্রবৃন্দ। দেশের এই বিষাক্ত আবহাওয়া পরিষ্কারের কোন পথই কি আর খোলা নেই?

গ্রামে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বড়ো আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হতো। সবচেয়ে ধুম হতো জমিদার বাড়িতে। গ্রামবাসীরা যে যেখানেই থাক এসে

জমায়েত হতো এই সময়টিতে। কয়েকদিনের জন্যে গ্রামের বুকে অপূর্ব হিল্লোল জাগতো যেন। পুজোর তোড়জোড় চলতো একমাস আগে থেকে। এই উপলক্ষে ময়দান ভরে যেতো রকমারি দোকানপাতিতে, কার্নিভাল ও সার্কাসে। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে ভরে যেতো দেশ। এই আনন্দের পূর্ণাহুতি হতো তখন যখন কলকাতা থেকে আসতো নামকরা যাত্রার দল। আজ আর যাত্রাগানের আদর নেই তার এই উৎসভূমি কলকাতায়। কিন্তু মনে পড়ে দেশে আমরা যাত্রা শোনবার জন্যে কতো রাত্রি পর্যন্ত উৎসুক হয়ে কাটিয়েছি। কতো রাত্রি অনিদ্রায় কেটে গেছে কোন্ দল আসছে তারই জল্পনা-কল্পনায়! কোন্ দলের কোন্ অভিনেতা অন্যদলের চেয়ে ভালো তা নিয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে ভেবে আজ এতো দুঃখের মধ্যেও হাসি আসে! যাত্রাগান শোনার জন্যে শ্রোতারা আসতো দূরান্তরের গ্রাম থেকে। বিদেশ থেকে আসতো আত্মীয় পরিজনবর্গ। অপূর্ব আনন্দ কোলাহলে দিনগুলো কোথা দিয়ে যে চলে যেতো বোঝাই যেতো না। টনক নড়তো গ্রাম ছাড়বার সময়। সাময়িকভাবে গ্রাম ছাড়তেও যাদের চোখে জল আসতো সেদিন, আজ তারা চিরতরে কি করে গ্রাম ছেড়ে দিন কাটাচ্ছে?

মনে পড়ে বাড়ির বাঁধানো পুকুর ঘাটে, বাগানের মধ্যে কতো আশাময় ভবিষ্যৎ-সুখস্বপ্নের কথা হয়েছে। পুজোর এক সপ্তাহ আগে থেকে রাতের পর রাত জেগে হয়েছে গান শোনা এবং গান গাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা। নবমীর মোষ বলি দেখে কতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে চোখ বুঁজে রয়েছে। পশু-রক্ত দেখে মুসলমানকে আতংকিত হতে দেখেছি সেদিন। কিন্তু আজ কাদের প্ররোচনায় মানুষের রক্তও মানুষের মনে বিতৃষ্ণা আনতে পারছে না? অসভ্য পার্বত্যজাতির মধ্যে আজো নরবলি হয়ে থাকে শুনি। কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে এই যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তা যেন সেই সব বর্বরজাতিকেও লজ্জা দেয়!

আমাদের স্কুলটি ছিল বড়ো চমৎকার। সামনে খোলা মাঠ, পেছনে শ্রেণীবদ্ধ আমবাগান। মাঝখানে বাঁধানো পুকুর। ছবির মতো পরিবেশ। আমাদের মাষ্টার মশায় সুরেশবাবু ছিলেন সেই স্কুলের প্রাণ। পড়াশুনোয়, খেলাধুলোয়

তিনি অনুপস্থিত থাকলে পণ্ড হয়ে যেতো সব কিছুই। আজ বহু কর্মীপুরুষের সান্নিধ্যে এসেও তাঁর কর্মনিষ্ঠার মনোমুগ্ধকর ছবি বড়ো হয়ে চোখের সামনে ভাসছে দিনরাত। তাঁরই উৎসাহে আমাদের "Rashi's Eleven Football Club"-এর জন্ম হয়েছিল! ফুটবল খেলার জন্যে আমরা তখন পাগল,—ফুটবলের জন্যে রাজ্যপাট বিলিয়ে দিতেও তখন আমরা পেছপা নই! রাম, মালী, লক্ষণ, বিশু, ব্রজা, নৃপেন আর সুরেশবাবুকে নিয়ে আমরা পনেরো বিশ মাইল পথ পাড়ি জমাতাম ম্যাচ খেলার জন্যে। কোন বাধাই আমাদের আটকে রাখতে পারতো না।

ডাক্তারখানার পুকুরঘাটে ছিল আমাদের আড্ডাখানা। বিকেল হতে না হতেই এসে জমায়েত হতাম সেখানে। জার্মানীর ফ্যাসিবাদ নিয়ে, চার্চিলের ইম্পিরিয়ালিজম নিয়ে, আমেরিকার এটমবম নিয়ে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা নিয়ে আমাদের তর্কের শেষ থাকতো না। এ আড্ডায় হিন্দু-মুসলমানের অবাধ গতায়াত ছিল। শান্তির স্বপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই ছিল সমান উৎসুক। কিন্তু শান্তির জন্যে যে সব যুক্তিজালের অবতারণা হতো সেদিন, আজ আঘাত খেয়ে বুঝেছি তা ছিল ভুয়ো! মুখে শান্তির বুলি আউড়ে মনে সংগ্রামের বিষ জিইয়ে রেখে মানুষ আর যাই করুক দেশের দশের মংগল সাধন করতে পারবে না কোনদিন। মানবতাবোধের অপমান সমগ্র মানবজাতিকেই হাড়ে হাড়ে পংগু করে দিবে একদিন।

চৌদ্দরশির বাজার আমাদের তল্লাটের নাম করা বাজার। মংগলবার ও শনিবারে হাট বসার জন্যে বহু দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও লোক আসতো বেচাকেনার জন্যে। ধান, চাল, পাট, দুধ, মাছ, তরিতরকারির রাশি রাশি অস্পষ্ট ছবি আজকে মনে পড়লে স্বপ্ন বলে ভুল হয়। অল্পমূল্যে বেশি জিনিষ এখানে কোথায় পাওয়া যাবে বলুন? দুধ বা মাছ কোনদিন আমাদের গ্রামে সের হিসেবে বিক্রি হয়নি। খুব মাগ্‌গি বাজারেও চার আনায় আড়াই সের খাঁটি দুধের হাঁড়ি কিনেছি। তরিতরকারি তো নাম মাত্র মূল্য!

বুধাই শীলকে মনে পড়ে। বুদ্ধিদা বলে আমরা ডাকতাম তাঁকে। সংগীতবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার যন্ত্রে তাঁর হাত ছিল

অসাধারণ। তাঁর আঙুলের স্পর্শ পেয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলো যেন কথা বলে উঠেছে। আমরা ছিলাম তাঁর বাজনার নিয়মিত শ্রোতা। বাবুদের বাড়িতে গানবাজনার আসর বসলেই বুদ্ধিদার ডাক পড়তো সকলের আগে। ওঁদের বাড়িতে শিক্ষকতা করে তাঁর সংসার নির্বাহ হতো। আজ বুদ্ধিদা কোথায়? সংহারের উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যে সংগীতের স্বজনী প্রতিভা কোন নিরাপদ দূরত্বে তাঁকে নিয়ে যেতে পেরেছে কিনা জানিনা। দূরে গিয়েও তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে বলে দেবে?

ডাক্তারখানার পুকুরে আজ আর লোকসমাগম হয় না শুনেছি। স্কুলের মাঠের আর সে পরিবেশ নেই, স্থরেশবাবুও অন্য কোথাও পলাতক, পূজাবকাশে জনতার ভিড় নেই, জমিদারবাড়িতেও পূজো বন্ধ। সব আনন্দ কে যেন একসংগে অপহরণ করে নিয়ে এক অভিশপ্তভূমিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে সমস্ত দেশটিকে। আমরা আজ আপন ঘরেই তাই পরবাসী!

খাসকালি

অনেকদিন আগেকার কথা।

চাকরি উপলক্ষে কিছুদিন ছিলাম আসামের এক মহকুমা-শহরে। আত্মীয়-স্বজন বিহীন প্রবাস জীবনে তখন আসন্ন ছুটির মধুর আমেজ।

সকালে সবে ঘুম থেকে উঠেছি। এমন সময় দেখা দিলেন এক নব-পরিচিত বন্ধু। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুতে উঠলাম। দেয়ালে পেরেক ঠুকে সাজানো ছিল একগাদা টুকরো কাগজ। তাইতে টুথ-পাউডার ঢেলে নেওয়া রোজকার অভ্যাস। সেদিনও ছিঁড়ে নিলাম এক টুকরো কাগজ। আপন মনেই বললাম: আর একুশ দিন।

বন্ধু শুধালেন: কিসের একুশ দিন?

হেসে বললাম: ছুটির বাকি।

পেরেক ঠোকা কাগজগুলোর দিকে চেয়ে বন্ধু শুধালেন: তাই কি ওতে লিখে রেখেছেন একুশ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু একুশ নয়, পরপর লেখা আছে এক পর্যন্ত।

বন্ধু বিস্মিত হলেন: কেন বলুন তো?

কারণ একটা দিন যায় আর ভেবে আনন্দ পাই যে, ছুটিটা আরো একটা দিন এগিয়ে এলো।

ওঃ, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্যে আপনি তো একেবারে পাগল দেখছি।

সবিনয়ে জবাব দিলাম: শুধু বাড়ি যাবার জন্যে নয়, পাগল হয়ে আছি গাঁয়ে যাবার জন্যে।

বলেন কি, এই বয়সেও গাঁয়ের জন্যে আপনার এতো মমতা? গাঁয়ের মাটির জন্যে মানুষের এতো তীব্র আকর্ষণ!

নিশ্চয়ই! তাই তো কবি দেবেন সেন বলেছেন—

'সর্বতীর্থ সার
তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার।'

আরো অনেক কথাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেদিন বলেছিলাম। বন্ধু একটুখানি হেসেছিলেন মাত্র।

আমিও হেসেছিলাম সেদিন রাতে। জাগরণে নয় স্বপ্নে।

ধূলো-ঢাকা যশোর রোডের বুকে নেমেছে বৈশাখী পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোছনা। পথের দুধারে অর্জুন গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো। আলো-ছায়ার আল্পনা আঁকা পড়েছে ধূলোর রাস্তায়।

ওইতো দেখা যায় বাঁশতলার পুল। বর্ষায় খরস্রোত কুমারের উদ্ধত জলধারা যখন ওই সংকীর্ণ পুলের সঙ্কীর্ণতর ছিদ্রপথে পথ খুঁজে মাথা আছড়াতো অবিশ্রাম, পুলের মুখে তখন প্রতি বৎসর সৃষ্টি হতো একটা তীব্র ঘূর্ণাবর্ত। ছেলেবেলায় আমরা ওকে বলতাম 'বাটি'। ক্ষুধার্ত কুমার-নন্দন যেন মুখর মুখ ব্যাদন করে আছে তীব্র আক্রোশে। ছেলেবেলায় আমরা পুলের উপর থেকে ওর ক্ষুধার্ত মুখে ফেলে দিতাম কচুর পাতা, বটের ছোট ডাল, ভাঁট ফুল, আরো কতো কি। সেগুলো স্রোতের মুখে দুতিনটে পাক খেয়ে ঘূর্ণাবর্তের অতল গহ্বরে যেতো তলিয়ে। আমরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেসে উঠতাম করতালি দিয়ে। ঘটনার ক্ষুরধার ঘূর্ণাবর্তে আজো অতলে তলিয়ে যাচ্ছে জীবনের আশা, আনন্দ, করতালি। কিন্তু আজ আর হাসবার অবসর নেই। আজ শুধু ক্রন্দন। কুমার, পদ্মা, মেঘনার তীরে তীরে শুধুই মর্মভেদী হাহাকার।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম।

ওই বাঁশতলার পুলের পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের ছোট রাস্তা। দু পাশ ধরে ছোট ছোট খেজুর গাছের সারি। ধানের ক্ষেত। দিগন্তবিস্তৃত গজারের বিলের রহস্যময় হাতছানি।

রাস্তা ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেই ছোট কাঠের একটা পুল। মস্ত-বড়ো একটা তেঁতুল গাছের ছায়া দিয়ে ঘেরা। পুলের দু পাশ দিয়ে কাঠের রেলিং। সকাল-সন্ধ্যায়, সময়ে-অসময়ে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলের ওটা বেওয়ারিশ

আড্ডার জায়গা। বর্ষায় ওর আশেপাশে ছোট ছোট ছিপ দিয়ে মাছ ধরে ছোট ছোট ছেলেরা। বসন্ত সন্ধ্যায় ওই রেলিং-এ ভর দিয়ে গলা ছেড়ে গান গায় কিশোর বালকের দল। যুবকদের আড্ডা-ইয়ার্কি চলে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাকে মন্থর হয়ে আসে পল্লীর আকাশ। গ্রাম-বৃদ্ধেরা তখন ওই পুলে জমায়েৎ হয় সমাজ পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে। ন্যায় ও অন্যায় শাসনের রকমারি ফতোয়া জারি করে। পুলের নিচে খালের জলধারা কুলকুল রবে বয়ে চলে।

এই তো পৌঁছে গেলাম গাঁয়ে।

গ্রাম, কিন্তু ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত, নিরানন্দ, কুঁড়েঘর সম্বল কতকগুলো জীর্ণ শীর্ণ স্বপ্নহীন মানুষের বাসভূমি নয়। ঝকঝকে টিনের দুতিন মহলা বাড়ি, আম-জাম-নারিকেল-সুপারি-কাঁঠালের বাগান, তাল-খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বাঁধানো কাক-চক্ষু জলভরা পুকুর, ত্রিনাথ-বাউল-হরিকীর্তন-যাত্রাদলের আনন্দধ্বনি মুখরিত প্রাংগণ, আর পর্যাপ্ত আহার-নিদ্রা-লালিত তৈলচিক্কণ মানুষ—এই নিয়ে গড়া একটি মানববসতি। এই বাংলার গ্রাম। তোমার আমার সকলের। হায়রে সেদিন!

গ্রামে ঢুকতেই বাঁদিকে আগাছায় ঢাকা একটি পড়ো ভিটে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো যাকেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করো, বলবে—হরি কাকার ভিটে।

ক্ষণেকের তরে সময়ের নদীতে লাগুক উজানের টান। ফিরে চলো কুড়ি বছর আগেকার এক মধুর চৈত্র সন্ধ্যায়।

হরি কাকার বাড়ি। সামনে আমগাছে ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রাংগণ। প্রাংগণের এক পাশে চৈত্রপুজোর আসন পাতা।

দাওয়ায় বসে আছেন হরিকাকা। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সরকারী কাকা। একহারা কালো চেহারা, করিৎকর্মা লোক। গ্রামের যাত্রাদলে পার্ট করেন। অর্জুনের ভূমিকা থেকে খেমড়ার ঘুঙুর-নৃত্য অবধি সব অভিনয়ে তিনি সমান দক্ষ।

হরিকাকা এবার জুড়ে দিয়েছেন চৈত্রপুজোর মেলা।

বিকেল হতেই গাঁয়ের সৌখীন ছেলে-বুড়োর দল একে একে জমতে লাগলো

কাকার আঙিনায়। আমগাছের তলায় কলার পাতা পেতে সবাই এক সাথে খেলো খিঁচুড়ি প্রসাদ। তারপর সন্ধ্যার পর থেকে সুরু হলো বেলোয়ারি সঙ নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ। কেউ সাজলো লোলজিহ্বা খড়্গহস্ত মহাকালী, কেউ বা বাঁশরী-ভূষণ শ্রীনন্দনন্দন, কেউ ত্রিশূলধারী শশ্মানচারী ভোলানাথ, আবার কেউ বা নৃত্য-পরায়ণা সুন্দরী উর্বশী।

সারা রাত ধরে চলে গৃহ হতে গৃহান্তরে সঙ নিয়ে পল্লী পরিক্রমা। পল্লীবাসীরা পরম আগ্রহে সঙের দলকে বাড়িতে ডেকে নেয়। গান শোনে। নাচ দেখে। সাধ্যমত 'বিদায়ী' দেয় চাল ডাল পয়সা। দেখতে দেখতে সঙের দলের ভাণ্ডারীর ঝুলি ভরে ওঠে। কালের কুটীল গতি! সেই পল্লীবাসীরা আজ কোথায়?

অতএব ওপথ ছেড়ে চলো যাই গ্রামের 'তরুণ পাঠাগারে'। ও পাড়ার মুখুজ্জেদের কাছারী বাড়িতে গাঁয়ের ছেলেদের নিজের হাতে গড়া পাবলিক লাইব্রেরী। অনেক রকম বই ওখানে পাবে। গণেশ দেউস্করে 'দেশের কথা' থেকে পাঁচকড়ি দে-র 'নীলবসনা সুন্দরী' পর্যন্ত। পড়তে পড়তে সবুজ সঙ্ঘের মুখপত্র হাতের লেখা মাসিক পত্রিকা 'তরুণ'-এর কয়েকটি পুরাণো সংখ্যাও হয় তো পেয়ে যাবে। তাতে কতো সম্ভব অসম্ভব ধরণের লেখার সন্ধান পাবে তা তুমি কল্পনাও করতে পারো না। দেশ-উদ্ধারের এক বিষম জ্বালাময়ী পরিকল্পনার যে আভাষ ওতে প্রকাশিত হয়েছিল তার সন্ধানে একদিন পরম পরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তির পর্যন্ত টনক নড়ে উঠেছিল। হাসবার কথা নয়। সত্যি, ওই পাঠাগারে অনেকবার পুলিশে সার্চ করেছে। কিন্তু সার্চের দিন আজ গত হয়েছে। ওই পাঠাগারের পাশের রাস্তা দিয়ে এখন 'মার্চ' করে চলেছে নতুন কালের পুলিশরা। জানি না, সে মার্চ কোন 'ফার্স্' হয়ে দাঁড়াবে কিনা। সেখানকার! একালের অধিবাসীরা আজ গৃহহারা বাস্তত্যাগী। তাদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি!

কিন্তু গ্রাম পরিক্রমার এখনো অনেক বাকি। হরিকাকার বাড়ি বাঁয়ে রেখে, ডাইনে ফেলে অশ্বত্থ-গজানো উঁচু দোল-মঞ্চ—চলো আরো এগিয়ে!

উলুধ্বনি শুনতে পাচ্ছ? বেলা এখন দুপুর। গাঁয়ের কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী বুঝি 'দুধ-চিনি' দিতে এসেছে পূজো মণ্ডপে। কবে হয়তো ছেলের জ্বর হয়েছিল

গন্ধম মেখে। স্নেহময়ী মাতা মানত করেছিল পুত্রের রোগমুক্তি হলে পূজো-মণ্ডপে দেবীর আসনে দেবে 'দুধ-চিনি'। ও তাঁরই কণ্ঠের উলুধ্বনি। তুমি যদি এখন সেখানে উপনীত হও, তাহলেও প্রসাদ পাবে একটু চিনি বা এক টুকরো বাতাসা। পল্লীর দেবসেবার সংগে মানব-সেবার যোগ অংগাংগী।

ওই পূজো-মণ্ডপে এ গাঁয়ের 'টাউন হল', আশে পাশের পাঁচ-গাঁয়ের ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালত। বছরে একবার এখানে হয় মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজো। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলের মন পূজোর তিনদিন বাঁধা থাকে এই মণ্ডপের চতুঃসীমানায়। গান বলো, বাজনা বলো, আনন্দ বলো, উৎসব বলো,—সারা গাঁয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধারা ওকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ওই পূজোমণ্ডপ গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। সন্ধ্যায় ওখানে গ্রামবৃদ্ধ সমাজপতিদের সভা বসে। কতো আলাপ-আলোচনা, বিচারদণ্ড চলে। প্রতি রবিবারে বসে হরি-সংকীর্তনের আসর। কলিযুগের মুক্তিমন্ত্র হরিনাম গান আর মৃদংগের বোলে নৈশ পল্লীর তারাভরা আকাশ মুখর হয়ে ওঠে। হায়রে! বাংলার সে-আকাশ জুড়ে আজ সর্বহারা আর্তনাদ, মৃত্যুর বীভৎস হাহাকার।

ওই পথ ধরে আরো খানিক এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে, টিনের আটচালায় বসেছে পাঠশালা। কানাই মাষ্টার আর রজব মৌলবীর শিক্ষাদান চলেছে অব্যাহত গতিতে। পাঠশালার সামনে দেখবে, ছেলেরা সার ধরে দাঁড়িয়ে নামতা পড়ছে সমবেত কণ্ঠে—দুই-একে দুই, দুই দুগুণি চার, ইত্যাদি।

তাই বলে এই ভরা দুপুর বেলা ও পথ ধরে আর যেও না কিন্তু। জানো না তো আর কিছুটা এগিয়েই পথ শেষ হয়েছে পুরাণো কালীখোলায়। বেতের ঝোপ আর ভাটির জংগল দিয়ে ঘেরা সামান্য একটু জায়গা। দুটো প্রাচীন বট গাছ শাখা-প্রশাখা মেলে জায়গাটাকে একেবারে ঢেকে রেখেছে। তারি একপাশে খড়ের ভাঙা মন্দিরে বিকটদর্শন বিরাট কালীমূর্তি। উইয়ের ঢিপিতে ঢেকে গেছে পদতলে শায়িত মহাদেবের অর্ধেক দেহ। কাটা-কুমড়োর লতা এসে ঘিরে ধরেছে কালীমূর্তির রূপালী মুকুট। এক পাশে হয় তো আস্তানা গেড়েছে একটা শেয়াল। ও নাকি মা কালীর জাগ্রত রক্ষী। তোমাকে দেখে যদি হঠাৎ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে

চেঁচিয়ে ওঠে, তবে আর রক্ষা নেই। মা কালীর তৃতীয় নয়ন নাকি তাহলে বিদ্যুৎ চমকের মতো একবার তোমার উপর দিয়ে খেলে যাবে। আর অমনি তুমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে—

আর কোথায় যাও? এই তো গ্রামের শেষ। ওই তো সামনে ধু-ধু করছে চম্পার বিল। তার থৈ-থৈ করা কালো জলে লাল পদ্মফুলের আলোকরা শোভা। সেই পদ্মফুল একদিন দিয়েছিলাম কিশোর বেলার বন্ধুর হাতে অনুরাগের লীলা-কমল করে। ফুল পেয়ে কিশোর বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় প্রণাম করেছিল। তার ছেলে মানুষীতে আমি হেসে উঠেছিলাম অট্টহাসি।

সেই হাসি হেসেছিলাম আর একদিন আসামের এক মহকুমা-শহরে। জাগরণে নয়, লীলা-কমলের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু যে স্বপ্ন এতোক্ষণ তোমায় দেখালাম, সে তো শুধুই স্বপ্ন নয়। একদিন তো এই-ই সত্য ছিল। যে গ্রামটিকে কেন্দ্র করে একদিন স্বপ্নের জাল বুনেছিল অনেক কিশোর মানুষ, সে তো একটি গ্রাম মাত্র নয়, সে যে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙ্গালী সভ্যতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

গ্রামের নাম খাসকান্দি। ফরিদপুরের জেলা শহর থেকে যশোর রোড ধরে মাত্র সাত মাইল দূরে একটি সম্পন্ন গ্রাম। সকাল বেলাকার নগর-সংকীর্তনের দল, দুপুরের পাঠশালা, অপরাহ্নের দুধের বাজার আর রাতের যাত্রাদলের আসরের জন্যে আশেপাশের অনেক মানুষের মুখে মুখে একদিন ফিরতো এই গ্রামের প্রশংসা-ধ্বনি। কিন্তু সে গ্রামের কথা আজ বুঝি অবাস্তব স্বপন-কাহিনীতেই পর্যবসিত হয়। হায়রে ধুলিলুণ্ঠিত বিশুষ্ক পলাশ, লীলা-কমল! হায়রে আমার সোনার গ্রাম— আমার ছেড়ে আসা গ্রাম!

কুলপদ্দি

ছোটবেলায় দিদিমার কোলে বসে এক স্বপনপুরীর গল্প শুনতাম। সেখানে গাছে গাছে সোনা ফলতো। হীরার মতো বৃষ্টিরা ঝাঁক বেঁধে নেমে আসতো সেই দেশের বুকে। নদীর কলতানে শোনা যেতো বীণার ঝংকার। কতো আগ্রহ নিয়ে সেই দিন সেই গল্প শুনেছি, আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলেছি বৃদ্ধা দিদিমাকে। সেদিন কি একবারও ভেবেছি যে আমাকেও একদিন এমনি গল্প শোনাতে হবে সকলকে; মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই পংগু মন নিয়ে দিদিমার অভিনয় করতে হবে সারাটা দেশের সামনে?

দিদিমা মারে গিয়েছেন অনেককাল, কিন্তু অক্ষয় হয়ে আছে সেই স্বপনপুরী। সেদিনকার অবুঝ মনে সহানুভূতি জাগতো বন্দিনী রাজকন্যার জন্যে, আজ নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে নিজের উপরই অনুকম্পা হয়। তাই মনে মনে এখন স্বপ্নের জাল বুনি, স্মৃতির কুসুম নিয়ে রচনা করি তারই কাহিনী, কবিরা কল্পনায় যাকে গড়ে তোলে কাব্যে, আজন্ম শহরবাসীরা যাহার ছবি দেখে স্বপ্নে।

আড়িয়ালখাঁ নদী নয়, নদ। স্ত্রী নয়, পুরুষ। কিন্তু তাকে পুরুষ কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু আমি কেন, তরংগভংগে উজ্জ্বল আড়িয়ালখাঁর তীরে দাঁড়িয়ে জগতের সবচেয়ে বেরসিক লোকও বোধ হয় বলতে পারে না—খাঁ সাহেব এমন নেচে নেচে কোথায় যাচ্ছ তুমি? তবু আড়িয়ালখাঁ নদী নয়, নদ। তার নাম গংগা বা যমুনার মতো কিছুই হতে পারবে না, তার নাম থাকবে—আড়িয়ালখাঁ।

এই আড়িয়ালখাঁর তীরে আমার গ্রাম—কুলপদ্দি। দেশের কুলপঞ্জীতে এর জন্ম তারিখটার সন্ধান পাওয়া যায় নি, তাই নামকরণের ইতিহাসটিও জানানো গেল না; তবে গাঁয়ের বহু পুরাণো স্মৃতি পুরাণো বন্ধুর মতোই মনের পর্দায় পর্দায় জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রকাণ্ড গ্রাম। প্রায় পাঁচ হাজার অধিবাসীর সুখ-দুঃখের কাহিনী দিয়ে এর ইতিহাস গড়া আর ভৌগোলিক সীমারেখার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধানো খাতায়। পৌর-প্রতিষ্ঠানের অংগীভূত গ্রাম। তাই আশে-পাশের গ্রামগুলোর কাছে সে ভোজসভায় নৈকুষ্যকুলীনের মতো, দেবসভায় ইন্দ্রতুল্য। যদিও বিদ্যাসাগরের মতো কেউ জন্মান নি আমাদের গ্রামে, কোন বাদশাহী আমলের ইমামবাড়াও নেই এর ত্রিসীমানায়, তবু সেজন্যে কোন দুঃখ নেই আমাদের। সেখানে যা আছে তাই যথেষ্ট—শালুক ভরা বিল, গাছে গাছে পোষ-না-মানা পাখি, ধূধূ করা মাঠে সোনার ফসল।

কতোদিন নির্জন মাঠে শুয়ে শুয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। মনে হতো, এই গাঁয়ের একজন বলেই হয়তো চাঁদের আলো ঠিকরে পড়তো আমার ঘরে! শরতের বাতাস উতলা হয়ে উঠতো শেফালী ফুলের গন্ধে। বৈশাখের অপরাহ্ণে যেখানে গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলতো আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দিয়ে, বর্ষার ভরা বাদরে সেখানেই ডিঙি নিয়ে আসতো ভিন্‌গাঁয়ের লোকেরা বাজারে সওদা করতে। জ্যোৎস্না রাতে বড়ো গাঙের মাঝি জোর গলায় গান ধরতো,— 'মরমিয়া রে, ও মরমিয়া! মোর মনের কথা কইমু আজি তোরে।' সেই পল্লীগীতির সুরটুকু এখনো আমার মনে লেগে রয়েছে, শহরের কোলাহলে আজো তা মুছে যায় নি।

নাগমশাই ছিলেন পাঠশালার শিক্ষক। ছোটখাটো লোকটি, বয়সে নয়, আকৃতিতে। তাঁর বেতখানির কথা মনে পড়ে। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে স্ত্রী সুনন্দা এবং ঐ বেত্রদণ্ডখানা তাঁর সুখ-দুঃখের সংগী। ঐ বেতখানা দেখিয়ে দেখিয়ে সেদিনও তিনি ছাত্র পড়াতেন। আজ সে স্কুল ভেঙে গিয়েছে, ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে নাগ মশায়ের গতানুগতিকতা।

কেশবদাকে ভুলি নাই। কি দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল তাঁর যুবামহলে! গাঁয়ের এমন একটি ছেলেও ছিল না, যে কেশবদার কথার অবাধ্য হতে সাহস পেতো। সময়টা ছিল অগ্নিযুগ। আমি স্কুলে পড়ি। একদিন দুপুরবেলা স্কুল হতে ফিরছি,

উচ্ছ্বাস অসময়েই থেমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে আমরা এখন পরদেশী।

মনে পড়ে সরলা পিসীর কথা। একটি লিচু কি আম তার গাছ থেকে নিয়েছ কি, আর রক্ষা নেই। চিৎকার করে পাড়া মাথায় করে তুলবে। বার বার বলবে,—'আমার নাম সরলা। পাঁচু চ্যাটার্জির নাত্নী আমি। আমি কাউকে ভয় করিনে। বখাটে ছেলেদের তোয়াক্কা রাখি আমি?' কথাটা ইতিপূর্বে আরো শুনেছি, মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা সুন্দরী বলেছিল,—'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী; আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?' সরলা পিসীর কথাটা এরই আর এক সংস্করণ বলে বখাটে ছেলেরা ধরে নিতো।

গ্রামটি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ফুটবল খেলায়। মহকুমায় সে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহকুমার সীমা ছাড়িয়েও তাহার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। দূরের কোথাও কোথাও খেলতে গেলে কুলপদ্দির নাম শুনেই অগণিত লোক হতো মাঠে। শুনেছি গাঁয়ের দু একজন খেলোয়াড় ইদানিং কলকাতা এসে কোন কোন দলে নাম লিখিয়েছে। আমাদের ফরওয়ার্ড প্রিয়লালই যে একদিন মেওয়ালাল হয়ে দাঁড়াবে না তাই বা কে বলতে পারে?

গাঁয়ে সর্বজনীন আনন্দের সাড়া জাগতো বিজয়া-সম্মিলনী আর নববর্ষ উৎসবে। এর উদ্যোগ-পর্ব যা চলতো তা মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বকেও হার মানায়। গাঁয়ের মাঝখানে কোন বিরাট নাটমন্দিরে দু-তিন দিন ধরে এর অনুষ্ঠান চলতো। জল্সা ও অভিনয় তো হতোই, তা ছাড়া আবৃত্তি, রসরচনা হাস্য-কৌতুক ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় শহরের এবং আশে পাশের গাঁয়ের শিল্পীরাও এসে যোগ দিতেন।

খেজুরী গুড় ও ইলিশ মাছের জন্যে প্রসিদ্ধ এই অঞ্চল। আড়িয়ালখাঁর জলে হাজার হাজার জেলে-ডিঙি ইলিশ মাছের আশায় ঘুরে বেড়াতো। লাইনের ষ্টিমারগুলো রাস্তা না পেয়ে ভোঁ ভোঁ করে চিৎকার করতো। সে চিৎকার এখনো কানে বাজে।

আমার জীবনের বহু স্মৃতি ঐ আড়িয়ালখাঁর সংগে মিশে আছে। আড়িয়ালের

জলে মুছে যেতো আমার দেহের ধূলি, শান্ত হতো মনের আবেগ। শিশুকালে এর তীরে বসে কতো খেলা করেছি, চলন্তি ষ্টিমারের সংগে পাল্লা দিয়ে কতো দৌড়েছি, কৈশোরে তার রুদ্রমূর্তি দেখে ভীতও হয়েছি; কতোদিন এর তীরে বসে দিগন্তের মন-মাতানো ছবি দেখেছি। আজ কোথায় গেল সে সব, কতোদূরে সেই আড়িয়ালখাঁকে ফেলে এসেছি। গাঁয়ের ঐ ঘন-জংগলের মধ্যে যে এতো শান্তি আছে, ঐ নিরক্ষর গ্রামবাসীর অন্তরে যে এতো ভালবাসা আছে, ঐ আড়িয়ালখাঁর ঘোলাটে জলে যে এতো আকর্ষণী শক্তি আছে, তা এতোদিন এমন করে অনুভব করি নি, আজ দেখি, আমার সমস্ত মন জুড়ে আছে সে সবেরই স্মৃতি!

আমার সেই সাধের গ্রাম আজ ধ্বংসের মুখে। আমার বাল্যের লীলাভূমি, কৈশোরের খেলাঘর, যৌবনের স্বর্গ আজ পরিত্যক্ত, শূন্য-লোকালয়। এক নিষ্ঠুর আঘাতে সে আজ মৃতপ্রায়। শুধু আমার গ্রামের নয়, এমনি কতো শত শত গ্রামের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর বুকে আজ জ্বলছে অনির্বাণ চিতা, কণ্ঠে শুধু হা-হুতাশ, চোখে জল! কিন্তু সবই কি ভাগ্য? যদি তাই হয়, তবু এই নিষ্ঠুর আঘাত আমি মেনে নিতে পারবো না। দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের ওপর থাকবে আমার চিরন্তন অভিশাপ, ভাগ্যের বিরুদ্ধে থাকবে বিদ্রোহ! আর আমার হতভাগ্য দেশবাসিকে স্মরণ করতে অনুরোধ করবো কবি-গুরুর সেই বাণী—'ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে, ভিক্ষা না যেন যাচি।'